শাহাদাতে ইমাম হোসাইন

রাদিয়াল্লাহু তাআলা আন্হু

[দর্শন ও শিক্ষা]

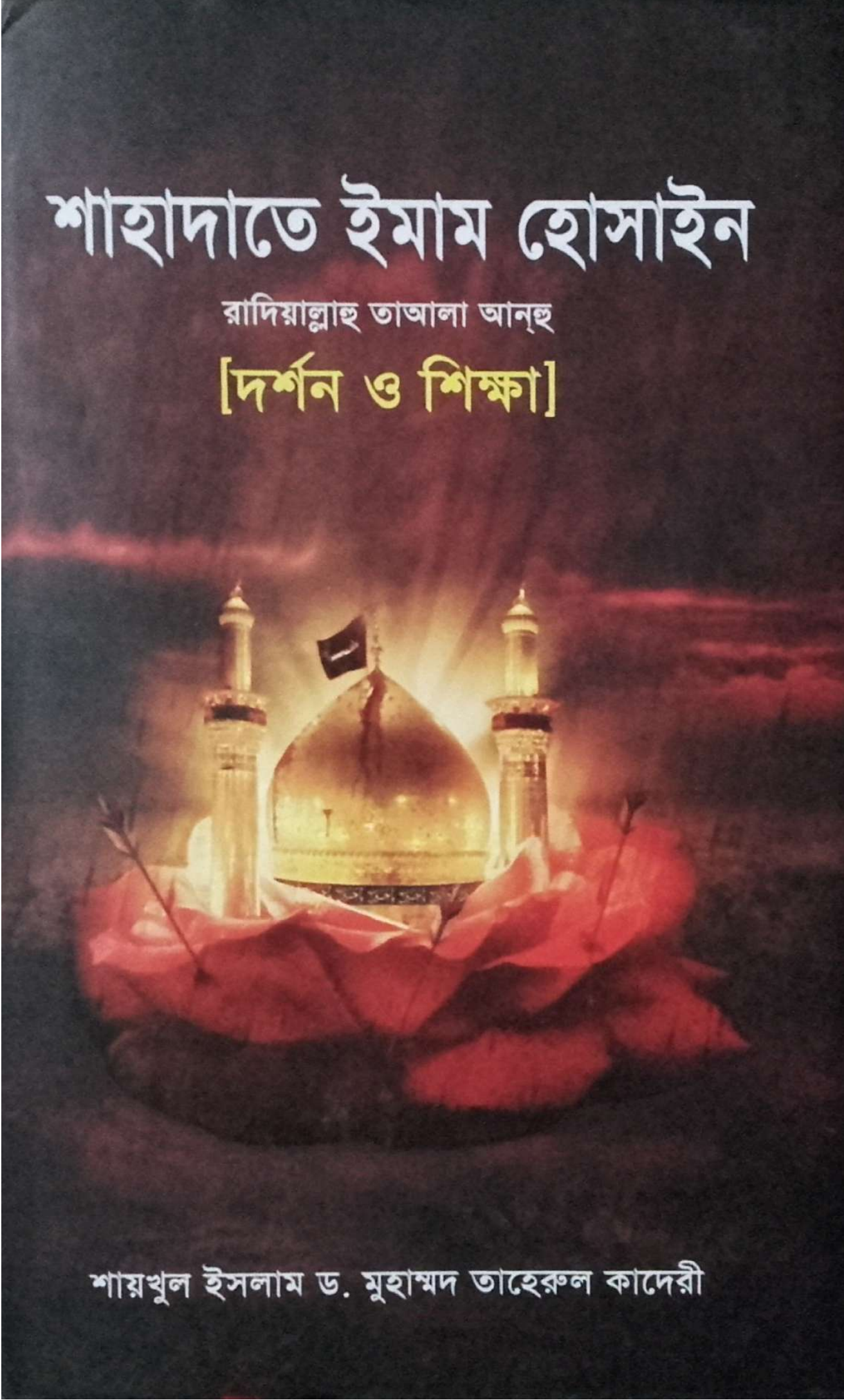

শায়খুল ইসলাম ড. মুহাম্মদ তাহেরুল কাদেরী

শাহাদাতে ইমাম হোসাইন

রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু

[দর্শন ও শিক্ষা]

মূল

শায়খুল ইসলাম ড. মুহাম্মদ তাহেরুল কাদেরী

ভাষান্তর

মাওলানা মুহাম্মদ জাবেদ ইকবাল আশরাফী

সম্পাদনা

আবু আহমদ জামেউল আখতার চৌধুরী

সনজরী পাবলিকেশন

৪২/২ আজিমপুর ছোট দায়রা শরীফ, ঢাকা-১২০৫

৮১, শাহী জামে মসজিদ সুপার মার্কেট, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম-৪০০০

শাহাদাতে ইমাম হোসাইন [দর্শন ও শিক্ষা]
মূল : শায়খুল ইসলাম ড. মুহাম্মদ তাহেরুল কাদেরী

তাবাত্তর :
মাওলানা মুহাম্মদ জাবেদ ইকবাল আশরাফী

সম্পাদনায় :
আবু আহমদ জামেউল আখতার চৌধুরী

প্রকাশক :
মুহাম্মদ আবু তৈয়ব চৌধুরী

প্রকাশক কর্তৃক সর্বসত্ব সংরক্ষিত
© সনজরী পাবলিকেশনের পক্ষে নুরে জান্নাত তৃষা

প্রকাশকাল :
১০ জানুয়ারি, ২০১৭, ১১ রবিউস্ সানি, ১৪৩৮, ২৭ পৌষ, ১৪২৩ সাল।

প্রকাশনায় :
সনজরী পাবলিকেশন
৪২/২ আজিমপুর ছোট দায়রা শরীফ, ঢাকা- ১২০৫, মোবাইল : ০১৯২৫-১৩২০৩১
৮১, শাহী জামে মসজিদ মার্কেট, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম, মোবাইল : ০১৬১৩-১৬০১১১
E-mail : Sanjarypublication@gmail.com
পরিবেশনায় : সনজরী বুক ডিপো

মূল্য : ৩০০ [তিনশত] টাকা মাত্র

Shahadat-E Imam Husain [Jibon O Dorshon], By: Shaikhul Islam Dr. Muhammad Taherul Kaderi, Translated By: Mowlana Muhammad Javed Iqbal Ashrafi, Edited By: Abu Ahmad Jameul Akhtar Chowdhury. Published By: Mohammad Abu Tayub Chowdhury. Price: Tk: 300/-

مَوْلَايَ صَلِّ وَسَلِّمْ دَائِمًا أَبَدًا
عَلٰى حَبِيْبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِمِ
مُحَمَّدٌ سَيِّدُ الْكَوْنَيْنِ وَالثَّقَلَيْنِ
وَالْفَرِيْقَيْنِ مِنْ عُرْبٍ وَّمِنْ عَجَمِ

﴿صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَعَلٰى آلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ﴾

شاہ است حسینؓ بادشاہ است حسینؓ
دیں است حسینؓ دیں پناہ است حسینؓ
سر داد نہ داد دست در دست یزید
حقا کہ بنائے لا الہ ہست حسینؓ

انسان کو بیدار تو ہو لینے دو!
ہر شخص پکارے گا ہمارے ہیں حسینؓ

উঠুক জেগে মানব জাতি,
একটু সময় দাও তাদের!
জনে জনে উঠবে বলে,
'আমরা সবাই হোসাইন দলে'।

প্রকাশকের কথা

হযরত ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর খিলাফতকালে মুসলমানরা জেরুজালেমসহ সমগ্র সিরিয়া-ফিলিস্তিন জয় করে রোমান সম্রাটের সাথে যুদ্ধের মাধ্যমে। হযরত ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হযরত আমীর মুয়াবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ানকে সিরিয়ার গভর্নর নিয়োগ করেন। তখন থেকে হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর ইন্তেকাল পর্যন্ত হযরত আমিরে মুয়াবিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু সিরিয়ার গভর্নর ছিলেন। হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর ইন্তেকালের পর মুয়াবিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু ইসলামী বিশ্বের বেশির ভাগ অংশে নিজের কর্তৃত্ব সম্প্রসারণ করেন। মুগীরা ইবনে শু'বার প্ররোচণায় আমীর মুয়াবিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু স্বীয় পুত্র ইয়াজীদকে পরবর্তী খলিফা হিসেবে মনোনীত করেন।

হিজরি ৬০ সনের ২২ রজব বৃহস্পতিবার ৭০ বছর বয়সে হযরত আমীর মুয়াবিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু ইন্তেকাল করেন। ইয়াজীদ তখন দামেস্কের বাইরে শিকারে ব্যস্ত ছিল। কয়েকদিন পর ইয়াজীদ দামেস্কে এসে খলিফা পদে আসীন হয়। সে তার খিলাফতের পক্ষে বায়'আত গ্রহণের জন্য বিভিন্ন প্রদেশে প্রতিনিধি প্রেরণ করে। সে সময়ে জীবিত অনেক সাহাবী ইয়াজীদের প্রতিনিধিদের হাতে বায়'আত গ্রহণ করেননি এবং মক্কা ও মদীনার অধিকাংশ সম্মানীত সাহাবীসহ হযরত ইমাম হোসাইন রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু ইয়াজীদকে বৈধ খলিফা হিসেবে স্বীকৃতি দেননি। ইতিমধ্যে ইয়াজীদের নিয়োগকৃত মদিনার শাসক ইয়াজীদের পক্ষে বায়'আত গ্রহণের জন্য চাপ প্রয়োগ-ভীতি প্রদর্শন করায় ইমাম হোসাইন রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুসহ অনেকে মদিনা ত্যাগ করে মক্কায় চলে যান।

ইমাম হোসাইন রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর মদিনা ও মক্কায় অবস্থানকালে কুফা ও বসরার অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তি ইমাম হোসাইনকে কুফায় গিয়ে খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণের জন্য শত শত চিঠি প্রেরণ করেন। ইয়াজীদের বিভিন্ন দুষ্কর্ম প্রত্যক্ষ করে ইমাম হোসাইন রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু কুফার পথে রওয়ানা হন। কিন্তু কুফার সন্নিকটে কারবালা নামক স্থানে পৌঁছার পর ইয়াজীদের সৈন্যবাহিনী তাঁকে তাঁর সঙ্গীগণ ও পরিবার-পরিজনসহ ঘেরাও করে ফেলে। ইমাম হোসাইন রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর কাফেলায় ৭০ জন মতান্তরে ৮০ কিংবা ৮২ জন ছিল। অপরদিকে ইয়াজীদের পাঠানো সেনাসংখ্যা ছিল ৫ হাজার। ইয়াজীদের বায়'আত গ্রহণ করে বশ্যতা স্বীকার করার জন্য উক্ত সেনাদল ইমামকে দীর্ঘ ৮ দিন কারবালায় অবরুদ্ধ করে রাখে এবং এক পর্যায়ে ফোরাত নদী থেকে পানি সংগ্রহ বন্ধ করে দেয়া হয়। এতদসত্ত্বেও ইমাম হোসাইন রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু ইয়াজীদের হাতে বায়'আত গ্রহণ করার পরিবর্তে শাহাদাতের পথ বেঁছে নেন। ফলে ৬১ হিজরি সনের ১০ মহররম সকাল থেকে উম্মতে মুহাম্মদীর দ্বীন রক্ষার যুদ্ধ শুরু হয়।

স্বেচ্ছায় শাহাদাত বরণের মাধ্যমে ইমাম হোসাইন রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু আমাদেরকে এই শিক্ষা দিয়েছেন যে, নিজের ও নিজের পরিবারের জীবন দিয়ে হলেও জালেম শাসককে প্রতিরোধ করার প্রচেষ্টা গ্রহণ করতে হবে। কোনো অবস্থাতেই জালেম শাসকের বশ্যতা স্বীকার করা চলবে না।

ইয়াজীদ ইবনে মুয়াবিয়া যে জালেম ছিল তার নমুনা সে কারবালার ঘটনার পরেই প্রমাণ করেছে। ইয়াজীদ নিজের জবরদখল সম্প্রসারণ করার জন্য পবিত্র মক্কা ও মদিনার উপর সশস্ত্র হামলা করে। হিজরি ৬৩ সনের ২৭ জিলহজ্ব ইয়াজীদের সেনাবাহিনী মদিনায় প্রবেশ করে। তারা মদিনায় অবাধ হত্যাকাণ্ড চালায়। এতে তিন শতাধিক কুরায়শ ও আনসারসহ সহস্রাধিক মুসলমান নিহত হন। এ যুদ্ধে ইয়াজীদ বাহিনীর নেতৃত্বে ছিল মুসলিম ইবনে উকবা। যুদ্ধের পর মক্কায় হামলা করার জন্য রওয়ানা হলে পথিমধ্যে সে মারা যায়। এরপর হুসাইন ইবনে নুমায়র ইয়াজীদ বাহিনীর সেনাপতিত্ব গ্রহণ করে। ৬৪ হিজরি সনের ২৭ মহররম থেকে পবিত্র মক্কার উপর হামলা শুরু হয়। ইয়াজীদের বাহিনী কাবা ঘরের নিকটস্থ পাহাড়ে মিনজানিক (পাথর ছোঁড়ার কামান) বসিয়ে কাবা ঘরের উপর হামলা শুরু করে।

এই পাথর হামলা ৫ সপ্তাহ পর্যন্ত স্থায়ী থাকে। ৬৪ হিজরির ০৩ রবিউল আউয়াল তারিখে ইয়াজীদের বাহিনী কামানের সাহায্যে আগুনের গোলা নিক্ষেপ করে কাবাঘরের উপর। কাবার গিলাফ ভস্মীভূত হয়। কাবাঘর ছাদসহ ভেঙ্গে পড়ে। এ অবস্থা চলতে থাকার সময় ১০ রবিউল আউয়াল ইয়াজীদ মৃত্যুবরণ করে। এতে ইয়াজীদ বাহিনী ফিরে যায় এবং ধীরে ধীরে তার বাহিনী নিঃশেষ হয়ে যায়।

আল্লাহ আমাদেরকে শাহাদাতে কারবালার শিক্ষা হৃদয়ে ও কর্মে ধারণ করার তৌফিক দিন। আমীন।

'শাহাদাতে ইমাম হোসাইন [দর্শন ও শিক্ষা]' নামক গুরুত্বপূর্ণ এ পুস্তকটি অনুবাদ করতঃ প্রকাশ করার ক্ষেত্রে যারা সহযোগীতা করেছেন প্রত্যেকের শুকরিয়া আদায় করছি। কোথাও ভুল-ত্রুটি পরিলক্ষিত হলে বিজ্ঞ পাঠক আমাদেরকে অবহিত করলে আগামী সংস্করণে সংশোধনে সচেষ্ট থাকব, ইনশাআল্লাহ।

মুহাম্মদ আবু তৈয়ব চৌধুরী
সনজরি পাবলিকেশন

উৎসর্গ

শাহাদাতে কারবালার গণজাগরণ সৃষ্টিকারী খতিবে বাঙ্গাল আল্লামা জালালুদ্দীন আল কাদেরী'র জন্য উৎসর্গীত ।

সূচীপত্র

☐ প্রাক কথন/ ০১

☐ *অধ্যায় : ০১*

■ 'শহীদ' শব্দের বিভিন্ন অর্থ ও শাহাদাত সম্পর্কে ধারণা/ ০৪

- ◆ 'শাহাদাত' شَهَادَتْ শব্দের প্রথম অর্থ ও 'শাহাদাতে'র ধারণা/ ০৫
- ◆ উপস্থিতির প্রথম দিক/ ০৬
- ◆ উপস্থিতির দ্বিতীয় দিক/ ০৮
- ◆ নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য 'শহীদ' শব্দের ব্যবহার/ ০৮
- ◆ 'শহীদ' মৃত্যুবরণ করেও কীভাবে জীবিত থাকেন/ ০৯
- ◆ 'শহীদে'র দ্বিতীয় অর্থ এবং শাহাদাতের ধারণা/ ১৩
- ◆ 'শহীদে'র তৃতীয় অর্থ এবং শাহাদাতের ধারণা/ ১৫
- ◆ শাহাদাতের মৃত্যুর কষ্ট পিঁপড়ার কামড় সমতুল্য/ ১৮
  - ▶ পবিত্র কুরআন থেকে প্রমাণ/ ১৮
- ◆ 'শহীদে'র চতুর্থ অর্থ এবং 'শাহাদাতে'র ধারণা/ ২০
- ◆ 'শহীদে'র পঞ্চম অর্থ ও 'শাহাদাতে'র ধারণা/ ২৩

☐ *অধ্যায় : ০২*

■ ইমাম হোসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু'র শাহাদাতের বিশেষত্ব/ ২৬

- ◆ প্রসিদ্ধির দিক থেকে বিশেষত্ব/ ২৯
- ◆ হযরত উম্মে সালেমা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হাকে মাটি দান করা/ ৩০
- ◆ শাহাদাতের স্থান চিহ্নিতকরণ/ ৩১
- ◆ কারবালা প্রান্তর ঃ হোসাইন রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হুর শাহাদাত-ভূমি/ ৩২
- ◆ শাহাদাতের সনটি চিহ্নিতকরণ/ ৩৪
- ◆ হযরত আবু হোরায়রা রাদিয়াল্লাহু আন্হুর ষাট হিজরী থেকে আশ্রয় প্রার্থনা/৩৫
- ◆ একরোখা ভাব পোষণ করার কারণ/ ৩৭
- ◆ ইমাম হোসাইন রাদিয়াল্লাহু আন্হুর শাহাদাতে সব ধরনের পরীক্ষা বিদ্যমান/ ৩৯
- ◆ হযরত হোসাইন রাদিয়াল্লাহু আন্হুর শাহাদাত নবী কর্তৃক দৃষ্ট হওন/ ৩৯
- ◆ একটি ভ্রম নিরসন/ ৪০
- ◆ হযরত সাল্মার বর্ণনা/ ৪১
- ◆ হযরত ইমাম হোসাইন-এর শাহাদাত নবী পাক কর্তৃক পরিদৃষ্ট হওয়ার কারণ/ ৪১

◆ শাহাদাতের পর সাক্ষ্য প্রদান/ ৪২
◆ কর্তিত মস্তকের সাক্ষ্য/ ৪৩
◆ রাবীগত পার্থক্য/ ৪৪
◆ কারবালার যুদ্ধ কি দুই শাহ্জাদার যুদ্ধ ছিল?/ ৪৫
◆ সমস্ত গৃহবাসীদের কুরবানী/ ৪৬

❑ *অধ্যায় : ০৩*

■ ইমাম হোসাইন রাদিয়াল্লাহু আন্হুর শাহাদাত নবী-চরিতেরই একটি অধ্যায়/ ৪৮
◆ নবী-চরিত ও শাহাদাতে-হোসাইনের বিশেষত্ব/ ৪৯
◆ শাহাদাতে-হোসাইন ঃ নবী-চরিতেরই একটি অধ্যায়/ ৫০
◆ সূরা ফাতিহা ও হেদায়তের প্রার্থনা/ ৫১
◆ সেরাতে মুস্তাকীমের মর্মার্থ/ ৫২
◆ নবী-রসুল প্রেরণের লক্ষ্য/ ৫৩
◆ মানবরূপী হেদায়ত দান করার রহস্য/ ৫৪
◆ হেদায়ত ও গোমরাহী ঃ বিশ্ব-মানবতার নিরিখে/ ৫৫
◆ পুরস্কারপ্রাপ্ত বান্দা করা?/ ৫৬
◆ হেদায়তের উৎসমূল কি কেবল নবী-রসুলগণই?/ ৫৭
◆ মহান চারটি নেয়ামত/ ৫৮
◆ প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সমস্ত গুণাবলিরই সমন্বিত রূপ/ ৫৮
◆ নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঃ সমস্ত নেয়ামতরাজির পরিবেশনকারী/ ৫৯
◆ যে কোন নেয়ামত অর্জিত হয় মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামেরই মাধ্যমে/ ৬০
◆ শাহাদাতের গুণে গুণান্বিত হওয়া বাঞ্ছনীয় প্রিয় নবীর/ ৬১
◆ আমলের দু'টি দিক ঃ মৌল রূপ ও ব্যবহারিক রূপ/ ৬৩
▶ শাহাদাতের মৌল রূপ/ ৬৪
▶ রহমতের নবীর মধ্যে শাহাদাতের রূহ ও জওহার বিদ্যমান ছিল/ ৬৪
▶ আমল নির্ভর করে নিয়তের উপর/ ৬৫
◆ শাহাদাতের ব্যবহারিকে রূপ/ ৬৭
১. শাহাদাতে সিরূরী বা গোপন শাহাদাত/ ৬৭
২. শাহাদাতে জুহূরী বা প্রকাশ্য শাহাদাত/ ৬৭

◆ আমলের শুরুর দিক ও শেষের দিক/ ৬৭
◆ গোপন শাহাদাতের শুরুর দিক/ ৬৮
◆ প্রিয় নবীর হেফাজত আল্লাহ্রই যিম্মায়/ ৬৮
◆ শাহাদাতে জুহূরীর (প্রকাশ্য শাহাদাতের) শুরুর দিক/ ৬৯
◆ মৃত্যুর ধরণ বা রূপ/ ৭০
◆ উভয় ধরনের শাহাদাতেরই চরম প্রকাশ/ ৭১
◆ হাসনাইনে করীমাইনকে (হাসান-হোসাইনকে) নির্বাচিত করে রাখার কারণ/৭২
◆ হাসান-হোসাইন (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা) ঃ রসুলের অংশ বিশেষ/ ৭২
◆ প্রিয় নবীর সাথে হযরত হাসান-হোসাইনের জাহেরী ও বাতেনী সাদৃশ্য/ ৭৪
◆ প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে বাতেনী মিল/ ৭৬
◆ 'আনা মিন হোসাইন' (আমি হোসানইন হতে) -এর মর্ম/ ৭৮
◆ ইমাম হোসাইনের শাহাদাত ঃ প্রিয় নবীর শাহাদাতের জওহারের পূর্ণ বিকাশ/ ৭৯
◆ প্রিয় নবীর পুত্র সন্তান না থাকার রহস্য/ ৮০
◆ 'হাসান' ও 'হোসাই' নাম রাখার কারণ/ ৮১
◆ কিছু সূক্ষ্ম বিষয়/ ৮৩

❑ *অধ্যায়: ০৪*

■ শাহাদাতে ইমাম হোসাইন ঃ ঘটনা ও বাস্তবতা/ ৮৫
◆ খেলাফতে রাশেদার সময়কাল/ ৮৬
◆ নুতন জঙ্গী বাহিনীর আত্মপ্রকাশ/ ৮৭
◆ আহ্লে সুন্নাতের দৃষ্টিকোণ/ ৮৮
◆ খেলাফতের কেন্দ্রস্থল ঃ কুফায়/ ৮৯
◆ হযরত আমীরে মুয়াবিয়া সম্পর্কে আহ্লে সুন্নাতের মতবাদ/ ৯০
◆ ৬০ হিজরীর শেষ ভাগ থেকে আশ্রয় প্রার্থনার নির্দেশ/ ৯২
◆ এজিদের প্রতি হযরত আমীরে মুয়াবিয়ার অছিয়ত/ ৯৪
◆ মদীনার গভর্নরের নিকট এজিদের চিঠি/ ৯৪
◆ মারওয়ানের নিকট ওয়ালিদের পরামর্শ গ্রহণ/ ৯৫
◆ মদীনা মুনাওয়ারা থেকে রওয়ানা/ ৯৭
◆ হযরত মোহাম্মদ বিন হানাফিয়ার পরামর্শ/ ৯৮
◆ কুফাবাসীদের পরামর্শ ও ইমাম আলী মকামের প্রতি আহ্বান/ ১০০

◆ ইমাম হোসাইনের সিদ্ধান্ত/ ১০১
◆ ইমাম মুসলিমকে কুফাবাসীদের সাদর সম্ভাষণ/ ১০৩
◆ এজিদকে অবহিত করণ/ ১০৩
◆ নোমান বিন বশীরকে বরখাস্ত, ইবনে যিয়াদকে পদায়ন/ ১০৪
◆ ইবনে যিয়াদের কুফায় প্রবেশ/ ১০৬
◆ হযরত মুসলিম বিন আকীলকে খোঁজ/ ১১০
◆ হানীকে গ্রেপ্তার/ ১১১
◆ হযরত মুসলিম বিন আকীলের শাহাদাত/ ১১৭
◆ হযরত মুসলিম বিন আকীলের দুই শাহজাদা/ ১১৮
◆ হযরত মুসলিম বিন আকীলের দুই শাহজাদার শাহাদাত/ ১২০
◆ হযরত হোসাইনের কুফায় গমনের দৃঢ় সংকল্প/ ১২৬
◆ রুখসত ও আযিমত (সুযোগ ও ইচ্ছা)/ ১২৭
◆ পবিত্র মক্কা থেকে কারবালা পর্যন্ত/ ১৩০
◆ কুফাবাসীদের নিকট পত্র/ ১৩২
◆ মুসলিম বিন আকীলের শাহাদাতের সংবাদ/ ১৩৩
◆ হুর বিন এজিদের আগমন/ ১৩৫
◆ হোসাইনী কাফেলা ঃ কারবালার জমিনে/ ১৩৭
◆ ওমর বিন সাআদের আগমন/ ১৩৯
◆ পানি বন্ধ করে দেওয়ার নির্দেশ/ ১৪০
◆ মাত্র এক রাতের অবকাশ/ ১৪২
◆ সাথীদের উদ্দেশ্যে ইমাম হোসাইনের বক্তব্য/ ১৪৪
◆ ৬১-র ১০ই মুহররম ঃ ছোট কেয়ামত/ ১৪৬
◆ চূড়ান্ত দলিল/ ১৪৭
◆ হুরের তওবা/ ১৫০
◆ কুফাবাসীদের উদ্দেশ্যে হুরের বক্তব্য/ ১৫১
◆ যুদ্ধের সূচনা/ ১৫২
◆ তাঁবুতে অগ্নি সংযোগ/ ১৫৩
◆ হযরত আলী আকবরের শাহাদাত/ ১৫৪
◆ হযরত কাসেম বিন হাসানের শাহাদাত/ ১৫৬

◆ হযরত আলী আসগরের শাহাদাত/ ১৫৮
◆ হযরত ইমাম হোসাইন রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর শাহাদাত/ ১৬০
◆ নবী-বংশের শহীদগণ/ ১৬৪
◆ হযরত আব্বাসের কষ্টে নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দুশ্চিন্তা/ ১৬৫
◆ হযরত হামজার হত্যাকারীকে শাসানো/ ১৬৫
◆ হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর বর্ণনা/ ১৬৭
◆ হযরত উম্মে সালেমার বর্ণনা/ ১৬৮
◆ হোসাইনী কাফেলার বাদবাকি সদস্যদের কুফায় রওয়ানা/ ১৬৯
◆ শহীদগণের দাফন/ ১৬৯
◆ নূরানী মস্তকটির উপর আলো ও শ্বেত পক্ষী/ ১৭০
◆ ইমাম আলী মকামের মস্তক ও ইবনে যিয়াদ/ ১৭১
◆ ইবনে যিয়াদ ও কারবালার বন্দীগণ/ ১৭২
◆ ইবনে আফীকের শাহাদাত/ ১৭৩
◆ এজিদের দরবারে হোসাইনের শির/ ১৭৭
◆ রুমের মুখপাত্রের বিস্ময় প্রকাশ আর কড়া মন্তব্য/ ১৭৯
◆ জনৈক ইহুদীর অভিশাপ আর ধিক্কার/ ১৭৯
◆ এজিদের মুনাফেকীর রাজনীতি/ ১৮০
◆ হোসাইনের শিরের অলৌকিক শান/ ১৮২
◆ আহলে-বাইতগণের মদীনায় ফিরে আসা/ ১৮৩
◆ এজিদের ফেরাউনিরাত ও গোমরাহীর বিবরণ/ ১৮৫
◆ পবিত্র মক্কা শরীফে হামলা/ ১৯০

☐ *অধ্যায় : ০৫*

■ শাহাদাতে ইমাম হোসাইন ও মকামে রেযা/ ১৯৪
◆ ০১. সবর/ ১৯৫
▶ সবর লিল্লাহ্- আল্লাহ্ওয়াস্তে সবর/ ১৯৫
▶ ভাবনার বিষয়/ ১৯৬
▶ সবর আলাল্লাহ্ বা আল্লাহ্র উপর সবর/ ১৯৬
▶ একটি ঘটনা/ ১৯৭
▶ সবর মাআল্লাহ্ বা আল্লাহ্র সাথে সবর/ ১৯৮
▶ আশেকগণের সবর (সবর আনিল্লাহ্)/ ১৯৯

▶ দু:সাধ্য সবর/ ২০০
▶ ধৈর্য্য ধারণকারীদের প্রতিদান/ ২০১
◆ তাওয়াক্কুল/ ২০২
▶ প্রথম স্তর : প্রাপ্তিতে শুকরিয়া, অপ্রাপ্তিতে ধৈর্য্য ধারণ/ ২০৩
▶ দ্বিতীয় স্তর : প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তি সমান হওয়া/ ২০৩
▶ তৃতীয় স্তর : অপ্রাপ্তিতেও শোকর করাকে পছন্দ করা/ ২০৩
▶ একটি ঘটনা/ ২০৪
▶ তাওয়াক্কুলকারীদের প্রতিদান/ ২০৫
◆ রেযা/ ২০৬
◆ তরকুল এখ্তিয়ার কবলাল কযা (আল্লাহ্‌র হুকুম আসার পূর্বে নিজের এক্তিয়ারকে পরিহার করা)/ ২০৬
◆ সুরূরুল কলব বিমর্‌রিল কযা (আল্লাহ্‌র হুকুম চলা কালে পুলকিত হৃদয় থাকা)/২০৭
◆ ফুকদানুল মিরারাতি বাদাল কযা (আল্লাহ্‌র হুকুমের পর চলমানতা বিদ্যমান না থাকা)/ ২০৭
◆ মকামে রেযা ঃ একটি দুষ্কর ধাপ/ ২০৭
◆ হযরত ইমাম হোসাইন ও মকামে রেযা/ ২০৯
◆ কর্মের মহত্ব/ ২১১

☐ *অধ্যায় : ০৬*

■ কারবালার ঘটনার ধর্মীয় শুরুত/ ২১৩
◆ কাবালার ঘটনা কি কেবল একটি ঐতিহাসিক ঘটনা/ ২১৪
◆ ইলমুল আকায়িদ (আকিদা সম্বলিত জ্ঞান)/ ২১৬
◆ ইলমুল আহকাম (বিধি-বিধান সম্বলিত জ্ঞান)/ ২১৬
◆ ইলমুত তাজকীর (আলোচনা সম্বলিত জ্ঞান)/ ২১৭
◆ইলমুত তাজকীর বি আলায়িল্লাহ্ বা আল্লাহ্‌র নেয়ামত সম্বলিত আলোচনা/ ২১৭
◆ইলমুত তাজকীর বি আইয়ামিল্লাহ্ বা আল্লাহ্‌র দিবসগুলো সম্বলিত আলোচনা/ ২১৯
◆ কারবালার ঘটনা ঃ কুরআনের বিষয়বস্তুর একটি/ ২১৯
◆ সালিহীনদের ঘটনা/ ২২১
◆ কারবালার ঘটনা ঃ আসহাবে কাহাফের ঘটনার চাইতেও অধিক বিস্ময়ের/২২৪
◆ কারবালার ঘটনা ঃ পাকা-পোক্ত ঈমানের পরিচয় বহন করে/ ২২৫

☐ *অধ্যায় : ০৭*

■ শাহাদাতে ইমাম হোসাইন মুসলিম উম্মাহ্‌র প্রতি এক উদাত্ত আহ্বান!/ ২২৯
◆ পার্থিব সাফল্য মূল সাফল্য নয়/ ২৩০
◆ তোমাদের নামে কোন উপাখ্যানও হবে না!/ ২৩২
◆ শাহাদাতে-হোসাইনের উদাত্ত আহ্বান/ ২৩৩
▶ আমলের আহ্বান/ ২৩৩
▶ নিরাপত্তার আহ্বান/ ২৩৪
▶ সুন্নী-শিয়া বিরোধে মিলমিশের পথ/ ২৩৪
◆ নবী-সম্পৃক্ততা ঃ ঈমানের মূল ও কেন্দ্রবিন্দু/ ২৩৫
◆ পবিত্র আহ্‌লে-বাইত ও সাহাবায়ে কেরামের পরিচিতি ঃ নবী সম্পৃক্ততার দিক থেকে/ ২৩৬
◆ পবিত্র আহ্‌লে-বাইত ও সাহাবায়ে কেরামগণের সাথে সমান সম্পর্ক/ ২৩৭
◆ উম্মতদের শ্রেণিবিভেদ/ ২৩৭
◆ শ্রেণিগত বিরোধের ক্ষতিকর দিক/ ২৪০
◆ আহ্‌লে-বাইত কারা?/ ২৪১
▶ বংশীয় পরিবার/ ২৪১
▶ বসবাসের পরিবার/ ২৪১
▶ জন্মের পরিবার/ ২৪১
◆ পক্ষপাতিত্ব বাদ দিন!/ ২৪২
◆ ভাবনার বিষয়/ ২৪৪
◆ হযরত আলীর বাণী/ ২৪৪
◆ আহ্‌লে-বাইত ও সাহাবাদের প্রতি বিদ্বেষের আলামত/ ২৪৫
◆ সাহাবা ও আহ্‌লে-বাইতের সম্পৃক্ততা নবী পাকের সাথে/ ২৪৭
◆ সাহাবা ও আহ্‌লে-বাইতগণের পারস্পরিক সম্পর্ক/ ২৪৯
◆ হযরত আবু বকর সিদ্দীকের আমল দ্বারা প্রমাণ/ ২৪৯
◆ হযরত আলীর চেহারার দিকে তাকানোও এবাদত/ ২৫০
◆ হযরত শহর বানুর শুভ পরিণয় হযরত ইমাম হোসাইনের সাথে/ ২৫২

প্রাক্ কথন

হক ও বাতিলের ইতিহাসে সংঘটিত হয়েছে কল্যাণ ও অকল্যাণের লাখো যুদ্ধ। শহীদও হয়েছেন হাজারো। বিশেষ করে ইসলামের প্রথম যুগগুলো ভরপুর ছিল অগণিত মহান শাহাদাতের ইতিহাসে। তা সত্ত্বেও এই কথা সূর্যালোকের ন্যায় দিব্যি জাজ্জ্বল্যমান যে, আজও পর্যন্ত অন্য কারো শাহাদাত এত বেশি গ্রহণযোগ্যতা, প্রসিদ্ধি ও সর্বজন আলোচ্য বিষয়ে রূপ নিতে পারে নি, যা নিয়েছে হযরত হোসাইন রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হুর শাহাদাত। সাড়ে তের শত বৎসর অতিবাহিত হয়ে যাওয়ার পরও হযরত ইমাম হোসাইন রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হুর শাহাদাতের কথা আজও সারা বিশ্বে বহুলভাবে আলোচিত হতে রয়েছে। তাঁর প্রসিদ্ধি ও আলোচনার কমতি হয় নি আজ পর্যন্তও। বরং বৃদ্ধিই পেতে চলেছে। এমনকি যে-কোন যুগেই 'হোসাইনিয়াত' বা হোসাইনী আদর্শ সত্যের প্রতীক হয়ে রয়েছে, আছে এবং থাকবে। পক্ষান্তরে 'এজিদিয়াত' বা এজিদী কর্মকাণ্ড যে-কোন যুগেই চিহ্নিত হয়ে থাকবে ফিত্না-ফসাদ ও নষ্টের আলামত রূপে।

নশ্বর এই পৃথিবীতে প্রকাশ্যে কারো সাফল্য গোচরীভূত হওয়া কিংবা ক্ষমতা সৃষ্টি করে নিতে পারা মূল সাফল্য নহে। পৃথিবীতে ক্ষমতার নেশায় মাতোয়ারা অনেক কাফির, জালিম, ফাসিক, ফাজির, মুনাফিকসহ তাগূতি শক্তিতে বলীয়ান লোকেরাও খণ্ডকালীণ সময়ের জন্য ক্ষমতার মালিক হয়। এই কারণেই যে, আল্লাহ্ তাদেরকে এড়িয়ে চলেন। যখনই আল্লাহ্র পাকড়াও করার সময় আসে, তখন তাদের লণ্ডভণ্ড ও ধূলিসাৎই করে দেওয়া হয়। তাদেরকে এমন লাঞ্ছিত ও অপমানিত করে দেওয়া হয় যে, তাদের নাম উচ্চারিত হয় কেবল ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য শিক্ষণীয় হিসাবেই।

এজিদও ছিল সেসব অস্পৃশ্যদেরই অন্তর্ভুক্ত, আল্লাহ্ তা'আলা যাকে নশ্বর এই পৃথিবীর খণ্ডকালীন জীবনে নেতৃত্বের কুঞ্জি দান করেছেন। এই ক্ষমতার নেশায় মাতোয়ারা হয়ে বিভোর থাকে সে। অথচ পূর্ব থেকেই সে ছিল অপরাধপ্রবণ, উদাসীন ও বেপরোয়া স্বভাবের। সে সময় কাটাত খেল-তামাশায় আর লাম্পট্যে। কিন্তু ক্ষমতার মসনদে সমাসীন হওয়ার পর পরই তার মাঝে সৃষ্টি হয়ে যায় 'ফেরাউনিয়াত' ও 'কারূনিয়াতে'র ন্যায় ভয়ানক সব দুষ্ট চরিত্র। কিয়ৎ দিনের দুনিয়ার শাসন ও ক্ষমতার দম্ভে নিজের ঈমান নিয়ে বাণিজ্যে মেতে উঠে সে নবী-বংশের উপর অন্যায়, অবিচার ও নির্যাতন চালায় এবং কারবালার তপ্ত মরুভূমিতে ক্ষুধা ও পিপাসার্ত নবী-পরিবার ও তাঁদের

আনসারগণের মধ্য থেকে শহীদ করে বাহাত্তর জন সদস্যকে। অবশ্য সেই এজিদের ভাগ্যে এমন সময়ও আসে যে, সকল মানুষ তার বিরুদ্ধে বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। শুধু তাই নয়, বাহাত্তর জন আনসার সদস্যের বিপরীতে হত্যার শিকার হতে হয় এজিদ পক্ষীয় প্রায় এক লক্ষ সত্তর হাজার ব্যক্তিকে। এই সেই এজিদ যে পবিত্র মদীনা মুনাওয়ারায় ঘোড়া ও উটের বাহিনী প্রেরণ করেছিল। তিন দিন ধরে মসজিদে নববী ও রাসূলের পাক রওজার উপর তার বাহিনীর ঘোড়াগুলো বেঁধে রেখেছিল। তিন দিন ধরে মসজিদে নববীতে জামাতও হতে দেয় নি, নামাজও পড়তে দেয় নি। সেই এজিদের ভাগ্যে এমন সময়ও এসেছিল যে, তার কবরের উপর বাঁধা হয়েছিল ঘোড়া ও উট। ওসব জন্তুর প্রস্রাব ও বিষ্ঠায় ভরপুর হয়েছিল তার কবর।

আপনাদের হাতের এই কিতাবটি আমার শ্রদ্ধাভাজন ওস্তাদ ইসলামী গবেষক, মুফাসসিরে কুরআন, যুগশ্রেষ্ঠ মনীষী প্রফেসর ডক্টর মুহাম্মদ তাহিরুল কাদেরী মুদ্দা জিলুহুল আলী কর্তৃক প্রণীত সুনির্দিষ্ট কোন কিতাবই নয়; বরং এটি তাঁর সেসব ভাষণসমূহেরই সংকলিত রূপ যা তিনি হযরত ইমাম হোসাইন রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হুর শাহাদাতের উপর বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন স্থানে প্রদান করেছিলেন। ইতোপূর্বে 'শাহাদাতে ইমাম হোসাইন : মৌলিকতা ও ঘটনাবলী' শীর্ষক তাঁর কতিপয় ভাষণ প্রকাশ করা হয়েছিল। এই কিতাবটিতে সেসব ভাষণগুলোও জরুরি ভিত্তিতে বরাত ও বিবরণ স্বরূপ স্বতন্ত্র একটি পর্বের আওতায় লিপিবদ্ধ করে দেওয়া হয়েছে।

মূল কথা হচ্ছে, যুগশ্রেষ্ঠ মহা মনীষী প্রফেসর মুহাম্মদ তাহিরুল কাদেরী মুদ্দা জিলুহুল আলী বর্তমান যুগের চিন্তা-গবেষণা ও এলমের ময়দানে এমন এক স্থান দখল করে নিয়েছেন, যা নতুন করে বলার অপেক্ষা রাখে না। তাঁর এলম, চিন্তা, গবেষণা ও বিশ্লেষণধর্মী কমকাণ্ডের আঙ্গিক ও পরিমণ্ডল এমনই অতুলনীয় যে, সুদীর্ঘ সময়কাল অবধি কোন সচেতন ব্যক্তিই তাঁর অসম অবদানের কথা স্বীকার না করে পারেন নি। মহান আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে যে-কোন বিষয়ের উপর কথা বলার, বুঝানোর এবং সন্দেহ ইত্যাদি নিরসনের যে বিশেষ গুণ দান করেছেন, বস্তুত সেটি তাঁরই প্রাপ্য।

যে বিষয়েই তিনি মুখ খুলেন, সে বিষয়ে সেটিই হয়ে যায় চূড়ান্ত বুলি। কুণ্ঠাহীন ভাষায় বলব, নিজের জ্ঞানের স্বল্পতার কারণে আমি এই কিতাবটি সংকলন করার হকটি যথাযথ আদায় করতে পারি নি। কেননা, তিনি নিজের কথাগুলো

যেই আঙ্গিকে শ্রোতামণ্ডলির উদ্দেশ্যে সহজবোধ্য করে উপস্থাপন করেন, নিঃসন্দেহে আমি সেইরূপে কিতাবটি পরিবেশন করার বেলায় ব্যর্থ হয়েছি। তাই পাঠক সমাজের নিকট আমার আবেদন যে, কিতাবটি পাঠকালে যদি কোন ধরনের অপূর্ণতা, শাব্দিক ভুল-চুক ও মৌলিক ভুলভ্রান্তি লক্ষ্য করে থাকেন, তাহলে সেটিকে আমার যোগ্যতার স্বল্পতা বলে মনে করে সংশোধনের উদ্দেশ্যে আমাকে অবশ্যই অবহিত করবেন। যাতে করে পরবর্তী সংকলনে সংশোধন করে দেওয়া যেতে পারে।

আল্লাহ্ তা'আলা আমাদেরকে তাঁর দীনের সঠিক বোধ দান করুন। আমীন। বিজাহিন নবিয়্যিল মুরসালীন সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম!!

মুহাম্মদ ইলিয়াস কাদেরী
খাদেম, ডক্টর ফরিদুদ্দীন ইসলামিক রিসার্চ ইনস্টিটিউট।

অধ্যায় : ০১

'শহীদ' শব্দের বিভিন্ন অর্থ ও শাহাদাত সম্পর্কে ধারণা

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহীম

ইমাম হোসাইন রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হুর শাহাদাত সম্পর্কে সরাসরি কিছু বলার পূর্বে আমি জানিয়ে দেবার চেষ্টা করব, শাহাদাত কাকে বলে? শাহাদাত শব্দের অর্থ কী কী হতে পারে? ওসব অর্থের দৃষ্টিকোণ থেকে ইসলামে 'শাহাদাতে'র ধারণা কী হতে পারে?

'শাহাদাত' شَهَادَتٌ শব্দের প্রথম অর্থ ও 'শাহাদাতে'র ধারণা :

شَهِدَ, شَاهِدٌ, مَشْهُوْدٌ ও مُشَاهِدَةٌ – শব্দগুলো شُهُوْدٌ মাস্‌দার থেকে উদ্গত। شَهِدَ, يَشْهَدُ, شُهُوْدًا এর কয়েকটি অর্থ রয়েছে। এক অর্থ হচ্ছে 'উপস্থিত হওয়া'। উদাহরণ স্বরূপ কুরআন শরীফের আয়াত পেশ করা হল :

أَمْ كُنتُمْ شُهَدَآءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ ٱلْمَوْتُ ﴿١٣٣﴾

–(হে বনী ইসরাঈল!) তোমরা কি (তখন) বিদ্যমান ছিলে, যখন এয়াকূবের মৃত্যু সমুপস্থিত হয়েছিল (তিনি মৃত্যুর সম্মুখীন হয়েছিলেন)?[১]

আয়াতটিতে شُهَدَاءَ শব্দের মাস্‌দার شُهُوْدٌ টি 'উপস্থিত হওয়া' অর্থে ব্যবহৃত। এই অর্থের দিক থেকে 'শহীদ' তিনিই হলেন, যিনি 'উপস্থিত' হন এবং 'বিদ্যমান' থাকেন।

অনুরূপ জানাযার দোয়ায় আমরা বলে থাকি :

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا وَشَاهِدِنَا.

–হে আল্লাহ্! তুমি মাফ করে দাও আমাদের জীবিতদেরকে, আমাদের মৃতদেরকে, উপস্থিত সবাইকে আর অনুপস্থিতদেরকে।[২]

---

১. আল কুরআন : সূরা বাকারা, ২:১৩৩।

২. তিরমিযী : আস্ সুনান, বাবু মা ইয়াকুলু ফীস্ সালাতি আলাল মাইয়্যাত, ৪/১৫৯; নাসায়ী : আস্ সুনান, বাবুদ্ দোয়া, ৭/৮৭; সুনানে ইবনে মাজাহ্, বাবঃ মা জাআ ফিদ দুআয়ি ফিস সালাতি আলাল জানাযাহ্, ৪/৪৪৮; আবূ দাউদ : আস্ সুনান, বাবঃ মৃত ব্যক্তির জন্য দোয়া, ৮/৪৯৩;

যে স্থানসমূহে হজ্বের মানসিকগুলো পালনের উদ্দেশ্যে হাজী সাহেবানরা একত্রিত হয়ে থাকেন, সেসব স্থানকে مُشَاهِدُ الْحَجِّ 'মুশাহিদুল হজ্ব' বলা হয়। এখানেও مُشَاهِدَةٌ শব্দটি 'উপস্থিত' অর্থে ব্যবহৃত। অনুরূপ লোকজন জমায়েত হওয়ার ময়দানকেও مُشَاهِدُ 'মুশাহিদ' বলা হয়ে থাকে।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, 'শহীদ'রা কোথায় উপস্থিত হন, যে কারণে তাঁদের মৃত্যুকে 'শাহাদাত' বলা হয়? আর প্রশ্ন হচ্ছে এই অর্থের প্রেক্ষাপট বিবেচনায় শাহাদাতের ধারণা কী?

হাদিস শরীফগুলোতে 'শহীদ'দের মৃত্যুতে 'উপস্থিতি'র দুইটি দিক বর্ণনা করা হয়েছে।

উপস্থিতির প্রথম দিক :

'উপস্থিত' হওনের একটি দিক বর্ণনা করা হয়েছে এভাবে যে, মানুষ যখন 'শহীদ' হন, তাঁর প্রাণবায়ু যখন দেহপিঞ্জর থেকে বিদায় নিয়ে যায়, তখন তাকে সরাসরি আল্লাহ্‌র দরবারে উপস্থিত করিয়ে দেওয়া হয়। যথা, সুনানে ইবনে মাজাহ্‌র 'জিহাদ পর্বে' হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ্ রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হু থেকে বর্ণনা রয়েছে, আবদুল্লাহ ইবনে আমর বিন হারাম যখন উহুদ যুদ্ধে শহীদ হয়ে যান, তখন আল্লাহ্‌র রাসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন,

يَا جَابِرُ أَلَا أُخْبِرُكَ مَا قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ لِأَبِيكَ قُلْتُ بَلَى قَالَ مَا كَلَّمَ اللهُ أَحَدًا إِلَّا مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ وَكَلَّمَ أَبَاكَ كِفَاحًا فَقَالَ يَا عَبْدِي تَمَنَّ عَلَيَّ أُعْطِكَ قَالَ يَا رَبِّ تُحْيِينِي فَأُقْتَلُ فِيكَ ثَانِيَةً قَالَ إِنَّهُ سَبَقَ مِنِّي أَنَّهُمْ إِلَيْهَا لَا يُرْجَعُونَ قَالَ يَا رَبِّ فَأَبْلِغْ مَنْ وَرَائِي فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ هَذِهِ الْآيَةَ ﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ أَمْوَاتًا﴾ الْآيَةَ كُلَّهَا،

–হে জাবির! 'আমি কি তোমাকে বলে দেব না, আল্লাহ তা'আলা তোমার পিতাকে কী বলেছেন?' আমি বললাম, 'অবশ্যই!' এরশাদ করলেন, 'কোনরূপ পর্দা ব্যতিরেকে আল্লাহ্ তা'আলা কারো সাথে কথোপকথন করেন নি। কিন্তু তোমার পিতার সাথে কথা বলেছেন

পর্দা ছাড়াই। আর বলেছেন, হে আমার বান্দা! তুমি আমার নিকট কিছু চেয়ে নাও, কেননা, আমি তোমাকে তা দেব।' তোমার পিতা আবেদন করেছিল, 'হে আমার রব! তুমি আমাকে পুনরায় জীবিত করে দাও। তা হলে আমি তোমার রাস্তায় পুনরায় নিহত (শহীদ) হয়ে যাব।' আল্লাহ তা'আলা বললেন, 'আমি তো এ ব্যাপারে পূর্বেই চূড়ান্ত করে ফেলেছি যে, এখানে চলে আসার পর পুনরায় দুনিয়ায় গমন করা যাবে না।' সে আবেদন করল, 'হে আমার রব! তুমি আমার পক্ষ থেকে মানবকুলকে এই সংবাদটুকু জানিয়ে দাও।' এরই প্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা "আর যারা আল্লাহ্‌র রাহে নিহত হয়েছে তাদের তোমরা মৃত ধারণা করিও না وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ أَمْوَاتًا আয়াতটি নাযিল করেন।'

উক্ত আয়াত শরীফ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, উহুদ যুদ্ধে শহীদ হওয়ার সাথে সাথে হযরত আবদুল্লাহ্ রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হুকে আল্লাহর দরবারে উপস্থিত করিয়ে দেওয়া হয়েছিল। আর তিনি কোনরূপ পর্দা ছাড়াই আল্লাহ্‌র দীদার লাভ করেছিলেন। মৃত্যুকালে আল্লাহ্‌র দরবারে সরাসরি রূহ উপস্থিত হয়ে যাওয়ার এই সৌভাগ্যটি কেবল শহীদরাই লাভ করে থাকেন। অন্যথায় রূহের জন্য হাজারো পর্দা হয়ে থাকে। যেসব পর্দার কারণে আল্লাহ্‌র দরবার তো দূরের কথা, আরশে মুয়াল্লায় গিয়ে উপস্থিত হওয়ার বেলাতেও প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয়ে যায়। এই পর্দাগুলো হয়ে থাকে বান্দার দুনিয়াবী আমল, কাজ-কারবার ও বিভিন্ন অবস্থাদির প্রেক্ষিতেই। বান্দা তার দুনিয়াবী আমলের পরিপ্রেক্ষিতে এই যোগ্যতা অর্জন করতে পারে না যে, তার পক্ষে আল্লাহ্‌র দরবারে উপস্থিত হওয়ার সৌভাগ্য অর্জিত হবে। কিন্তু শাহাদাতের মৃত্যু তাকে সেই যোগ্যতা দান করল। সে মুহূর্ত মধ্যেই দূরত্বকে অতিক্রম করে আল্লাহর দরবারে পৌঁছে যায়।

শহীদ হওয়ার মুহূর্তে শহীদের রূহকে আল্লাহর দরবারে উপস্থিত করিয়ে দেওয়া হয় বলেই তাকে শহীদ বলা হয়। এর অর্থ হচ্ছে আল্লাহর দরবারে রূহানীভাবে উপস্থিত হওয়া লোক। এভাবে 'শাহাদাতে'র মর্মার্থ দাঁড়াল 'সেই মৃত্যু যা কোনরূপ পর্দা ব্যতিরেকে বান্দাকে আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে উপস্থিত করিয়ে দেয়'।

উপস্থিতির দ্বিতীয় দিক :

হাদিস শরীফে 'উপস্থিত হওনের' দ্বিতীয় দিক বর্ণিত হচ্ছে, শহীদের রূহ যখন দেহপিঞ্জর থেকে উধাও হওয়ার উপক্রম হয়, তখন হাজার হাজার ফেরেশতাকে সেই রূহটির কাছে উপস্থিত করিয়ে দেওয়া হয়। সেই ফেরেশতাদেরই সম্মুখে অত্যন্ত সম্মান ও মর্যাদা দানের মাধ্যমে শহীদের রূহটি কবজ করে আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে পেশ করে দেওয়া হয়। যথা, হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হু থেকে বর্ণিত, '(উহুদ যুদ্ধের দিন) আমার আব্বাজানের লাশ নবী পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের সম্মুখে উপস্থিত করা হল। কাফিররা তাঁর বিভিন্ন অঙ্গ কর্তন করে নিয়েছিল। জানাযাটি যখন নবী পাকের সম্মুখে ছিল, আমি তখন সময়ে সময়ে কাফন খুলে আমার আব্বাজানের দিকে তাকাচ্ছিলাম। এ কারণে লোকজন আমাকে বারণ করছিল। এমন সময় নবী পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম জনৈক মহিলার চিৎকারের আওয়াজ শুনতে পেলেন। খোঁজ নিয়ে জানা গেল তিনি ছিলেন আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হুর বোন কিংবা ফুফু। তখন নবী পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে এই বলে নিষেধ করলেন,

لَا تَبْكِي فَمَا زَالَتْ الْمَلَائِكَةُ تُظِلُّهُ بِأَجْنِحَتِهَا.

–তুমি কান্নাকাটি করিও না। এর (আবদুল্লাহ্র) উপর তো ফেরেশতারা তাদের ডানার ছায়া দিয়ে রয়েছে।[১]

শহীদের মৃত্যু 'মাশহুদ বিল মালায়িকা' (ফেরেশতা কর্তৃক পরিদৃষ্ট) হয়ে থাকে। অতএব, তাকে এ কারণেই 'শহীদ' বলা হয় যে, তার মৃত্যুর সময় ফেরেশতারা উপস্থিত থাকেন।

নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য 'শহীদ' শব্দের ব্যবহার :

পবিত্র কুরআনে নবী পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য 'শহীদ' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে আল্লাহ্র দরবারে উপস্থিত হওয়া, পর্দা না থাকা এবং দর্শন লাভের পরমত্ব ও চরমত্ব বুঝানোর জন্যই। অর্থাৎ যে মর্যাদা অর্জনের জন্য শহীদদের মস্তক বিসর্জন দিতে হয়, সেই মর্যাদার চরমত্ব নবী পাকের জন্য এমনিতেই অর্জিত রয়েছে। কেননা, শাহাদাতের এই অর্থটি মূলত

[১]. সহীহ বোখারী, কিতাবুল জিহাদ, বাবু জিল্লিল মালায়িকাতি আলাশ শহীদ, ৫/৩৯; মুসলিম : আস্ সহীহ, ১২/২৪৮; নাসায়ী : আস্ সুনান, বাবু তাসজিয়াতুল মাইয়্যাত, ৬/৩৮১; নাসায়ী : সুনানুল কুবরা, ১/৬০৫; তাবরানী : মু'জামুল কবীর, ১৮/৯৪;

পরম ও চরমভাবে কেবল নবী পাকের সত্তার মধ্যেই নিহিত রয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় মাহবুবকে যেক্ষেত্রে "أَوْ أَدْنَىٰ" (বরং আরো নিকটে) বলে আহবান করেছেন, পর্দাও হটিয়ে দেওয়া হয়েছে, তাহলে নবী পাকের জন্য তো কেবল নৈকট্যই না; বরং দিব্য দর্শনই অর্জিত হয়ে গিয়েছিল। যেহেতু শাহাদাতের এই পরমত্ব অন্য কারো মধ্যে বিদ্যমান হওয়া সম্ভবপর ছিল না, সেহেতু তাঁকে তাঁর উম্মতদের জন্যও 'উপস্থিত' ও 'সাক্ষী' বানিয়ে দেওয়া হয়।

আল্লাহ্ তা'আলা এরশাদ করছেন :

وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ﴿١٤٣﴾

–আর আমার রাসূল থাকবেন তোমাদের সাক্ষী স্বরূপ (অবস্থাদির চাক্ষুষ পর্যবেক্ষণকারী স্বরূপ)।[১]

উভয় জগতের আকা নবীয়ে পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বীয় উম্মতগণের জন্য সাক্ষীই তো। কেননা, তিনি তাঁর উম্মতগণের অবস্থাদি পর্যবেক্ষণ করতেই রয়েছেন। পর্যবেক্ষণ করার জন্য কপালের চোখই শর্ত নহে; বরং মনের চোখ দিয়েও করা যায়। যথা, ইমাম রাগিব ইস্পাহানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহ্ 'আল মুফরাদাত' কিতাবে 'শহুদ' شُهُوْدٌ শব্দের অর্থ এভাবে লিখছেন :

الشُّهُودُ والشَّهَادَةُ: اَلْحُضُوْرُ مَعَ الْمُشَاهَدَةِ، إِمَّا بِالْبَصَرِ أَوْ بِالْبَصِيْرَةِ،

–شُهُوْدٌ ও شَهَادَتٌ মানে হচ্ছে مُشَاهَدَةٌ সহকারে (পর্যবেক্ষণ সহকারে) উপস্থিত থাকা, তা (এই পর্যবেক্ষণ) দিব্য দর্শনের মাধ্যমে হোক কিংবা অন্তরদর্শনের মাধ্যমে।[২]

'শহীদ' মৃত্যুবরণ করেও কীভাবে জীবিত থাকেন :

শহীদদের উপর যখন জ্বলওয়ায়ে হক বিকশিত হয় আর তাঁদের রূহগুলো যখন আল্লাহ তা'আলার নিকট নিয়ে যাওয়া হয়, তখন আল্লাহ তা'আলা তাদের উপর এমনভাবে নূরের তজল্লী দান করেন, যা তাদের রূহগুলোকে আলোকময় করে তোলে, তাদের মধ্যে গুণাগুণ সৃষ্টি করে এবং তাদের মাঝে বহুরূপ শক্তির সঞ্চার হয়। আর এই রূহগুলো যদিও তাদের দেহ থেকে অনেক দূর ইল্লীনে

[১]. আল কুরআন : সূরা বাকারা, পারা : ২, ২/১৪৩;
[২]. ইমাম রাগিব আল ইস্পাহানী : আল মুফরাদাত, ১/৪৬৫;

অবস্থান করে, তবু তাদের দেহগুলোকে কবরের মধ্যে সহীহ-সালামতে জীবন্ত অবস্থায় রাখে। সূর্য যেমন উদ্ভিদজগত থেকে কোটী কোটী মাইল উর্ধ্বে অবস্থান করেও স্বীয় তাপ ও প্রভাবে পৃথিবীপৃষ্ঠের উদ্ভিদগুলোকে জীবিত ও সুস্থ রাখে।

বান্দা যখন একান্ত আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে মৃত্যুকে বরণ করে নেয়, তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর দীদার, নৈকট্য ও রেজামন্দি হাছিলের উদ্দেশ্যে আপন জীবন বিসর্জনকারী সেই বান্দার রূহকে আলো, কিরণ, প্রভাব ও শক্তি দান করেন। এমনভাবে যে, কোটী কোটী সূর্যও তার সামনে হার মানায়। অতএব, আল্লাহ তা'আলার বান্দাদের দেহগুলো পৃথিবীর মধ্যে অবস্থান করেও রূহের প্রবাহ দ্বারা তর-তাজা থাকে এবং অনন্তকালের জন্য জীবিত ও সুস্থ থাকে।

এখানে এই কথাটিও মনে রাখতে হবে যে, উদ্ভিদজগতে কিরণ পৌঁছানোর জন্য তার ভেতরে সূর্যের অবস্থানের প্রয়োজন নাই। উদ্ভিদের দরকার তো কেবল তার তাপ ও কিরণেরই; সূর্যের না। কেননা, কৃত্রিম উপায়ে যদি উদ্ভিদের এই প্রয়োজনগুলো পূরণ করে দেওয়া হত, তা হলে উদ্ভিদের পক্ষে সূর্যের আর কোন প্রয়োজনই থাকত না। অনুরূপ রূহ দেহের ভেতরে অবস্থান করুক বা বাইরে, উভয়ই সমান। কেননা, দেহের পক্ষেও রূহের কোন প্রয়োজন নাই। বরং কেবল সেই প্রভাবটিরই প্রয়োজন, যা দিয়ে সে জীবন্ত ও সুস্থ থাকতে পারবে। অতএব, রূহটি বাইরে অবস্থান করেও যদি এত শক্তিশালী থাকে যে, নিজের প্রবাহের প্রভাব দেহে সরবরাহ করতে পারে, তা হলে দেহটি যেমনিরূপ জীবিত থাকা অবস্থায় সুস্থ ও জীবন্ত ছিল অনুরূপভাবে মৃত্যুর পরও জীবন্ত ও সুস্থ থাকবে।

হযরত ওযাইর আলাইহিস সালাম সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে উল্লেখ রয়েছে যে, তিনি এক হাজার বৎসর যাবৎ পুরাতন এক লোকালয়ের পাশ দিয়ে গমন করছিলেন, যেখানে হাজারো বৎসরের পুরাতন কবরগুলো বিদ্যমান ছিল। মুর্দাদের দেহের নিশানাও ছিল না। চতুর্দিক থেকে বালি উড়ছিল। এ অবস্থা দেখে তাঁর ধারণা হয়েছিল, এসব নমুনাবিহীন মৃতদেহগুলোকে আর অস্তিত্বহীন লোকালয়গুলোকে কেয়ামত দিবসে আল্লাহ তা'আলা কীভাবে জীবিত করবেন? সাথে সাথে আল্লাহ তা'আলা তাঁর উপর একশত বৎসরের জন্য মৃত্যু অবধারিত করে দিলেন।

فَأَمَاتَهُ ٱللَّهُ مِاْئَةَ عَامٍ ﴿٢٥٩﴾

–অতএব আল্লাহ্ তাঁকে একশত বৎসরের জন্য মৃত করে রাখলেন।[১]

যেই মানবদেহ ছয় মাস কি এক বৎসর পর পঁচে-গলে যায়, পবিত্র কুরআন সাক্ষী, সেই মানবদেহই প্রাণহীনভাবে একশত বৎসর পর্যন্ত মরু-প্রান্তরে ঠায় পড়েই ছিল, অথচ পঁচেও নি, গলেও নি। এতে প্রতীয়মান হয় যে, রূহের প্রভাব ও প্রাণশক্তি যদি বিদ্যমান থাকে, সেটি যদি দেহের ভেতর অবস্থান নাও করে থাকে, তবু সেই দেহের পার্থিব অবস্থানের কোন পরিবর্তন হয় না।

হযরত সোলায়মান আলাইহিস সালাম সম্পর্কে কুরআনের ভাষ্য হল, তিনি দানব-জাতিকে বাইতুল মুক্‌দাসের মসজিদটি নির্মাণ করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। দানব-জাতি ছিল তাঁর আদেশের অধীন। আদেশ পেয়েই তারা পাথর, চুন ও ইট দিয়ে নির্মাণের কাজে নিয়োজিত হয়ে গেল। এদিকে সোলায়মান আলাইহিস সালাম নিজ লাঠির উপর ভর করে তাদের দেখা-শোনা করতেন। সেই অবস্থাতেই সোলায়মান আলাইহিস সালামের ওফাত হয়ে যায়। মুফাস্‌সিরীনদের ভাষ্য মতে ওফাতের পরও তিনি পূর্ণ এক বৎসর যাবৎ সেই আসার উপর ভর দিয়ে ঠায় দাঁড়িয়েই ছিলেন। আর এদিকে দানবরা বরাবরই তাদের কাজ চালিয়ে যাচ্ছিল। তাঁর প্রতাপ ও প্রতিপত্তির এমন অবস্থা ছিল যে, তারা মনে করছিল, হযরত সোলায়মান আলাইহিস সালাম দিব্যি দেখেই রয়েছেন। উই পোকায় ধরার কারণে আসাটি যখন ভেঙে গেল আর তিনিও পড়ে গেলেন, তখনই দানবরা মূল বিষয়টি বুঝতে পেরেছিল। এবং পূর্ণ এক বৎসর যাবৎ পণ্ডশ্রম দেবার জন্য আফসোস করেছিল। কুরআন শরীফে যেমন এ ব্যাপারে এরশাদ হচ্ছে :

فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ ٱلْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَىٰ مَوْتِهِۦٓ إِلَّا دَآبَّةُ
ٱلْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنسَأَتَهُۥ ۖ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ ٱلْجِنُّ أَن لَّوْ كَانُوا
يَعْلَمُونَ ٱلْغَيْبَ مَا لَبِثُوا۟ فِى ٱلْعَذَابِ ٱلْمُهِينِ ﴿١٤﴾

–অতঃপর আমি যখন তার জন্য মৃত্যু ঘটিয়ে দিলাম, তখন কেবল একটি 'দাব্বাতুল আরদ্ব' (কীট অর্থাৎ উই পোকা) ব্যতীত কিছুই

[১]. আল কুরআন : সূরা বাকারা, পারা : ২, ২/২৫৯;

তাদেরকে (দানবদেরকে) তার মৃত্যু সম্বন্ধে অবহিত করল না, যে (কীট)টি ভক্ষণ করেছিল তার (সোলায়মান আলাইহিস সালামের) আসাটি। অতঃপর (মসজিদের নির্মাণ কাজ যখন শেষ হয়ে গেল) তিনি যখন পড়ে গেলেন, দানবরা তখন বুঝতে পারল যে, (সোলায়মান আলাইসি সালামের ওফাত হয়ে গেছে। আর যখন তাদের জট খুলে গেল যে,) তারা যদি গাইব জেনে থাকত, তাহলে এই অসম্মান জনক কাজে (লেগে) থাকত না।[১]

মৃত্যু পর দেহ অক্ষত থাকা কেবল নবীগণের বেলাতেই নহে, বরং নবী নন এমন কারো বেলাতেও হয় বলে সাব্যস্ত রয়েছে। যথা, সূরা কাহাফে উল্লেখ রয়েছে যে, হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের দীনের সাতজন অনুসারী দাকইউনুসের অত্যাচার, নীপিড়ন ও জোর-জুলুমে অতীষ্ঠ হয়ে কোনভাবে আশ্রয় পাওয়ার জন্য কোন এক পর্বতের গুহায় গিয়ে ঠাঁই নিয়েছিলেন। তাঁরা সেই গুহায় তিনশত নয় বৎসর যাবৎ অবস্থান করেছিলেন। আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করছেন :

وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَٰثَ مِائَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا ﴿٢٥﴾

–আর তারা (আসহাবে কাহাফগণ) তিন শত উপরি নয় বৎসর কাল যাবৎ তাদের গুহায় অবস্থান করে। (সৌর বৎসর অনুযায়ী নয় বৎসর আর চন্দ্র বৎসর অনুযায়ী আরো নয় বৎসর বেশি)।

কোন গুহার অভ্যন্তরে এহেন দীর্ঘ সময়কাল পর্যন্ত অবস্থান করা সত্ত্বেও তাঁদের দেহ পঁচে-গলে যায় নি। শুধু তাঁরাই নন, বরং তাঁদের সেই কুকুরটির দেহও অক্ষত ছিল। কঠোরভাবে তাড়িয়ে দেওয়ার পরও কুকুরটি তাঁদের সঙ্গ ছাড়ছিল না।

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা ওয়াদা করেছেন, যে ব্যক্তি একটি মাত্র নেক কাজ সম্পাদন করবে, আমি তাকে অনুরূপ দশটি সওয়াব দান করে থাকি। সে দশটি নেকীরই সওয়াব পেয়ে থাকে:

مَن جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا ﴿١٦٠﴾

১. আল কুরআন : সূরা সাবা, পারা ২২, ৩৪/১৪;

–আর যে ব্যক্তি (আল্লাহ্‌র দরবারে) একটি নেক কাজ নিয়ে আসে তার জন্য তার বিপরীতে অনুরূপ দশটি নেক কাজের সওয়াব রয়েছে।[১]

আল্লাহ্ তা'আলা যখন এই নিয়ম করে দিয়েছেন যে, একের বদলে দশ দান করা হয়, তা হলে আল্লাহর ওয়াস্তে যে ব্যক্তি একটি জীবন উৎসর্গ করে দেবে সে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র নিকট দশটি জীবন কেন পাবে না? নিঃসন্দেহে এমন ব্যক্তিকে আল্লাহ্ তা'আলা দশটি জীবন দান করবেন।

আল্লাহ্‌র অলী ও নেককার বান্দাদের দেহ অক্ষত অবস্থায় থাকার কথা কুরআন-হাদিস ছাড়াও ঐতিহাসিকভাবেও প্রমাণিত। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে, ষাট-সত্তর বৎসর পূর্বে ইরাকে বাগদাদের নিকটে দুইজন সাহাবী (হযরত সালমান ফারেসী এবং হযরত জাবির রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা)র কবর উম্মুক্ত করা হয়েছিল। কারণ, তাঁরা দুজন প্রায় নদী-ভাঙ্গনের শিকার হচ্ছিলেন। অথচ তেরশত বৎসর অতিবাহিত হয়েই গিয়েছিল। তাঁদের দেহ তো দেহই; কাফনেও পর্যন্ত চোট লাগে নি। ঘটনাটি আন্তর্জাতিকভাবে ফলাও করা হয়েছিল। ইরাক সরকার একুশবার তোপধ্বনি বাজিয়ে পূর্ণ সরকারি মর্যাদায় তাঁদেরকে পুনরায় দাফন করেছিল। এই ঘটনার প্রেক্ষিতে কোটী কোটী অমুসলিম ইসলামের সত্যতা স্বীকার করে ঈমান এনে ফেলেছিলেন।

'শহীদে'র দ্বিতীয় অর্থ এবং শাহাদাতের ধারণা :

شَهِدَ, يَشْهَدُ, شُهُوْدًا -এর অপর অর্থ হচ্ছে 'প্রাপ্ত হওয়া'। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করছেন :

فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ﴿١٨٥﴾

–অতএব, তোমাদের মধ্য থেকে যে ব্যক্তি এই মাসটি প্রাপ্ত হবে (অর্থাৎ রমজান মাসে জীবিত থাকবে), সে যেন সম্পূর্ণ মাসটিতে রোজা রাখে।[২]

এই অর্থের দিক বিবেচনায় 'شَهِيْدٌ' (শহীদ) শব্দের অর্থ হবে 'কোন বস্তু-প্রাপ্ত ব্যক্তি'।

১. আল কুরআন : সূরা আন'আম, ৬:১৬০;
২. আল কুরআন : সূরা বাকারা, ২:১৮৫;

এখন প্রশ্ন হল, এই অর্থের দিক বিবেচনায় 'শাহাদাতে'র মর্মার্থ কী হবে? শহীদ ব্যক্তি কোন্ বস্তুই বা পেয়ে থাকেন? প্রশ্নটির জবাব আমরা হাদিস শরীফ থেকে পেতে পারি। মাহন আল্লাহ তা'আলা আলমে বরযখে (কবরের জগতে), আলমে ওকবায় (প্রতিফল জগতে) এবং জান্নাতে কোন মু'মিন-মুসলমানের জন্য যেসব বখশিশ ও প্রতিদানের কথা ওয়াদা করেছেন এবং সেই বান্দাকে যেসব নেয়ামত ও সৌভাগ্য দান করা হবে বলে ঘোষণা দিয়েছেন, সেসব ওয়াদা ও ঘোষণা সেই ব্যক্তি কার্যত প্রাপ্ত হবেন শাহাদাতের মৃত্যুর ঘাট পার হওয়ার অব্যবহিতি পরেই। পবিত্র হাদিসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করছেন :

لِلشَّهِيدِ عِنْدَ اللهِ سِتُّ خِصَالٍ يَغْفِرُ لَهُ فِي أَوَّلِ دُفْعَةٍ مِنْ دَمِهِ وَيُرَى مَقْعَدَهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَيُجَارُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَيَأْمَنُ مِنَ الْفَزَعِ الْأَكْبَرِ وَيُحَلَّى حُلَّةَ الْإِيمَانِ وَيُزَوَّجُ مِنَ الْحُورِ الْعِينِ وَيُشَفَّعُ فِي سَبْعِينَ إِنْسَانًا مِنْ أَقَارِبِهِ

–শহীদের জন্য আল্লাহ্র নিকট হতে ছয়টি বখশিশ রয়েছে। (এক) রক্ত প্রবাহিত হওয়ার সাথে সাথে সমস্ত গুনাহ মাফ করে দেওয়া হয়। (দুই) জান্নাতে নিজের স্থান স্বচক্ষে অবলোকন করে। (তিন) কবরের আজাব থেকে হেফাজতে থাকে। (চার) কেয়ামতের বিভীষিকা ও ভয়-ভীতি থেকে হেফাজতে থাকবে। (পাঁচ) তাকে ঈমানের পোশাক পরানো হয় এবং হুরদের সাথে তার বিয়ে করিয়ে দেওয়া হয়। (ছয়) তার আত্মীয়-স্বজনদের মধ্য থেকে তাকে সত্তরজনের পক্ষে সুপারিশ করবার অনুমতি দেওয়া হয়।[১]

এখানে বুঝার একটি বিষয় যে, যে-কোন মুমিন বলতেই তো আল্লাহ্র পক্ষ থেকে বিভিন্ন ধরনের বখশিশ পেয়ে থাকেই, কিন্তু শহীদ ব্যতীত অন্যান্যদের বেলায় আল্লাহ্র সেসব নেয়ামত হাছিল করার ক্ষেত্রে সময় লেগে যায়। তাদেরকে হিসাব-কিতাবের শিকার হতে হয়, মুনকির-নকীরের সওয়ালের জবাব দিতে হয় এবং সওয়াব ও আজাবের বিভিন্ন ঘাট অতিক্রম করে আসতে হয়। এত কিছুর পরেই কোন বান্দা আল্লাহ্র ওয়াদা পর্যন্ত পৌঁছানোর সৌভাগ্য পায়। কিন্তু শাহাদাতের মৃত্যুটি এমন এক পরম মর্যাদা, যা মাত্র এক কদমেই

১. তিরমিযী : আস্ সুনান, বাবু ফীস্ সাওয়াবিশ শহীদ, ৬/২২৬; ইবনে মাজাহ : আস্ সুনান, বাবু ফযলিশ্ শাহাদাদি ফী সাবিলিল্লাহ, ৮/৩০৯;

সমস্ত ঘাট পার করিয়ে দেয়। এদিকে দেহপিঞ্জর থেকে প্রাণবায়ূ উড়ে যায়, ওদিকে শহীদ সেই মুহূর্তেই সব কটি বখশিশ অর্জন করে ফেলে; যা আলমে বরযখ ও আলমে আখিরাতের সাথে সম্পৃক্ত। তাই তাকে শহীদ বলা হয়ে থাকে। কেননা, আল্লাহ্ তা'আলা যেসব ওয়াদা তার সাথে করে রেখেছিলেন, শাহাদাতের মুহূর্তে সে সেসব প্রাপ্ত হয়ে গেছে।

'শহীদে'র তৃতীয় অর্থ এবং শাহাদাতের ধারণা :

اَلْحُضُوْرُ مَعَ الْمُشَاهَدَةِ اِمَّا بِالْبَصَرِ اَوْ بِالْبَصِيْرَةِ -এর এক অর্থ হচ্ছে شَهِدَ, يَشْهَدُ, شُهُوْدًا (আল মুফরাদাত লিল ইমাম রাগিব ইস্পাহানী) 'চাক্ষুষ বিদ্যমান ও উপস্থিত থাকা। চাই কপালের চোখ দিয়ে দেখে থাকুক, চাই মনের চোখ দিয়ে।' এই অর্থের দৃষ্টিকোণ থেকে 'শহীদ' শব্দের অর্থ দাঁড়াবে 'চাক্ষুষ দর্শক' বা 'চাক্ষুষ বিদ্যমান'। পবিত্র কুরআন-সুন্নাহ্র আলোকে আমরা খতিয়ে দেখছি, 'শহীদ' কী দেখেন, যে কারণে তাকে 'শহীদ' বলা হয়? আর এই অর্থের প্রেক্ষাপটে 'শাহাদাতে'র কী ধারণা পোষণ করতে হবে?

হাদিস শরীফে উল্লেখ পাওয়া যায় যে, আল্লাহ্র রাহে জীবন বিসর্জনকারীর প্রাণ তার দেহপিঞ্জর থেকে উধাও হয়ে যাবার সাথে সাথেই সে 'শাহাদাতে'র সুধা পান করে। এদিকে তার জন্য সব ধরনের পর্দা উঠিয়ে দেওয়া হয়। আর সেই মুহূর্তে সে আল্লাহ তা'আলার পরম সৌন্দর্যের দর্শন লাভ করে এবং সুন্দর গুণাবলির দীদার লাভ করে। আল্লাহ তা'আলার দীদার এমন নেয়ামত যা সকলের ভাগ্যেই জোটে না। যেহেতু 'শাহাদাতে'র মৃত্যু আল্লাহ তা'আলার দীদার ও তাঁর গুণাবলির সৌন্দর্যের জলওয়া অর্জনেরই মাধ্যম, সেহেতু সেই প্রাণ বিসর্জনকারী ব্যক্তিকে 'শহীদ' বলা হয়। এবং তাঁর মৃত্যুকে বলা হয় 'শাহাদাত'।

জান্নাতে প্রবেশ করবে অগণিত-অসংখ্য লোক। তারা সেখানে অত্যন্ত আনন্দে ও পুলকেই থাকবে। জান্নাতবাসীদের মাঝে এমন কোন ব্যক্তি থাকবে না যে জান্নাত লাভ করার পর পুনরায় পৃথিবীতে ফিরে আসার বাসনা করবে। কারণ, জান্নাত হচ্ছে পরম সুখ ও সাচ্ছন্দ্যের জায়গা। আর তা আল্লাহ তা'আলারই দান, বখশিশ, আনন্দ ও বিনোদনের মূল উৎস। জান্নাত সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে উল্লেখ রয়েছে :

وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِيٓ أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ ﴿٣١﴾

–আর সেখানে তোমাদের জন্য এমন সব কিছু বিদ্যমান রয়েছে, যা তোমাদের মন চায়।[১]

দুনিয়াতে মানুষ তো কেবল অন্বেষায় থাকে। জান্নাতে যেহেতু সকল অভাব ও চাহিদা পূর্ণ হয়ে যাবে, সেহেতু জান্নাত লাভের পর মানুষের মধ্যে অন্বেষা ভাব চলে যাবে। সে আর কিছুরই বাসনা করবে না। এটি যেন সেই সর্বোৎকৃষ্ট স্থান যার চেয়ে উৎকৃষ্ট কোন জায়গাই আর হয় না। এমন হওয়া সত্ত্বেও জান্নাতে শহীদের মন সর্বদা এই বাসনা করতে থাকবে যে, ইশ! আরেকটি বার যদি দুনিয়াতে যেতে পারতাম! দশ দশ বার জীবন লাভ করতাম। দশ বারই শহীদ হতে পারতাম! আবারও– আবারও, শুধু শাহাদাতের মৃত্যু পেতে থাকতাম! শাহাদাতের মৃত্যুর যে অতুলনীয় স্বাদ তা বারংবার পেতে থাকতাম!

হযরত আনস বিন মালেক রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হু রেওয়ায়ত করেছেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন,

لَا أَحَدٌ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ يُحِبُّ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الدُّنْيَا وَلَهُ مَا عَلَى الْأَرْضِ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا الشَّهِيدُ يَتَمَنَّى أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الدُّنْيَا فَيُقْتَلَ عَشْرَ مَرَّاتٍ لِمَا يَرَى مِنْ الْكَرَامَةِ

–জান্নাতে প্রবেশ-করা কোন ব্যক্তি এমন থাকবে না যে, পুনরায় দুনিয়াতে ফিরে আসার বাসনা করবে। তাকে দুনিয়ার সকল ভোগ-বিলাস ও ধন-সম্পদ দেওয়ার কথা বলা হলেও সে সেই বাসনা করবে না। কিন্তু শহীদ দুনিয়াতে ফিরে আসার বাসনা করবে। সে বাসনা করবে পুনরায় দুনিয়ায় ফিরে আসার। অতঃপর দশবার কতল হওয়ার। কেননা, সে শহীদ হওয়ার মর্যাদা স্বচক্ষে দেখে নিয়েছে।[২]

শাহাদাতের মৃত্যুর স্বাদ কেমন? এই ধারণাটি আমরা যদি অনুধাবন করতে পারি, তাহলে হয়ত এক দণ্ড বেঁচে থাকার ইচ্ছাও আমাদের থাকবে না। শাহাদাতের মৃত্যুর স্বাদ এমন এক স্বাদ যে, শহীদ জান্নাতে স্থির থাকতে পারে না। জান্নাতে অবস্থান করেও সে পুনরায় দুনিয়াতে ফিরে আসার এবং বারংবার

১. আল কুরআন : সূরা আস সাফ্ফাত, ৪১:৩১;
২. বুখারী : আস্ সহীহ্, কিতাবুল জিহাদ, বাবু তামান্নাল মুজাহিদ, ৯/৩৯৬; আবুল ইয়ালা : আল মুসনাদ, ৭/৯০;

শাহাদতের মৃত্যুর সুধা পান করার বাসনা করে। হযরত আনস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হু থেকে বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন :

يُؤْتَى بِالرَّجُلِ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَيَقُولُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ يَا ابْنَ آدَمَ كَيْفَ وَجَدْتَ مَنْزِلَكَ فَيَقُولُ أَيْ رَبِّ خَيْرَ مَنْزِلٍ فَيَقُولُ سَلْ وَتَمَنَّ فَيَقُولُ أَسْأَلُكَ أَنْ تَرُدَّنِي إِلَى الدُّنْيَا فَأُقْتَلَ فِي سَبِيلِكَ عَشْرَ مَرَّاتٍ لِمَا يَرَى مِنْ فَضْلِ الشَّهَادَةِ.

–জান্নাতবাসীদের মধ্য থেকে এক ব্যক্তিকে নিয়ে আসা হবে। আল্লাহ্ তাকে লক্ষ্য করে বলবেন, 'হে আদম-সন্তান! কেমন ঠিকানা মিলেছে তোমার?' সে বলবে, 'আমি এখন খুবই উৎকৃষ্ট ঠিকানায় রয়েছি।' অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাকে বলবেন, 'তোমার আর কিছু চাওয়ার থাকে তো চেয়ে নাও।' সে তখন বলবে, 'হে আল্লাহ্! আমার বাসনা হচ্ছে তুমি আমাকে পুনরায় পৃথিবীতে পাঠিয়ে দাও। আমি যেন তোমার রাহে দশবার শহীদ হতে পারি।' (এই আবেদনটি সে সে কারণেই করবে) কেননা, সে আল্লাহ্ তা'আলার নিকট শহীদের মর্যাদা স্বচক্ষে অবলোকন করে থাকবে।[১]

শহীদ হওয়ার সময় আপন মহান প্রতিপালকের সম্মুখে জীবন উৎসর্গ করে দেওয়ার মাধ্যমে যে স্বাদ শহীদের অর্জিত হয়, সেই স্বাদ সে জান্নাতের সর্বময় নেয়ামতসমূহেও উপভোগ করতে পায় না। তাই সে বাসনা করে, বার বার দুনিয়ায় আসার জন্য। সে যেন প্রতি বারেই আল্লাহ্র রাহে শহীদ হতে পারে।

শহীদ হওয়ার সময় পরম সৌন্দর্যের জলওয়ার যে স্বাদ শহীদ উপভোগ করে, সে সেই স্বাদ ও মজায় সর্বদা মজে থাকে, সেই ভাবনায় বিভোর থাকে। আর বাসনা করে যে, এই স্বাদ যেন সে বারংবার উপভোগ করতে পায়। কোন ব্যক্তি যেমন বসন্তকালে কোন বাগানে পানি সিঞ্চন করে। বাগান সজীব হয়ে যায়। চতুর্দিকে সুন্দর সুন্দর ফুল সুরভি ছড়ায়। কলি আসে। বাসন্তী হাওয়া বইতে থাকে। বাগানে নয়নাভিরাম দৃশ্য ফুটে ওঠে। এমন মনোমুগ্ধকর পরিবেশ সে যদি পূর্বে কখনো না দেখে থাকে, তা হলে এমন পরিবেশ ও দৃশ্য ব্যক্তিটির খুবই ভাল লাগবে। বৎসরের পর বৎসর পরেও চোখ দুখানি বন্ধ করে

১. সুনানে নাসাঈ, কিতাবুল জিহাদ, বাবু মা তামান্না আহ্লুল জান্নাহ্, ১০/২৩৪;

সেই দৃশ্যটির কথা ভেবে ভেবে বিমোহিত হয়ে থাকবে। এই দৃশ্যটি সে যদি কখনো স্বপ্নেও দেখতে পায়, তখনো সে এক পুলক শিহরণ অনুভব করবে। পার্থিব এই রূপ ও সৌন্দর্য যা সে দেখেছে তা বিলক্ষণ অপূর্ণ ও নশ্বর। এমনতর অপূর্ণ ও নশ্বর সৌন্দর্য অবলোকন করাতেও মনে পুলক সৃষ্টি হয়। আর বৎসরের পর বৎসর পরেও মানুষ সেই সৌন্দর্যের কথা মনে মনে ভেবে মুগ্ধ হয়ে থাকে। তা হলে একবার ভেবে দেখুন তো, যে সৌন্দর্য থেকেই জন্ম নিয়েছে সকল সুন্দরের, যে সৌন্দর্য বিতরণ করে সর্বময় রূপ ও আকর্ষণ, সেই পরম সুন্দরের জলওয়া যখন উদ্ভাসিত হবে, যেসব চোখ সেই সুন্দরকে অবলোকন করে থাকবে, তাদের অবস্থা কেমন হবার কথা!

শাহাদাতের মৃত্যুর কষ্ট পিঁপড়ার কামড় সমতুল্য :

আল্লাহ্‌র রাহে শাহাদাতের মৃত্যু এমন সৌভাগ্য ও খোশ নসীবেরই মৃত্যু যে, প্রাণবায়ু দেহপিঞ্জর থেকে উড়ে যাওয়ার সাথে সাথেই পরম সৌন্দর্যের জলওয়ার পর্দা উন্মুক্ত হয়ে যায়। বান্দা তা দেখতে বিভোর থাকে। এ কারণেই শাহাদাতের সময় শহীদের কেবল ততটুকু কষ্টই অনুভূত হয়, যতটুকু কষ্ট মানব দেহে অনুভব হয় মাছি বা পিঁপড়ার দংশনে। যথা, হযরত আবু হোরায়রা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন :

مَا يَجِدُ الشَّهِيدُ مِنْ مَسِّ الْقَتْلِ إِلَّا كَمَا يَجِدُ أَحَدُكُمْ مِنْ مَسِّ الْقَرْصَةِ.

—শাহাদাতের সময় কোন শহীদ ততটুকু কষ্টই অনুভব করে যতটুকু কষ্ট তোমরা অনুভব কর পিঁপড়ার কামড়ে।[১]

আল্লাহ্ রাস্তায় প্রাণ সিবর্জন দিতে গিয়ে শহীদদের কষ্ট অনুভব না হওয়ার কারণ হল বান্দাটি শাহাদাতের সময় আল্লাহ্ তা'আলার সৌন্দর্যের জলওয়া দর্শনেই বিভোর থাকে। সেই সময়ে একটি কী, হাজারো তরবারিও যদি তার উপর চলতে থাকে, তবু তার কোন কষ্টই অনুভব হয় না!

পবিত্র কুরআন থেকে প্রমাণ :

আল্লাহ্‌র সৌন্দর্যের জলওয়ায় বিভোর-হওয়া আশেকদের শিরগুলো যদি বিসর্জন দেওয়া হয় তাতে তাদের কষ্টই বা কেন অনুভব হবে, যেক্ষেত্রে তা

১. তিরমিযী : আস্ সুনান, বাবুল জিহাদ, ৬/২৩২; নাসায়ী : আস্ সুনান, বাবু মা ইয়াজিদুশ শহীদু মিনাল আলাম, ১০/২০৬;

থেকে কত কত কম সৌন্দর্যের অধিকারী ইউসুফের সৌন্দর্যের এমন গুণ ছিল যে, যেসব নারীরা এই সৌন্দর্য অবলোকন করছিল তারাও বিভোর হয়ে নিজেদের হাত কেটে ফেলেছিল। কিঞ্চিৎ পরিমাণ কষ্টও তারা অনুভব করে নি। এই ঘটনাই জাজ্বল্যমান প্রমাণ যে, এমন সময়ে কষ্ট অবশ্য হয়; কিন্তু অনুভব হয় না।

সূরা ইউসুফে উল্লেখ আছে যে, মিসরের রমনীরা যখন জোলেখাকে হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালামের এই অবপাদ দিল, আপনি একজন মিসর অধিপতির স্ত্রী হয়ে নগণ্য এক কৃতদাসের প্রেমে মজে গেলেন? তখন তিনি সেই অপবাদ থেকে নিজেকে পবিত্র করার মানসে এবং মিসরের রমনীদের কাছে নিজের মর্যাদা ও সম্মান অক্ষুন্ন রাখার উদ্দেশ্যে মিসরের রমনীদেরকে দাওয়াত দিয়ে এনে সৌন্দর্যের সেই মূর্তপ্রতীকটির একটি ঝলক দেখাতে চাইলেন। কেননা, প্রমাণাদি পাওয়ার পরও কেউ আসল ব্যাপারটি বুঝে ওঠে নি। অতএব, দাওয়াতের দিন জোলেখা মিসরের রমনীদেরকে সারিবদ্ধভাবে বসিয়ে প্রত্যেকের হাতে একটি করে ফল ও ছুরি দিলেন। বললেন, সবাই কাটা আরম্ভ কর। রমনীগণ যখন আপন আপন ফলগুলো কাটতে আরম্ভ করে দিল তখন জোলেখা হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালামের নিকট এসে নিজের ভুলের কথা স্বীকার করে আবেদন করলেন, আপনি তো কখনো মন্দের জবাব মন্দ দিয়ে দেন না। তাই আমার ভুল মাফ করে দিন আর মিসরের রমনীদের কাছে আমার মর্যাদা ও সম্মান অটুট রাখতে সহায়তা করুন। এভাবে করবেন যে, মিসরের রমনীরা যেস্থানে বসে আছে আপনার মুখের পর্দাটি উন্মুক্ত করে সেখান দিয়ে গমন করবেন। যাতে করে তারা সবাই আপনাকে একবার দেখে নিতে পারে। তাহলে তাদের কাছে আমার অসহায়ত্ব ও বাধ্যবাধকতার কারণ অবমুক্ত হয়ে যায় আর তাদের মুখ বন্ধ হয়ে যায়। জোলেখার আবেদনের প্রেক্ষিতে হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম যখন মিসরের রমনীদের পাশ দিয়ে গমন করলেন, তখন মিসরের রমনীদের অবস্থা কীরূপ হয়েছিল তা পবিত্র কুরআনে এভাবে বর্ণিত হচ্ছে :

فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ سِكِّينًا وَقَالَتِ اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ ۖ فَلَمَّا

رَأَيْنَهُۥٓ أَكْبَرْنَهُۥ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَٰشَ لِلَّهِ مَا هَٰذَا بَشَرًا إِنْ هَٰذَآ إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ ﴿٣١﴾

–অতঃপর তারা যখন ইউসুফকে দেখল তখন তাঁর মহানত্ব বর্ণনা করতে লাগল আর (বিভোর হয়ে গিয়ে ফল কাটার স্থলে) নিজেদের হাত কেটে ফেলল। এবং (নিজেদের অজান্তে) বলতে লাগল, আল্লাহ! আল্লাহ!! ইনি তো মানুষ নহেন। বরং ইনি তো মর্যাদাশালী (নূরানী) ফেরেশতাই।[১]

হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালামের রূপ ও সৌন্দর্যের অবস্থা এমন ছিল যে, মিসরের রমনীরা সেই সৌন্দর্যে বিভোর হয়ে নিজেদের হাতগুলো কেটে ফেলেছিল, কিন্তু তাদের অনুভবই হয় নি। এ তো সেই সৌন্দর্যেরই প্রভাব যা অপূর্ণ। তা হলে পরম ও চরম সৌন্দর্যের দর্শনের অবস্থা কেমন হতে পারে! নিঃসন্দেহে খোদায়ী-সৌন্দর্যের জলওয়ায় বিভোর আশেকদের শিরগুলো যদি কেটেও যায়, তবু তাদের তা অনুভবই হবার কথা নয়।

'শহীদে'র চতুর্থ অর্থ এবং 'শাহাদাতে'র ধারণা :

شَهِدَ, يَشْهَدُ, شُهُوْدًا -এর এক অর্থ হচ্ছে 'সাহায্য করা'। এই দৃষ্টিকোণ থেকে 'শহীদে'র অর্থ হবে, 'সাহায্যকারী'। কুরআন মজীদের নিচের আয়াতটিতে 'শহীদ' শব্দটি 'সাহায্যকারী' অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। মহান আল্লাহ এরশাদ করছেন :

وَإِن كُنتُمْ فِى رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا۟ بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِۦ وَٱدْعُوا۟ شُهَدَآءَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ إِن كُنتُمْ صَٰدِقِينَ

–আর তোমরা যদি তাতে (আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে অবতীর্ণ হওয়া নিয়ে) সন্দেহ পোষণ করে থাক, যা আমি আমার বান্দার উপর নাযিল করেছি, তা হলে এটির অনুরূপ ছোট একটি সূরা তোমরা(ও) তৈরি করে নিয়ে আস। আর আল্লাহ্ ব্যতীত যারাই তোমাদের সাহায্যকারী

[১]. আল কুরআন : সূরা ইউসুফ, ১২:৩১;

রয়েছে (তাদের সবাইকেও) আহ্বান কর। তোমরা যদি (তোমাদের সন্দেহ ও অস্বীকৃতিতে) সত্যবাদী হয়ে থাক।[২]

শহীদের অর্থ যদি সাহায্যকারী হয়, আমরা তাহলে দেখছি যে, শহীদ কার সাহায্যকারী ? আর এই অর্থের দৃষ্টিকোণ থেকে শাহাদাতের ধারণা কী হবে? শহীদ স্বীয় প্রতিপালকের চৌকাঠে আপন জীবন বিসর্জন দেওয়ার মাধ্যমে আল্লাহ্‌র দীন, নিজের দেশ ও জাতির অবর্ণনীয় সাহায্য করে থাকেন। তিনি নিজের জীবনের প্রদীপখানি নিভিয়ে দেওয়ার মাধ্যমে জ্বালিয়ে তোলেন জাতির জীবনের প্রদীপ। নিজে প্রাণে মরে গিয়ে তিনি অন্যদের জিইয়ে থাকার পথ সুগম করে দেন। আল্লাহ্‌র দীন, স্বদেশ ও স্বজাতির জন্য তাঁর মরণ তো বাহ্যতঃই মাত্র। মূলত তিনি তো সেই মৃত্যুর আপেক্ষিক দ্বার অতিক্রম করার মাধ্যমে এমন এক পরম জীবনই লাভ করেন যার পরবর্তীতে আর কোন মৃত্যুই নাই। তাই পবিত্র কুরআন ঘোষণা করছে :

وَلَا تَقُولُوا۟ لِمَن يُقْتَلُ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ أَمْوَٰتٌۢ ۚ بَلْ أَحْيَآءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ ﴿١٥٤﴾

–আর যারা আল্লাহ্‌র রাস্তায় মৃত্যু পায়, তোমরা তাদের মৃত বলিও না। (তারা মৃত নহে) বরং তারা জীবিতই। অথচ (তাদের জীবন সম্পর্কে) তোমরা ধারণা করতে পার না।[২]

আল্লাহ্‌র রাস্তায় যারা প্রাণ বিসর্জন দেন, আপনারা তাদের মৃত বলবেন না। কেননা, তিনি এমন ধরনের মৃত্যুকেই বরণ করে নিয়েছেন যা হাজারো মানুষের জীবনের পথকে সুগম করে। তিনি নিজের জীবনকে বিসর্জন দিয়ে জাতির জীবনকে সমুজ্জ্বল করেছেন। তাঁর এই কাজটির উদাহরণ এমনই যে, কোন ব্যক্তি দিয়াশলাইর কাঠি দিয়ে প্রদীপ জ্বালাল। এর পর প্রদীপ থেকে প্রদীপ জ্বালানো হতে লাগল। এখন কেউ যদি ম্যাচের সেই কাঠিটির দিকে দৃষ্টি দেয় তা হলে দেখতে পাবে যে, সেটি জ্বলে-পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। এবার কেউ যদি ম্যাচের কাঠিটি জ্বলে-পুড়ে ছাই হয়ে যাওয়ার ফলশ্রুতির বিষয়টি লক্ষ্য করে তা হলে বুঝতে পারবে, ম্যাচের সেই একটি কাঠিই নিজের অস্তিত্বকে জ্বালিয়ে

[১]. আল কুরআন : সূরা বাকারা, ২:২৩;
[২]. আল কুরআন : সূরা বাকারা, ২:১৫৪;

দিয়ে অগণিত অস্তিত্বকে আলোকিত করেছে এবং অগণিত নেভানো প্রদীপকে আলো দান করেছে। একজন শহীদও অনুরূপ নিজের প্রাণ মহান প্রতিপালকের চৌকাঠে কুরবান করে দিয়ে বাহ্যিক দৃষ্টিতে মৃত্যুকেই তো বরণ করে নিয়েছেন, কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে তিনি পুরো একটি জাতিকেই জীবন দান করেছেন। আর তিনি নিজেও এমন এক জীবন লাভ করেছেন যা এই পার্থিব জীবন থেকে অনেক অনেক গুণে শ্রেষ্ঠ। আল্লাহ্ তা'আলা এরশাদ করছেন :

مَن جَآءَ بِٱلْحَسَنَةِ فَلَهُۥ عَشْرُ أَمْثَالِهَا ﴿١٦٠﴾

–যে ব্যক্তি (আল্লাহর দরবারে) একটি নেকী নিয়ে হাজির হয়, তার জন্য রয়েছে তদনুরূপ দশটি (সওয়াব)।[১]

যেক্ষেত্রে মহান আল্লাহ্ তা'আলা নীতিমালা নির্ধারণ করে দিয়েছেন, যে ব্যক্তি একটি নেক আমল করবে তাকে তদনুরূপ দশটি নেকীর সওয়াব দান করা হবে, তাহলে যে ব্যক্তি আল্লাহ্র দরবারে একটি প্রাণ উৎসর্গ করবে তার জন্য তো আরো উন্নত দশটি জীবন বরাদ্দ হওয়ার কথা। একটি প্রাণের মালিকই যদি জীবিত থাকেন, সেক্ষেত্রে একটি প্রাণের বিনিময়ে যিনি দশটি প্রাণের মালিক হবেন তিনি কীভাবে মৃত হতে পারেন? তাই মহান আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেন:

وَلَا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ قُتِلُوا۟ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ أَمْوَٰتًۢا ۚ بَلْ أَحْيَآءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ ﴿١٦٩﴾

–তোমরা কখনো সেসব লোকদের (তোমাদের অনুমানে) মৃত ধারণা করবে না যারা আল্লাহর রাস্তায় মৃত্যু পেয়েছে। তারা বরং জীবিত। তারা তাদের প্রতিপালকের নিকট রিজিক পেয়ে থাকে (জীবনের স্বাদ গ্রহণ করে)।[২]

আল্লাহ্র রাহে যাঁরা শহীদ হন, তাঁদের মৃত বলা তো দূরের কথা, মৃত বলে ধারণাও করবেন না। ভুলেও মনে করবেন না যে, তাঁরা মরে গেছেন। তাঁরা বরং জীবিত। আল্লাহর নিকট তাঁদের জন্য রিজিকের ব্যবস্থা রয়েছে।

১. আল কুরআন : সূরা আন'আম, ৬:১৬০;
২. আল কুরআন : সূরা আলে ইমরান, ৩:১৬৯;

শুধু তাই নয়, আরো এরশাদ হচ্ছে :

فَرِحِينَ بِمَآ ءَاتَىٰهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِۦ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِٱلَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا۟ بِهِم مِّنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

–সে সবে (সেসব নেয়ামতে) তারা আনন্দিত আল্লাহ্ স্বীয় অনুগ্রহে (ও দয়ায়) যা যা তাদের দান করেছেন। আর তারা নিজেরাও আল্লাহ্র পক্ষ থেকে সুসংবাদ পাচ্ছে। (আর সুসংবাদ দিচ্ছে) তাদের যারা এখনো তাদের সাথে সাক্ষাৎ করে নি; পেছনে রয়ে গেছে। (অর্থাৎ এখানো যারা শাহাদাত অর্জন করে নি; অথচ আল্লাহর জ্ঞানে তাদের শাহাদাত রয়েছে) কেননা, না তাদের থাকবে কোন ধরনের ভয়-ভীতি, না কোন উৎকণ্ঠা।[১]

তাঁরা নিজেরাও আনন্দিত এবং অন্যান্যদেরকেও সুসংবাদ দিচ্ছেন। তাঁরা বলছেন, এই পথ বড়ই মর্যাদা ও প্রশান্তিময়। এই পথে না আছে মানসিক দুর্ভাবনা, ভয়-ভীতি ও উৎকণ্ঠা। বরং রয়েছে পরম আনন্দ আর চিরশান্তির আমেজ।

'শহীদে'র পঞ্চম অর্থ ও 'শাহাদাতে'র ধারণা :

شَهِدَ, يَشْهَدُ, شُهُوْدًا -এর এক অর্থ হচ্ছে 'সাক্ষ্য প্রদান করা'। তা হলে شَهِيْدٌ 'শহীদ' শব্দের অর্থ হবে 'সাক্ষ্য প্রদানকারী' বা 'সাক্ষী'। মহান আল্লাহ্ এরশাদ করছেন,

وَٱسْتَشْهِدُوا۟ شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ ﴿٢٨٢﴾

–(পরস্পর লেন-দেনের ব্যাপারে) তোমাদের মধ্য থেকে দুইজন পুরুষকে সাক্ষী বানিয়ে নেবে।[২]

এখন আমরা দেখব যে, শহীদ কোন্ বিষয়ের সাক্ষ্য দিচ্ছে? আর এই অর্থটির আলোকে 'শাহাদাতে'র ধারণা কী হবে?

মানুষ তার জীবনে এমনিতেই তো হাজারো সাক্ষ্য দিয়ে থাকে। কখনো দেয় মৌখিক, আবার কখনো সশরীরে। উদ্দেশ্য, সত্য বিষয়টি সাব্যস্ত করা। মৌখিক ও সশরীরে সাক্ষ্য প্রদানের চাইতে বড় সাক্ষ্য হচ্ছে কোন বিষয়কে

১. আল কুরআন : সূরা আলে ইমরান, ৩:১৭০;
২. আল কুরআন : সূরা বাকারা, ২:২৮২;

সত্য হিসাবে প্রমাণিত করার জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করে দেওয়া। তার এই জীবন উৎসর্গ করে দেওয়া এই বিষয়টিরই সাক্ষ্য বহন করে যে, যে উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে সে জীবন উৎসর্গ করে দিল সেই বিষয়টিকে সে সত্য রূপেই জেনেছিল। শহীদ নিজ জীবনকে বাজি রেখে শাহাদাতের সুধা পান করার মাধ্যমে আল্লাহ্‌র দীন হক হওয়ার, জাতির মর্যাদা সত্য হওয়ার উপর সাক্ষ্য প্রদান করেন। তাঁর সেই সাক্ষ্যের বিপরীতে আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে যে প্রতিদানের কথা ঘোষণা দেওয়া হয়েছে, একটি সহীহ্ হাদিসে তা এভাবে বর্ণিত হয়েছে– হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, নবী পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন :

يَا أَبَا سَعِيدٍ مَنْ رَضِيَ بِاللهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ فَعَجِبَ لَهَا أَبُو سَعِيدٍ فَقَالَ أَعِدْهَا عَلَيَّ يَا رَسُولَ اللهِ فَفَعَلَ ثُمَّ قَالَ وَأُخْرَى يُرْفَعُ بِهَا الْعَبْدُ مِائَةَ دَرَجَةٍ فِي الْجَنَّةِ مَا بَيْنَ كُلِّ دَرَجَتَيْنِ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ قَالَ وَمَا هِيَ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ،

–হে সাঈদ! যে ব্যক্তি রাজি থাকল আল্লাহ্ প্রতিপালক হওয়ার উপর, ইসলাম তার দীন হওয়ার উপর এবং মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নবী হওয়ার উপর, সেই ব্যক্তির জন্য জান্নাত অবধারিত হয়ে গেল। এই কথা শ্রবনে হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বিস্মিত হলেন এবং বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! কথাটি পুনরায় বলবেন কি? তখন তিনি (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এরশাদ করলেন, আরো একটি কাজ রয়েছে যা দ্বারা মানুষ একশতটি দরজা লাভ করতে পারবে। একটি দরজা থেকে অন্য দরজার ব্যবধান হবে জমিন ও আসমানের ব্যবধানের সমান। হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু আরজ করলেন, সে কাজটি কী? নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন, আল্লাহ্‌র রাহে জেহাদ করা, আল্লাহ্‌র রাহে জেহাদ করা, আল্লাহ্‌র রাহে জেহাদ করা।[১]

১. সহীহ্ মুসলিম, কিতাবুল ইমারাত, বাবু মা আআদ্দালাহু তাআলা লিল মুজাহিদি ফিল জান্নাহ, ৯/৪৬৬;

শহীদের সেই সাক্ষ্যের প্রতিদান স্বরূপ আল্লাহ্ তা'আলা কেবল তাঁর গুনাহ্‌সমূহই মাফ করে দেন না, বরং জান্নাতে তাঁকে একশতটি দরজাও দান করে থাকেন। আর এই দরজাগুলো এতই বুলন্দ যে, প্রতি দুইটির ব্যবধান জমিন ও আসমানের মধ্যকার ব্যবধানের সমান।

অধ্যায় : ০২

ইমাম হোসাইন
রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর'র
শাহাদাতের বিশেষত্ব

আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে লাভজনক মহান নেয়ামতসমূহের অন্যতম হচ্ছে শাহাদাত। যেসব সৌভাগ্যবান মনীষী এহেন নেয়ামত অর্জনে সক্ষম হয়েছেন তাদের কথা আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে এভাবে বর্ণনা করছেন :

وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ فَأُوْلَٰٓئِكَ مَعَ ٱلَّذِينَ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ ٱلنَّبِيِّـۧنَ وَٱلصِّدِّيقِينَ وَٱلشُّهَدَآءِ وَٱلصَّٰلِحِينَ ۚ وَحَسُنَ أُوْلَٰٓئِكَ رَفِيقًا ﴿٦٩﴾

–যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও রাসূলের আনুগত্য পোষণ করে, সে ব্যক্তি তাদেরই সঙ্গে হবে যাদেরকে আল্লাহ্ নেয়ামতসমূহ দান করেছেন। যেমন নবীগণ, সিদ্দীকগণ, শহীদগণ ও সালিহ্‌গণ।[১]

উক্ত আয়াত শরীফে 'শহীদ'গণকে আল্লাহ্ তা'আলার এনামপ্রাপ্ত বান্দাদের মাঝে শামিল করে নেওয়া হয়েছে। আর 'শহীদ'দেরকে 'সালিহ্'গণের উপর শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করা হয়েছে।

আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর যেসব নেয়ামত, অনুগ্রহ ও পূর্ণতা তাবৎ মানব-মণ্ডলী ও তামাম সৃষ্টিকুলকে দান করেছেন, সেসব কিছু তিনি আকা আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের মহান সত্তার মাঝে পূঞ্জীভূত করে দিয়েছেন। আর أَنَا سَيِّدُ وُلْدِ آدَمَ 'কেয়ামত দিবসে আমি হব আদম-সন্তানদের সর্দার।'[২] এই হাদিস শরীফটির দাবীও এই যে, সকল প্রকারের পরমত্ব ও পূর্ণতা আকা আলাইহিস সালামের মোবারক সত্তার মাঝে পূঞ্জীভূত রয়েছে। নবী পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী :

إِنَّ اللهَ بَعَثَنِي لِتَمَامِ مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ وَكَمَالِ مَحَاسِنِ الْأَفْعَالِ.

–আল্লাহ্ আমাকে চরিত্রের পূর্ণ আদর্শ প্রতিষ্ঠার এবং উত্তম কর্মের পরমত্ব প্রদানের জন্য নবী রূপে প্রেরণ করেছেন।[৩]

---

১. আল কুরআন : সূরা নিসা, ৪:৬৯;
২. সহীহ্ মুসলিম, কিতাবুল ফাজায়িল।
৩. তাবরিযী : মিশকাতুল মাসাবীহ, বাবু ফাযায়িলি সায়্যিদিল মুরসালীন;

শাহাদাতও হচ্ছে একটি পূর্ণতা; মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি নেয়ামত। এটি তো বরং এমন এক নেয়ামত যে, এটির জন্য বাসনা ছিল স্বয়ং নবী পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লামেরই। যথা, হযরত আবু হোরায়রা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি শুনেছি, নবী পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, যাঁর হাতে আমার জীবন, সেই মহান সত্তার কসম, মুসলমানদের মনে এই বিষয়ে যদি উদ্বেগ না থাকত যে, আমি তাদের ছেড়ে জেহাদের জন্য বেরিয়ে পড়ি, আমার কাছে এমন সংখ্যক বাহনও না থাকে যে, সবাইকে সাথে নিয়ে যেতে পারি, তাহলে আমি সেসব দলের সাথেই বেরিয়ে পড়তাম যারা আল্লাহর রাস্তায় জেহাদ করার জন্য বেরিয়ে পড়ে।'

وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوَدِدْتُ أَنِّي أُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللهِ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلُ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلُ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلُ.

–যাঁর হাতে আমার জীবন, সেই মহান সত্তার কসম, আমার বাসনা এই যে, আমি যেন আল্লাহ্র রাহে নিহত হই। আবার জীবিত হই, আবার নিহত হই। আবারও জীবিত হই, আবারও নিহত হই। আবারও জীবিত হই, আবারও নিহত হই।[১]

এদিকে কিন্তু وَاللهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ 'আল্লাহ্ আপনাকে মানুষ-জন থেকে বাঁচিয়ে রাখবেন'।[২] আল্লাহ্র এই আয়াতটি তাঁর পক্ষে আল্লাহ্র রাহে শহীদ হওয়ার পক্ষে বারণ ছিল। অপরদিকে নবীর দোয়া কবুল হওয়াও আবশ্যক। আর শাহাদাতের বাসনা পূর্ণ না হওয়াও তো সম্ভব না। অতএব, আল্লাহ তা'আলা তাঁর বাসনাটি এমনিরূপে পূর্ণ করলেন যে, যাঁকে তিনি পুত্র বলেই ডাকতেন তাঁর দৌহিত্র হযরত ইমাম হোসাইন রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হুকে শাহাদাতের জওহারের পূর্ণ প্রকাশ ঘটানোর জন্য নির্বাচন করে নিলেন। এমনি করে হযরত ইমাম হোসাইন রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হুর শাহাদাত নবী-চরিতেরই একটি অধ্যায়ে পরিণত হয়ে গেল।

নবী পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের দোয়ার পূর্ণতা ও নবী-চরিতের একটি অধ্যায় হওয়ার দিক থেকে ইমাম হোসাইনের শাহাদাতে

১. বুখারী : আস্ সহীহ, কিতাবুল জিহাদ, বাবুত্ তামান্নাশ্ শাহাদাত, ৯/৩৬৪;
২. আল কুরআন : সূরা মায়েদা, ৫:৬৭;

অপরাপর সকল শাহাদাতের তুলনায় আলাদা এক মর্যাদা তো রয়েছেই, তদুপরি অন্যান্য বিভিন্ন ভিত্তির পরিপ্রেক্ষিতে এটির স্বতন্ত্র এক বিশেষত্বও রয়েছে। যেমন :

প্রসিদ্ধির দিক থেকে বিশেষত্ব :

হযরত ইমাম হোসাইন রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হুর শাহাদাত মূলত হুজুর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লামেরই শাহাদাত ছিল। এটি কেবল ইমাম হোসাইন রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হুর শাহাদাতই ছিল না, বরং নবী-চরিতেরই একটি অধ্যায় ছিল। তাই এই শাহাদাতের এমনই আলোচনা ও প্রসিদ্ধির প্রয়োজন ছিল যে, এটির তুলনায় অন্য কোন শাহাদাত যেন এই মর্যাদায় উত্তীর্ণ না হতে পারে। আর সে কারণেই অন্যান্যদের শাহাদাতের প্রসিদ্ধি ও আলোচনা তাঁদের শহীদ হওয়ার পরেই হয়। কিন্তু হযরত ইমাম হোসাইনের শাহাদাতের আলোচনা তাঁর শহীদ হওয়ার পূর্বেই হয়েছিল।

হযরত ইমাম হোসাইন রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হু যখন হুজুর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোলেই খেলা করছিলেন, সেই সময়েই তিনি হযরত ইমাম হোসাইনের শাহাদাতের কথা আলোচনা করেছিলেন। যথা, হযরত উম্মে ফজল (যিনি হলেন হযরত আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হুর স্ত্রী এবং হুজুর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের চাচী) বিনতে হারেছ থেকে বর্ণিত, একদিন তিনি রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে উপস্থিত হয়ে আরজ করলেন, 'এয়া রাসূলাল্লাহ্! আজ রাতে আমি এক ভয়াবহ স্বপ্ন দেখেছি।' নবী পাক জিজ্ঞাসা করলেন, 'কী সেই স্বপ্ন?' হযরত উম্মে ফজল বললেন, 'সেটি অত্যন্ত ভয়াবহ (তাই আমিও সেই স্বপ্ন বর্ণনা করতে পারব না, আর আপনারও সেটি শুনতে ভাল লাগবে না)।' নবী পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, '(আমাকে একবার বল তো দেখি) সেটি কী?' হযরত উম্মে ফজল আরজ করলেন, 'আমি দেখতে পেলাম যে, স্বয়ং আপনার পবিত্র দেহ মোবারকেরই একটি অংগ যেন কেটে ফেলা হয়েছে। আর সেটি আমার কোলে এনে রাখা হয়েছে।' এতদশ্রবনে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন, 'তুমি ভাল স্বপ্নই দেখেছ। (স্বপ্নটির তাবির হচ্ছে) আল্লাহ্ চাহেন তো ফাতেমার ঘরে একটি পুরুষ সন্তান আসবে, যাকে তোমার কোলে দেওয়া হবে।' (কেননা, নবী-বংশের রমনীদের মধ্যে তোমার আত্মীয়তাই সর্বাধিক। আর সেই সন্তানের সর্বোত্তম দেখভাল করতে পারবে তুমিই)। ঠিকই, হযরত ফাতেমার ঘরে

হযরত ইমাম হোসাইন রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হু জন্ম নিলেন। আর (নবী পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথা অনুযায়ী) তাঁকে আমার কোলে এনে দেওয়া হল। অতঃপর আমি একদা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট গেলাম এবং হোসাইনকে তাঁর কোলে তুলে দিয়ে সামান্য অন্যমনস্ক হলাম। এর পর (আমি যখন ফিরে নবী পাকের প্রতি দৃষ্টি দিলাম) দেখতে পেলাম নবী পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের চোখ দুটো দিয়ে অনর্গল ধারায় অশ্রু ঝড়তে রয়েছে।

হযরত উম্মে ফজল বলছেন :

فَقُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللهِ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي مَالَكَ؟ قَالَ: ﴿ أَتَانِي جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَأَخْبَرَنِي أَنَّ أُمَّتِي سَتَقْتُلُ ابْنِي هَذَا فَقُلْتُ: هَذَا؟ قَالَ: نَعَمْ وَأَتَانِي بِتُرْبَةٍ من تربته حَمْرَاء﴾.

–আমি জিজ্ঞাসা করলাম, এয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনার চৌকাঠে আমার পিতা-মাতা কুরবান হয়ে যাক! আপনার এ অবস্থা কেন? উত্তরে তিনি বললেন, এই মাত্র আমার নিকট জিবরাঈল (আলাইহিস সালাম) আগমন করেছিলেন। তিনি আমাকে বললেন যে, আমার উম্মত (অর্থাৎ মুসলমানদেরই কোন কোন লোকের একটি দল) আমার এই পুত্রকে অচিরেই হত্যা করবে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, এই সন্তানটিকে? তিনি বললেন, হাঁ। আর আমাকে সেই ভূ-খণ্ড হতে কিছু মাটি দিলেন, যেগুলো ছিল লাল।[১]

হযরত উম্মে সালেমা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হাকে মাটি দান করা :

হযরত ইমাম হোসাইন রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হু তখনো শিশুই ছিলেন, আকায়ে দো জাহান সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত উম্মে সালেমা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হাকে সেই স্থানটির কিছু মাটি দিয়েছিলেন, যেই স্থানে হযরত ইমাম হোসাইন রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হু শহীদ হবেন।

যথা, হযরত উম্মে সালেমা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হা বলছেন, হাসান ও হোসাইন উভয় আমার ঘরে নবী পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের সম্মুখে খেলা করছিলেন। এমন সময় নবী পাকের খেদমতে

[১]. তাবরিযী : মিশকাতুল মাসাবীহ, বাবু মানাক্বিবি আহ্লিল বাইতি;

হযরত জিবরাঈল আলাইহিস সালাম এসে হাজির হলেন। বললেন, হে মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম! নিঃসন্দেহে আপনারই উম্মতদের মধ্য থেকে একটি দল আপনার পুত্র এই হোসাইনকে আপনার পরবর্তীতে কতল করবে। জিবরাঈল তাঁকে (সেই জায়গার) কিছু মাটি দিলেন। হুজুর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাটিগুলো আপন বক্ষে লাগালেন আর কান্না করলেন। অতঃপর এরশাদ করলেন :

يَا أُمَّ سَلَمَةَ إِذَا تَحَوَّلَتْ هَذِهِ التُّرْبَةُ دَمًا فَاعْلَمِي أَنَّ ابْنِي قَدْ قُتِلَ فَجَعَلَتْهَا فِي قَارُورَةٍ ثُمَّ جَعَلَتْ تَنْظُرُ إِلَيْهَا كُلَّ يَوْمٍ وَتَقُولُ إِنَّ يَوْمًا تَحَوَّلِينَ دَمًا لَيَوْمٌ عَظِيمٌ،

–হে উম্মে সালেমা! যখন দেখবে যে, এই মাটি রক্তের রূপ ধারণ করেছে তখনই বুঝে নেবে যে, আমার এই পুত্রটি কতল হয়ে গেছে। হযরত উম্মে সালেমা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হা সেই মাটি একটি বোতলে করে রেখে দিয়েছিলেন। প্রত্যহ তিনি সেই মাটি লক্ষ্য করতেন। আর বলতেন, হে মাটি! যেদিন তুমি রক্ত হয়ে যাবে, সেই দিবসটি হবে অতিশয় মহান।[১]

শাহাদাতের স্থান চিহ্নিতকরণ :

নবী পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম কেবল ইমাম হোসাইন রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হুর শাহাদাতের সংবাদই দিয়ে দেননি, বরং যেই জায়গায় হযরত ইমাম হোসাইন রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হু শহীদ হবেন সেই জায়গাটিও চিহ্নিত করে দিয়েছিলেন। যথা, উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দীকা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হা থেকে বর্ণিত, নবী পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন :

أَخْبَرَنِي جَبْرَئِيلُ أَنَّ ابْنِي الْحُسَيْنَ يُقْتَلُ بَعْدِي بِأَرْضِ الطَّفِّ وَجَاءَنِي بِهَذِهِ التُّرْبَةِ فَأَخْبَرَنِي أَنَّ فِيهَا مَضْجَعَهُ،

[১]. আল খাসায়িসুল কুবরা, ২ : ১২৫। সিররুশ শাহাদাতাইন, ২৮। আল মুজামুল কবীর লিত তাবারানী, ৩ : ১০৮;

–জিবরাঈল আমীন আমাকে সংবাদ দিলেন যে, আমার পরবর্তীতে আমার পুত্র হোসাইনকে 'ত্বাফ'[১] (বর্তমানে কারবালা) নামক স্থানে কতল করা হবে। জিবরাঈল আমার নিকট (সেই স্থানের) মাটি নিয়ে এসেছেন। আর তিনি আমাকে বলেছেন, এই মাটি হোসাইনের কবরের।[২]

কারবালা প্রান্তর ঃ হোসাইন রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর শাহাদাত-ভূমি :

হযরত ইমাম হোসান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর শাহাদাতের কয়েক বৎসর পূর্বে সাহাবায়ে কেরামদের মাঝে এই কথা প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল যে, তিনি শহীদ হবেন কারবালার প্রান্তরে। যথা, হযরত আনস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বর্ণনা করছেন, বৃষ্টি বর্ষণের দায়িত্বপ্রাপ্ত ফেরেশতা আল্লাহ্ তা'আলার কাছে নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে আগমন করার অনুমতি চাইলেন। অবশ্য তিনি সেই অনুমতি পেয়েও ছিলেন। সেদিন হুজুর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত উম্মে সালেমার গৃহেই উপস্থিত ছিলেন। ফেরেশতাটির আগমনে নবী পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন, 'হে উম্মে সালেমা! দরজার দিকে খেয়াল রাখবে। কেউ যেন প্রবেশ করতে না পারে।'

তিনি দরজার দায়িত্বে থাকাকালে হযরত ইমাম হোসাইন রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু আগমন করলেন। জোরপূর্বক তিনি ভেতরে চলে আসেন। তিনি গিয়ে সোজা নবী পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাঁধের উপর গিয়ে চড়ে বসেন। আল্লাহ্র রাসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে কোলে নিয়ে চুমু দিতে লাগলেন। এমন সময় ফেরেশতাটি আরজ করলেন :

أَتُحِبُّهُ قَالَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعَمْ! قَالَ فَإِنَّ أُمَّتَكَ تَقْتُلُهُ وَإِنْ شِئْتَ أَرَيْتُكَ الْمَكَانَ الَّذِي يُقْتَلُ فِيْهِ فَضَرَبَ بِيَدِهِ فَأَرَاهُ تُرَابًا أَحْمَرَ فَأَخَذَتْهُ أُمُّ سَلَمَةَ فَصَرَّتْهُ فِي ثَوْبِهَا فَكُنَّا نَسْمَعُ أَنَّهُ يُقْتَلُ بِكَرْبَلَاءَ.

–আপনি কি তাঁকে খুবই ভালবাসেন? নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হাঁ। ফেরেশতাটি বললেন, আপনার

[১]. ত্বাফ কূফার পার্শ্ববর্তী একটি স্থান। বর্তমানে যা কারবালা নামে প্রসিদ্ধ।
[২]. সিররুশ শাহাদাতাইন, পৃ. ২৪;

উম্মতই তাঁকে কতল করে দেবে। আপনি যদি ইচ্ছা করেন, তা হলে আমি আপনাকে সেই স্থানটি দেখিয়ে দিতে পারি, যেখানে তাঁকে কতল করা হবে। অতঃপর তিনি নিজের হাতখানি মারলেন এবং তাঁকে লাল মাটি দেখালেন। সেই মাটি উম্মে সালেমা নিয়ে নিয়ে আপন কাপড়ের কোণায় বেঁধে নিলেন। বর্ণনাকারী বলছেন, আমরা শুনে থাকতাম যে, হোসাইন কারবালায় শহীদ হবেন।[১]

অনুরূপ হযরত উম্মে সালেমা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা থেকে বর্ণিত রয়েছে যে, একদা নবী পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাৎ হয়ে শুয়ে আছেন। এমন সময় হঠাৎ জেগে উঠলেন। তখন তাঁকে খুবই চিন্তিত ও দুর্ভাবনাগ্রস্ত দেখাচ্ছিল। তাঁর হাতে ছিল লাল রঙের মাটি। তিনি সেই মাটি নাড়াচাড়া করছিলেন। আমি আরজ করলাম, 'এয়া রাসূলাল্লাহ্! এগুলো কিসের মাটি?' তিনি এরশাদ করলেন,

أَخْبَرَنِي جِبْرِيل أَن هَذَا يَعْنِي الْحُسَيْن يقتل بِأَرْض الْعرَاق وَهَذِه تربَتهَا.

–জিবরাঈল আমীন আমাকে সংবাদ দিলেন যে, আমার পুত্র এই হোসাইনকে ইরাকের মাটিতে কতল করে দেওয়া হবে। এগুলো সেখানেরই মাটি।[২]

এই মাটি প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত উম্মে সালেমার নিকট সমর্পন করলেন। আর বললেন,

يَا أُمَّ سَلَمَةَ إِذَا تَحَوَّلَتْ هَذِهِ التُّرْبَةُ دَمًا فَاعْلَمِي أَنَّ ابْنِي قَدْ قُتِلَ.

–হে উম্মে সালেমা! এই মাটি যখন রক্তে রূপ নেবে, তখন বুঝে নেবে যে, আমার পুত্র হোসাইন (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) কতল হয়ে গেছেন।[৩]

একটি সূক্ষ্ম তত্ত্ব :

এখানে বুঝার বিষয় যে, হযরত আয়েশা সিদ্দীকা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহাকে যিনি ছিলেন নবী পাকের সমস্ত বিবিগণের মধ্য থেকে সমধিক

[১]. আল খাসায়িসুল কুবরা: ২:১২৫। সিররুশ শাহাদাতাইন: ২৫। আস সাওয়ায়িকুল মুহরিকা: ১৯২;
[২]. আল খাসায়িসুল কুবরা: ২ : ১২৫। সিররুশ শাহাদাতাইন: ২৭;
[৩]. আল মুজামুল কবীর লিত তাবারানী। ৩ : ১০৮;

প্রিয়তমা, মাটিগুলো দেন নি। তাছাড়া অন্য কোন বিবির হাতেও মাটিগুলো গচ্ছিত রাখেন নি। বরং মাটিগুলো হাওলা করে দিলেন হযরত উম্মে সালেমাকেই। আর বললেন, হে উম্মে সালেমা! এই মাটি যখন রক্তে পরিণত হবে, তখন বুঝে নেবে যে, আমার পুত্র (হোসাইন) শহীদ হয়ে গেছেন। এর কারণ হল, তিনি নবুয়তের দৃষ্টিতে দেখে নিয়েছিলেন যে, তাঁর পুত্রের শাহাদাতের সময় পবিত্র বিবিগণের মধ্য থেকে কেবল উম্মে সালেমাই জীবিত থাকবেন। ঠিকই, কাবালার ঘটনা যখন ঘটেই চলছিল, সেই সময়ে কেবল উম্মে সালেমাই জীবিত ছিলেন। নবী পাকের বাদবাকি সকল বিবিই তখন ওফাত পেয়ে গিয়েছিলেন।

শাহাদাতের সনটি চিহ্নিতকরণ :

প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত ইমাম হোসাইন রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর শহীদ হওয়ার স্থানটিই কেবল দেখিয়ে দেন নি, বরং সনটিও বলে দিয়েছিলেন যেই সনে তিনি শাহাদাত বরণ করবেন।

হযরত আবু হোরায়রা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, নবী পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন :

تَعَوَّذُ بِاللهِ مِنْ سَنَةِ سِتِّيْنَ وَاَمَارَةِ الصِّبْيَانِ،

–তোমরা ষাট হিজরীর সনটি থেকে এবং বালকদের শাসন (রাষ্ট্র পরিচালনা) থেকে আল্লাহ্‌র কাছে আশ্রয় প্রার্থনা কর।[১]

প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম হিজরী ষাট সনটি থেকে আল্লাহ্‌র কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। কেননা, তিনি জানতেন যে, ষাট হিজরী সনে তাঁর কলিজার টুকরাগুলোর উপর নির্যাতন-নিপীড়নের পাহাড় ভাঙা হবে, তাঁদের শোচনীয়ভাবে শহীদ করা হবে। এতে করে কেবল গুটি কতেক কিছু মানুষই ধ্বংস হবে না, বরং সমগ্র মুসলিম উম্মাই এমনরূপ ধ্বংসের শিকার হবে যে, অনন্তকালের জন্য সেটির কুফল পড়তে থাকবে আর পরস্পরের মাঝে এমন সব বৈষম্য ও মতানৈক্যের সৃষ্টি হবে যা বরাবরই মুসলিম উম্মার ধ্বংসের কারণ হয়ে থাকবে।

বালকদের শাসন থেকে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করার নির্দেশও দেওয়া হয়েছে। এই নির্দেশ প্রদানের মাধ্যমে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম

[১]. আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া লি ইবনে কছীর। ৮ : ২৩১;

যে বিষয়টির প্রতি ইঙ্গিত করেছেন তা হল, সেই সময়কালের শাসক হবে অদূরদর্শী ও অদক্ষ। আর হবে দুর্বল দীনের অধিকারী। তাছাড়া উল্লিখিত হাদিস দ্বারা বুঝা যায় যে, দুর্বল দীনের লোকজনের শাসন ও সরকার আরম্ভ হবে ষাট হিজরী থেকেই। এদিকে এজিদ সিংহাসনে বসেছিলেন ষাট হিজরীতেই। বরং এজিদকে কেন্দ্র করে প্রিয় নবীর উক্তি তো এরূপই ছিল যে, সে-ই হবে সর্বপ্রথম ব্যক্তি ন্যায়-নীতির শাসনকে যে পদদলিত করে দেবে।

হযরত আবু ওবায়দা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন :

لَا يَزَالُ أَمْرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ حَتَّى يَكُونَ أَوَّلَ مَنْ يَثْلَمُهُ رَجُلٌ مِنْ بَنِي أُمَيَّةَ يُقَالُ لَهُ: يَزِيدُ

–আমার উম্মতগণের শাসন (সরকার) প্রতিষ্ঠিত থাকবে ন্যায়-নীতির উপরই। এক সময়ে যে সর্বপ্রথম ব্যক্তিটি এতে বানচাল সৃষ্টি করবে সে হবে বনী উমাইয়ারই লোক, তার নাম হবে এজিদ।[১]

হযরত আবু হোরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহুর ষাট হিজরী থেকে আশ্রয় প্রার্থনা:

আল্লামা ইবনে হাজর হাইতামী মক্কী রাহমাতুল্লাহি আলাইহ্ বলছেন, এজিদকে কেন্দ্র করে যেসব বাণী প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম ব্যক্ত করেছেন হযরত আবু হোরায়রা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু সেসব সম্পর্কে অবহিত ছিলেন। তাই তো তিনি দোয়া করতেন :

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُبِكَ مِنْ رَأْسِ السِّتِّيْنَ وَاَمَارَةِ الصِّبْيَانِ،

–হে আল্লাহ্! আমি তোমার নিকট ষাট হিজরীর প্রারম্ভ এবং বালকদের শাসন থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।[২]

মহান আল্লাহ্ তাঁর দোয়া কবুল করেন। উনষাট হিজরীতেই তিনি ওফাত পেয়ে যান।

প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম আগে থেকে কেবল হযরত ইমাম হোসাইন রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর শাহাদাতের কথা, স্থান ও সনই

[১]. আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া লি ইবনে কছীর, ৮ : ২৩১।
[২]. আস্ সাওয়াকিবুল মুহ্‌রিকা, ২২১।

বলে দেন নি, বরং তিনি পূর্ব থেকে চিহ্নিত করে দিয়েছিলেন কারবালার ময়দানে আহ্‌লে বাইতগণের তাঁবুগুলো কোন্ কোন্ স্থানে গাঁড়া হবে। আরও বলে দিয়েছিলেন, কোন্ কোন্ স্থানে তাঁরা রক্তাক্ত হবেন। যথা, হযরত আসবাগ্ বিন বানানাহ্ রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হু থেকে বর্ণিত :

أَتَيْنَا مَعَ عَلِيٍّ مَوْضِعَ قَبْرِ الْحُسَيْنِ فَقَالَ هٰهُنَا مَنَاخُ رِكَابِهِمْ وَمَوْضِعُ رِحَالِهِمْ وَمِهْرَاقُ دِمَائِهِمْ فِتْيَةٌ مِنْ آلِ مُحَمَّدٍ يُقْتَلُوْنَ بِهٰذِهِ الْعَرْصَةِ تَبْكِي عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ،

–আমরা হযরত আলী কাররামাল্লাহু ওয়াজহাহুর সাথে হযরত হোসাইন রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হুর কবরের জায়গাটিতে এলাম। তিনি তখন বললেন, এখানে তাঁদের উটগুলো বসবে। এখানে তাঁদের বাহনগুলো রাখা হবে। এখানে তাঁদের রক্তগুলো প্রবাহিত হবে। হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের নূরানী বংশের একটি দল এই ময়দানে শহীদ হবেন। তাঁদের জন্য সমস্ত জমিন ও আসমান ক্রন্দন করবে।[১]

অনুরূপ হযরত ইয়াহিয়া হাদ্বরামী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হু বলছেন, সিফ্‌ফীনের সফরে আমি হযরত আলী কাররামাল্লাহু তা'আলা ওয়াজ্‌হাহুর সাথে ছিলাম। তিনি যখন 'নিনুয়া' নামক স্থানটির কাছাকাছি এলেন বললেন, 'হে আবু আবদুল্লাহ! ফোরাতের তীরে তুমি ধৈর্য্য ধারণ করিও।' আমি বললাম, 'সেখানে কী?' জবাবে তিনি বললেন, প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, আমাকে জিবরাঈল বলেছেন :

أَنَّ الْحُسَيْنَ يُقْتَلُ بِشَطِّ الْفُرَاتِ وَأَرَانِي قَبْضَةً مِنْ تُرْبَتِهِ،

–হোসাইন ফোরাতের তীরে শহীদ হবেন। আর তিনি আমাকে সেখানকার এক মুষ্ঠি মাটিও দেখিয়েছেন।[২]

মোটকথা, হযরত হোসাইন রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হুর শাহাদাত সম্পর্কে এতই সাক্ষ্য-প্রমাণ বিদ্যমান যে, প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি

১. আল খাসায়িসুল কুবরা, ২: ১২৬। সিরুরুশ শাহাদাতাইন, ৩১।
২. আল খাসায়িসুল কুবরা, ২: ১২৬। সিরুরুশ শাহাদাতাইন, ৩০।

ওয়াসাল্লাম লোকচক্ষে বর্তমান থাকা কালেই আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা সকলেরই কাছে হযরত ইমাম হোসাইনের শাহাদাতের কথা বহুলভাবে আলোচিত হত।

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হু বলছেন :

مَا كُنَّا نَشُكُّ وَأَهْلُ الْبَيْتِ مُتَوَافِرُوْنَ أَنَّ الْحُسَيْنَ يُقْتَلُ بِالطَّفِّ،

–আমরা সহ পবিত্র আহ্‌লে বাইতগণের কারো মধ্যেই কোনরূপ দ্বিধা-সন্দেহ ছিল না যে, হযরত আলী কাররামাল্লাহু ওয়াজহাহুর প্রাণ-প্রিয় সন্তান হযরত হোসাইন রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হু 'ত্বাফ' (কারবালা) নামক জায়গাতেই শহীদ হবেন।[১]

একরোখা ভাব পোষণ করার কারণ :

হযরত ইমাম হোসাইন রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হু যখন মদীনা থেকে মক্কা এবং মক্কা থেকে কুফার দিকে রওয়ানা দিলেন, তখন সকলে তাঁকে বারণ করবার চেষ্টা করলেন। সবাই তাঁকে বললেন, কুফাবাসীরা চরম বিশ্বাসঘাতক। তারা আপনার সাথে প্রতারণা করবে। এত কিছু সত্ত্বেও শাহাদাতের দিকে তাঁর হন্‌হন্ করে চলা পদক্ষেপ রুদ্ধ হয় নি। কারণ, তিনি জানতেন যে, অনেক দিনের অপেক্ষার পর আজই সেই বরকতপূর্ণ সময়ের দেখা মিলতে যাচ্ছে, যেই সময়টিতে তাঁর নানাজানের (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম) শাহাদাতের জওহারের পূর্ণ প্রকাশ ঘটবে। নিজেকে তিনি সৌভাগ্যবান মনে করছিলেন। কেননা, মহান আল্লাহ্ তাঁর দেহটিকে 'শাহাদাতে ওজমা'র জন্য নির্বাচন করেছেন। অতএব, তিনি মানুষ-জনের পরামর্শে বিরত থেকে নিজেকে এত বড় নেয়ামত থেকে কেন বঞ্চিত করে রাখবেন? তাঁর গভীর ও দূরদৃষ্টির চোখ দিয়ে তিনি দেখতে পাচ্ছিলেন যে, হযরত ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হা রূহানীভাবে কারবালার ময়দানে তাঁরই দুধের প্রভাব অবলোকনের জন্য অপেক্ষমান থাকবেন, যাঁকে তিনি আপন বুকের দুধ পান করিয়ে লালন-পালন করেছেন, আজকের এই অগ্নিপরীক্ষায় তিনি কীরূপ হাসিমুখে থাকতে পারছেন! হযরত আলী কাররামাল্লাহু তা'আলা ওয়াজহাহুও নিশ্চয় আপন পবিত্র রক্তের রূপ ও রঙ দেখার জন্য ব্যাকুল হয়ে থাকবেন। আর স্বয়ং নবী পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম যিনি হযরত ইমাম হোসাইন রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হুকে নিজ কাঁধে সওয়ার নিতেন, সেজদাকালে পিঠে চড়ে বসার

১. আল খাসায়িসুল কুবরা, ২: ১২৬। সিরুরুশ শাহাদাতাইন, ৩০।

বেলায় নিজে থেকে নেমে না যাওয়া পর্যন্ত মস্তক উঠাতেন না, তিনিও নিশ্চয় অপেক্ষা করে থাকবেন যে, আজ আমার পুত্র আমার শাহাদাতের জওহারের পরাকাষ্ঠা কীভাবে প্রদর্শন করছেন, আমার নবী-চরিতের পাতায় শাহাদাতের অধ্যায় কীভাবে রচনা করছেন, আমার কাঁধের উপর সওয়ার হওয়া হোসাইন আজ আমার দীনের নব জাগরণ কীভাবে ঘটাচ্ছেন?

অতএব, সাইয়েদুনা ইমাম হোসাইন রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হু যখন কারবালার ময়দানে গিয়ে উপস্থিত হলেন, তখন তিনি সাথীদেরকে বার বার করে বললেন, আমার ভাগ্যে শাহাদাত নির্ধারিত হয়ে আছে। আমাকে শহীদ হতে হবে। কিন্তু আমি তোমাদেরকে শাহাদাতের গুরু দায়িত্ব সমর্পন করতে চাই না। তোমাদের মধ্য হতে যারাই চলে যেতে চাও রাতের অন্ধকারেই পাড়ি জমাও। আমি কোন আপত্তি করব না। যেহেতু তিনি জানতেন যে, তাঁর শাহাদাত নবী-জওহারের পূর্ণ প্রকাশের জন্যই নির্ধারণ করে রাখা ছিল, সেহেতু তিনি নিজের প্রাণ উৎসর্গ করার বিপরীতে আত্মরক্ষার কোন পথই অবলম্বন করার চেষ্টা করলেন না। জীবনের কোন সময়েও তাঁকে আল্লাহ্‌র দরবারে এহেন পরিণতি থেকে বাঁচার জন্য দোয়া করতে দেখা যায় নি। তিনি যদি দোয়া করতেন, তা হলে হয়ত কারবালার চিত্রই পাল্টে যেতে পারত। আহ্‌লে বাইতের একেকজন করে শহীদ হওয়ার স্থলে এজিদ-বাহিনীই লণ্ড-ভণ্ড হয়ে যেতে পারত। দোয়ার কারণে পরিস্থিতি বদলে যেতে পারত। কিন্তু সেই পথে নবী-শাহাদাতের জওহারের পরাকাষ্ঠার প্রকাশ সম্ভবপর ছিল না।

হযরত ইমাম হোসাইন রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হু যদি ইচ্ছা করতেন, তিনি যদি আসমানের দিকে মুখ করতেন, তা হলে মহান আল্লাহ্ মেঘমালাকে নির্দেশ দিতেন, মেঘ বর্ষিত হত, পিপাসার্ত দৃশ্য আর থাকত না। কিন্তু এ তো ছিল নবী-শাহাদাতেরই প্রকাশ। আর শাহাদাতে যতই জুলুম সহ্য করতে হয়, যতই অভাবের সম্মুখীন হতে হয়, যতই অসহায়ত্ব মেনে নিতে হয়, ততই তার মর্যাদারও উত্তরণ ঘটে থাকে। হযরত ইমাম হোসাইন রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হু পানি পান করেও শহীদ হতে পারতেন। কিন্তু পানি পান করে শহীদ হওয়া আর পিপাসার্ত অবস্থায় তড়পাতে তড়পাতে শহীদ হওয়া এক কথা নয়। জুলুমের শিকার হওয়ার এই সকল অবস্থা ও পরিস্থিতি ছিল শাহাদাতের জওহারকে তার চরম পরাকাষ্ঠায় উপনীত করিয়ে দেবার জন্যই। হযরত ইসমাঈল আলাইহিস সালামের পবিত্র কদমের মৃদু আঘাতে যদি ঝর্ণা সৃষ্টি হয়ে যেতে পারে, সেক্ষেত্রে রাসূল-দৌহিত্র ইমাম হোসাইনের পক্ষে এও অসম্ভব ছিল

না যে, তাঁর নির্দেশে কারবালার ময়দানে কয়েকটি পানির ফোয়ারা প্রবাহিত হয়ে যায়। তিনি যদি ফোরাতের দিকে ইঙ্গিত করতেন, ফোরাত তার দিক পরিবর্তন করে তাঁরই পদযুগলে চলে আসত। মোটকথা, তিনি যা চাইতেন, মহান আল্লাহ তা করেই দিতেন। কিন্তু না তিনি সেরূপ চেয়েছেন, না স্বয়ং আল্লাহ্ সেরূপ করে দিয়েছেন। এ কারণেই যে, এর মাধ্যমে নবী-চরিতেরই এমন একটি অধ্যায়ের সূচনা হওয়ার ছিল যা প্রিয় নবীর জাহেরী জীবনে সূচিত হতে পারে নি।

ইমাম হোসাইন রাদিয়াল্লাহু আন্হুর শাহাদাতে সব ধরনের পরীক্ষা বিদ্যমান:

হযরত ইমাম হোসাইন রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হুর শাহাদাত সংঘটিত হয় পবিত্র মুহররম মাসের দশম তারিখে, অত্যন্ত প্রসিদ্ধি সহকারে, অত্যন্ত আলোচনামুখর পরিবেশে আর অত্যন্ত সহিষ্ণুতার সাথে। পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ স্বীয় বান্দাদেরকে পরীক্ষা করবার যেসব দিকসমূহ বর্ণনা করেছেন যেমন, গৃহছাড়া করা, দুর্দশাগ্রস্ত রাখা, আল্লাহর রাস্তায় জীবন বিসর্জন দেওয়া ইত্যাদি সমস্ত পদ্ধতি ও সব ধরনের পরীক্ষা ইমাম হোসাইন রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হুর শাহাদাত ও কারবালার যুদ্ধে একই সাথে পরিদৃষ্ট হয়। তার কারণ হল, এ ছিল নবী-শাহাদাতেরই জওহারের প্রকাশ। যে-কোন একটি পরীক্ষাও যদি বাদ পড়ে যেত তা হলে শাহাদাতের জওহারের প্রকাশ পরম ও চরমভাবে হতে পারত না। তাই মহান আল্লাহ ইমাম হোসাইন রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হুর শাহাদাতে সব ধরনের পরীক্ষা একত্র করে দিয়েছেন।

হযরত হোসাইন রাদিয়াল্লাহু আন্হুর শাহাদাত নবী কর্তৃক দৃষ্ট হওন :

অন্যান্যদের শাহাদাতের তুলনায় হযরত ইমাম হোসাইন রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হুর শাহাদাত এ কারণেও আলাদা যে, অন্যান্যদের শাহাদাত কেবল ফেরেশতগণ কর্তৃক পরিদৃষ্ট হয়ে থাকে। অথচ ইমাম হোসাইন রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হুর শাহাদাত স্বয়ং নবী কর্তৃক পরিদৃষ্ট। অন্যান্য শাহাদাতে যেহেতু কেবল ফেরেশতা উপস্থিত হয়ে থাকেন, তাই ফেরেশতাগণের উপস্থিতির কারণে সেসব শাহাদাত শুধু 'মাশহুদ বিল মালায়িকা' বা ফেরেশতা কর্তৃকই পরিদৃষ্ট হয়ে থাকে। কিন্তু ইমাম হোসাইন রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হু এমন ভাগ্যবান শহীদ যে, যখনই তাঁর শাহাদাতের সময় এল ফেরেশতাকুল তো রয়েছেনই, স্বয়ং তাজেদারে কায়েনাতই তাঁর শাহাদাতের সময় উপস্থিত ছিলেন। আর প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লামেরই

উপস্থিতিতে হযরত ইমাম হোসাইন রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হুর পবিত্র দেহ থেকে রূহ মোবারক টি কবজ করা হয়।

যথা, হিবরুল উম্মাহ্, তরজুমানুল কুরআন হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হু থেকে বর্ণিত :

رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا يَرَى النَّائِمُ ذَاتَ يَوْمٍ بِنِصْفِ النَّهَارِ أَشْعَثَ أَغْبَرَ بِيَدِهِ قَارُورَةٌ فِيهَا دَمٌ فَقُلْتُ: بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي مَا هَذَا؟ قَالَ: «هَذَا دَمُ الْحُسَيْنِ وَأَصْحَابِهِ وَلَمْ أَزَلْ أَلْتَقِطُهُ مُنْذُ الْيَوْمِ» فَأَحْصَى ذَلِكَ الْوَقْتَ فَأَجِدُ قَبْلَ ذَلِكَ الْوَقْتِ.

–একদা মধ্যাহ্নকালে নবী পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ঘুমন্ত ব্যক্তিরা যেভাবে (স্বপ্নে) কাউকে দেখে থাকে, তদ্রূপ দেখতে পেলাম। তাঁর চুলগুলো ছিল এলোমেলো ও ধূলামলিন। তাঁর হাতে রক্ত ভর্তি একটি বোতল। আমি আরজ করলাম, আপনার চৌকাঠে আমার পিতা-মাতা কুরবান, আপনার হাতে এগুলো কিসের রক্ত? তিনি বললেন, এগুলো হোসাইন ও তাঁর সাথীদেরই রক্ত। আজ সারা দিন ধরে (সকাল থেকে এখন পর্যন্ত) এগুলো আমি বোতলে ভর্তি করেছি। (হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হু বলছেন) আমি সেই সময়টির কথা (অর্থাৎ যখন আমি এই স্বপ্নটি দেখছিলাম) স্মরণে রেখে দিলাম। পরবর্তীতে সেই সময়টিতেই হযরত ইমাম হোসাইন রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হুকে শহীদ হতে পেয়েছিলাম।

একটি ভ্রম নিরসন :

মনে কখনো এ ধরনের ভুল সন্দেহ যেন সৃষ্টি না হয় যে, কারবালার ময়দানে তো প্রায় বাহাত্তর জন শহীদ হয়েছিলেন। এতগুলো লোকের রক্ত একটি বোতলে কীভাবে সংকুলান হল? এটি তো আকায়ে দো-জাহানের মুজেযাই। যেভাবে তিনি হোদায়বিয়ার সময় চৌদ্দশত সাহাবার অযুর পানি একটি বদনাতেই সংকুলান করে নিয়েছিলেন। যেভাবে মাত্র এক পেয়ালা দুধ পান করে তৃপ্ত হয়েছিলেন সত্তরজনের কাছাকাছি আসহাবে সুফ্ফা। ঠিক সেভাবেই বাহাত্তর জন পবিত্র আত্মার রক্ত এক বোতলেই সংকুলান হয়ে গিয়েছিল। এটি

যেহেতু মুজেযাই, তাই এটিকে অনুমানের বাটখারা দিয়ে পরিমাপ করার চেষ্টা করবেন না। কেননা, মুজেযা মানুষের জ্ঞান-বুদ্ধির অনেক উর্ধ্বের।

হযরত সালমার বর্ণনা :

উম্মুল মুমিনীন হযরত উম্মে সালেমা যিনি হযরত ইমাম হোসাইন রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হুর শাহাদাতের সময় জীবিত ছিলেন, তাঁর সম্বন্ধে হযরত সাল্মা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হা বলছেন :

دَخَلْتُ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ وَهِيَ تَبْكِي فَقُلْتُ مَا يُبْكِيكِ قَالَتْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَعْنِي فِي الْمَنَامِ وَعَلَى رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ التُّرَابُ فَقُلْتُ مَا لَكَ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ شَهِدْتُ قَتْلَ الْحُسَيْنِ آنِفًا.

–আমি একদা উম্মে সালেমার নিকট গেলাম। তিনি তখন কান্না করছিলেন। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি কান্না করছেন কেন? হযরত উম্মে সালেমা বললেন, আমি আল্লাহ্র রাসূলকে স্বপ্নে দেখেছি যে, তাঁর মস্তক ও দাঁড়ি মোবারক ধূলামলিন। আমি আরজ করলাম, এয়া রাসূলাল্লাহ! কী ব্যাপার (আপনার বদনে এসব ধূলা-বালি কিসের)? তিনি তখন বললেন, আমি এইমাত্র হোসাইনকে শহীদ হতে দেখলাম।[১]

উক্ত হাদিসাদি দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, হযরত ইমাম হোসাইন রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হুর শাহাদাত ছিল 'মাশহুদ বিন্নবী' বা নবী কর্তৃক পরিদৃষ্ট।

হযরত ইমাম হোসাইন-এর শাহাদাত নবী পাক কর্তৃক পরিদৃষ্ট হওয়ার কারণ :

শহীদের মৃত্যুকালে ফেরেশতারা এসে উপস্থিত হন, যাতে সম্মান ও মর্যাদার সাথে তাঁর রূহটি মহান আল্লাহ্র দরবারে নিয়ে যেতে পারেন এবং ফেরেশতাদের সমবিভ্যাহারে একটি মিছিলের আকারে শহীদের রূহটিকে আল্লাহ্র দরবারে পেশ করা যায়। হযরত ইমাম হোসাইন রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হুর শাহাদাতের সময় স্বয়ং নবী পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপস্থিত থাকার কারণ এই বলে মনে হয় যে, আকায়ে দো জাহান আগে থেকেই জানতেন যে, হোসাইনের এই শাহাদাত দুনিয়ার তামাম

১. সুনানে তিরমিযী। আবওয়াবুল মানাকিব।

শাহাদাত থেকে আলাদা। তিনি বুঝতেন, যে অপ্রাপ্তি, অসহায়ত্ব, জুলুম, অত্যাচারের মাঝে তাঁর হোসাইনকে শহীদ করা হবে, সেই সময়ে হোসাইনের পাশে দণ্ডায়মান থাকা তাঁর উচিত। তা হলে তাঁকে দেখতে পেয়ে হোসাইনের বীরত্ব ও সাহস অটুট থাকবে আর সেই বীরত্ব ও সাহস, দৃঢ়তা ও অটলত্ব নিয়ে তিনি তাঁর জীবনটিকে জীবনদাতার হাতে সঁপে দিতে পারবেন।

কুস্তি প্রতিযোগিতায় কোন কুস্তিবীর যেমনটি করে নিজের ওস্তাদের উপস্থিতিতে সাহস পায় এবং বুকে বল পায়, সম্ভবত ইমাম আলী মকামও তেমনটি করে প্রিয় নবীর উপস্থিতির কারণে দৃঢ়তা ও অটলত্বের আদর্শ হয়ে তুমুল যুদ্ধের ময়দানে সদর্পে বীরত্ব প্রদর্শন করে চলবেন, দো জাহানের আকা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম চোখের সামনেই থাকবেন, আর বলবেন, হে প্রিয় বৎস হোসাইন! বর্ষার সূচাগ্র ফলকে সওয়ার হয়ে আজ তোমাকে আমার কাঁধে চড়ার সম্মান রক্ষা করতে হবে যে! কারবালার তপ্ত মরু প্রান্তরে কঠোর পিপাসায় কাতর অবস্থায় জীবন উৎসর্গ করে আমার চুষে খাওয়া জিহ্বার মান রাখতে হবে যে! হোসাইন! শেরে খোদা আলীর টগবগ করা শোণিত প্রবাহ তোমার রগ-রেশায় খেলা করছে। আজ সেই শোণিতের পবিত্রতার দোহাই, আমার কন্যা ফাতেমা যাহরার পান করা পবিত্র দুধের মর্যাদা রাখতে হবে যে!

অতএব, হযরত ইমাম আলী মকাম রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হু স্বীয় নানাজানের (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সেই সাহস যোগানোর উপর ভর করেই অসম সাহসিকতা ও বীরত্বের সাথে নিজের দেহকে ক্ষত-বিক্ষত করিয়ে দিলেন, কিন্তু কপালের বলীরেখায় এতটুকু ভাঁজ পড়ে নি। এভাবেই তিনি শেরে খোদা হযরত আলী ও নবী-তনয়া হযরত ফাতেমার কলিজার টুকরা হওয়ার এবং আকায়ে দো জাহানের (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম) প্রাণাধিক হওয়ার হক আদায় করলেন!

শাহাদাতের পর সাক্ষ্য প্রদান :

'শাহাদাতে'র এক অর্থ 'সাক্ষ্য প্রদান'। শহীদ নিজের জীবন বিসর্জন দেওয়ার মাধ্যমে মহান আল্লাহ্র প্রতিপালক হওয়ার এবং তাঁর দীন সত্য হওয়ার পক্ষে সাক্ষ্য প্রদান করে থাকেন। যাদেরকে আল্লাহ্র রাস্তায় কতল করে দেওয়া হয়েছে সেই শহীদদের সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা এরশাদ করছেন :

وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ ۚ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ ﴿١٥٤﴾

–যারা আল্লাহ্র রাহে কতল হয়ে যায়, তোমরা তাদের মৃত বলিও না। তারা বরং জীবিতই। কিন্তু তোমরা তাদের জীবন অনুধাবন করতে পার না।[১]

শহীদরা জীবিত হয়ে থাকেন। কিন্তু তাঁদের সেই জীবন আমাদের কপালের দৃষ্টি থেকে গোপন থাকে। শহীদ হয়ে যাওয়ার পর কোন ব্যক্তি 'শহীদরা জীবিত' –আল্লাহ্র এই বাণীটির পক্ষে সাক্ষ্য প্রদান করে নি, কিন্তু হযরত ইমাম হোসাইন রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হুর শাহাদাত এমন যে, তাঁর নূরানী শির মোবারক কর্তিত অবস্থায় এবং শরবিদ্ধ অবস্থায় শহীদদের জীবিত হওয়ার পক্ষে সাক্ষ্য দিয়েছে। আর ঘোষণা করে দিয়েছে যে, শহীদরা যে জীবিত সে কথা চিরসত্য।

কর্তিত মস্তকের সাক্ষ্য :

হযরত ইমাম হোসাইন রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হুর কর্তিত মস্তক মোবারকের বর্শাবিদ্ধ অবস্থায় বলে ওঠাই শহীদদের জীবিত হওয়ার উজ্জ্বল ও অকাট্য প্রমাণ বহন করে।

হযরত মিনহাল ইবনে আমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হু বলছেন, আল্লাহ্র কসম, হযরত ইমাম হোসাইন রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হুর পবিত্র মস্তক মোবারক যখন বর্শাবিদ্ধ করে দামেশকের বাজারের অলিতে-গলিতে ঘুরে বেড়ানো হচ্ছিল, আমি তখন দামেশকেই ছিলাম। আমি স্বচক্ষে দেখেছি যে, সেই মস্তক মোবারকের সম্মুখে জনৈক ব্যক্তি সূরা কাহাফ তিলাওয়াত করছিলেন। লোকটি যখন أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا 'তুমি কি বুঝে নাও নি যে, নিঃসন্দেহে 'আসহাবে কাহাফ' ও 'রাকীম' ছিল আমার নিদর্শনাবলির মধ্য হতে একটি আশ্চর্যজনক নিদর্শন।'[২]– এই আয়াতটি তিলাওয়াত করছিলেন, সেই মুহূর্তে মহান আল্লাহ্ সেই মস্তককে কথা বলার ক্ষমতা দিলেন, আর মস্তকটি নির্ভুল ভাষায় উচ্চারণ করল :

أَعْجَبُ مِنْ أَصْحَابِ الْكَهْفِ قَتْلِيْ وَحَمْلِيْ.

১. সূরা: বাকারা, ২: ১৫৪।
২. সূরা: কাহাফ, ৯: ১৮।

–আমাকে কতল করা আর আমার মস্তক বর্শাবিদ্ধ করে বাজারের অলিতে-গলিতে কোরাস মিছিল করা আসহাবে কাহাফের ঘটনার চাইতেও অধিক আশ্চর্যজনক।[১]

নিঃসন্দেহে হযরত ইমাম হোসাইন রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হুকে কতল করে ফেলা, তাঁর মস্তক বর্শাবিদ্ধ করে দামেশকের বাজারে বাজারে ঘুরিয়ে বেড়ানো আসহাবে কাহাফের ঘটনার চাইতেও সমধিক আশ্চর্যজনকই বটে। কেননা, আসহাবে কাহাফ যেসব লোকদের ভয়ে গৃহ-গৃহস্থালী ত্যাগ করে, ধন-সম্পদ পরিহার করে বেরিয়ে পড়েছিল আর গুহায় আত্মগোপন হয়ে ছিলেন, তারা ছিল কাফির। কিন্তু হযরত ইমাম হোসাইন রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হু, তাঁর পরিবার-পরিজন ও সকল সাথীদের উপর যারা অত্যাচার-নিপীড়ন-নির্যাতন চালিয়েছিল এবং অসম্মান করেছিল তারা সবাই ছিল ঈমান ও ইসলামেরই দাবীদার। আসহাবে কাহাফগণ ছিলেন আল্লাহর অলী। আসহাবে কাহাফগণ বহু বৎসর পরই ঘুম থেকে জেগে উঠেছিলেন, আর কথা বলেছিলেন। কিন্তু সর্বাবস্থায় তারা জীবিতই ছিলেন। অথচ হযরত ইমাম হোসাইন রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হুর নূরানী মস্তক ধড় থেকে পৃথক হওয়ার কয়েক দিন পরেও বর্শার আগা থেকে কথা বলে ওঠা আসহাবে কাহাফের ঘটনার চাইতেও অধিক আশ্চর্যজনক।

বৈশিষ্ট্যগত পার্থক্য :

অন্যান্য শহীদদের তুলনায় হযরত ইমাম হোসাইন রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হুর শাহাদাত এ কারণেও আলাদা ছিল যে, অন্যান্য শাহাদাত তো ঘটনা সংঘটিত হওয়ার পরেই লিখিত হয় কিংবা আলোচনায় আসে। কিন্তু ইমাম হোসাইনের শাহাদাত এমন যে, পঞ্চাশ বৎসর পূর্বেই স্বয়ং নবী পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই শাহাদাতের আলোচনা করেছিলেন। আরো কারণ হল, অন্য সব শাহাদাতের বর্ণনাকারী হয়ে থাকে সাধারণ লোকজন। কিন্তু হযরত হোসাইনের শাহাদাতের বর্ণনাকারী হলেন স্বয়ং নবী পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম, পবিত্র বিবিগণ আর সাহাবায়ে কেরাম। অন্যদের শাহাদাত যে মহান নয়, তা অবশ্য বলছি না, কিন্তু তাঁদের শাহাদাত আর হযরত ইমাম হোসাইনের শাহাদাতে পার্থক্য হচ্ছে, অন্যরা যখন শাহাদাতের ময়দানে গমন করেন, তখন যদিও তাদের মাঝে শহীদ হওয়ার

[১]. সিরুরুশ শাহাদাতাইন, ৩৫। নূরুল আবসার, ১৪৯। শরহুস সুদূর, ৮৮।

অদম্য আগ্রহ ও স্পৃহা বিরাজমান থাকে, তবু কিন্তু তাঁদের এই কথা কেউ বুঝতে পারে না যে, সত্য সত্যই ইনি শহীদ হবেন, কিংবা ইনি গাজী হয়ে ফিরে আসবেন। পক্ষান্তরে ইমাম আলী মকাম সাহাবায়ে কেরামগণের পক্ষ থেকে বাধা পাওয়া সত্ত্বেও কারবালার মরুপ্রান্তরের দিকে হনহন করে অবারিত পদক্ষেপে পথ চলছিলেন। তাহলে তো তিনি অবশ্যই নিজের শাহাদাত সম্পর্কে আগে থেকেই জানতেন! তিনি জানতেন যে, কারবালার তপ্ত মরুপ্রান্তর তাঁর শাহাদাতের অপেক্ষা করে রয়েছে। তিনি কীভাবে সফর না করে পারেন। কেননা, তিনি তো পঞ্চাশ বৎসরেরও বেশি সময় এশকে ইলাহী ও মাহবুবে হাকীকীর বিরহ-বেদনায় বিধুর হয়ে কাটিয়েছেন। তিনি তো সেই ফোরাত নদীর তীর ও কারবালার মরু-ময়দানের অপেক্ষায় রয়েছেন। তিনি তো সেই পরম মুহূর্তেরই অপেক্ষায় ছিলেন, কখন এই বিরহের দিনগুলো শেষ হয়ে যাবে, কখন গ্রীবাদেশে চলবে তরবারির চোট আর উন্মুক্ত হয়ে যাবে পরম বন্ধুর মুখকর রূপের কাঙ্ক্ষিত জলওয়া। আশেকেরা তাদের পরিণতিতে ভয় করে না। আশেকদের পদক্ষেপ তো প্রিয়তমের চেহারাকে একবার নয়ন ভরে দেখার অদম্য আগ্রহে সামনের দিকে হনহন করেই চলতে থাকে।

এই কারণেই, মঞ্জিলে মঞ্জিলে তিনি থেমে থেমে নিজের সাথীদের বলেছিলেন, 'আমি কোনরূপ নেতৃত্বের লোভে সেখানে যাচ্ছি না। এই সফরের পরিণতি পীড়াদায়কও হতে পারে। তাই আমি তোমাদেরকে খোলা মনে অনুমতি দিচ্ছি, যার ইচ্ছা ফিরে যেতে পার। আমি ওয়াদা দিচ্ছি যে, তার উপর আমি না-রাজ হব না। কেউ যদি দিনের আলোয় চলে যেতে ভয় পেয়ে থাক, তা হলে রাতের অন্ধকারে হলেও চলে যাও। আমি কোন আপত্তি করব না।' কিন্তু সকলেই বলে উঠলেন, 'হে ইমাম আলী মকাম! স্বদেশ ত্যাগের এই সফরে আজ আপনাকে একা রেখে আমরা যদি চলে যাই, কাল কেয়ামতের দিন মহান আল্লাহর দরবারে কীভাবে মুখ দেখাব!'

কারবালার যুদ্ধ কি দুই শাহজাদার যুদ্ধ ছিল?

কোন কোন লোকের মুখে এই কথা শুনে আশ্চর্যও লাগে, দুঃখও বোধ হয় যে, কারবালার যুদ্ধ ছিল দুই শাহজাদার যুদ্ধ! তাদের স্বল্পবোধের প্রতি করুণা হয় যারা এই কথা বলে যে, এ ছিল নেতৃত্ব লাভের যুদ্ধ! নির্বোধেরা! হযরত ইমাম হোসাইন রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হুর দৃষ্টিকোণটি কখনো যাচাই করে দেখেছেন কি? তিনি তো ছোটবেলা থেকেই জানতেন যে, কারবালা সফর করবেন আর সেখানে তিনি শাহাদাতের পরম সুধা পান করবেন। তিনি তো

নবী পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুখের বুলি থেকে অনেক আগে থেকেই জানতে পেরেছিলেন যে, ইরাকের জমিনে তাঁর সফর হবে শাহাদাতের সফর।

যেসব লোক এ কথা বলে যে, এ যুদ্ধ ছিল দুই শাহজাদার এবং নেতৃত্বের, তাদের হয়ত এই কথা স্বীকার করতে হবে যে, নাঊযু বিল্লাহ্ হযরত হোসাইন রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হু নবী পাকের ভবিষ্যৎ বাণীতে বিশ্বাস করতেন না। এ কথা যদি তারা স্বীকার করতে না পারে, অবশ্যই না পারে, তা হলে এ কথা তো স্বীকার করতেই হবে যে, হযরত ইমাম হোসাইন নেতৃত্বের লোভে যাচ্ছিলেন না, বরং তিনি নিজের শাহাদাতের দিকেই ধাবিত হতে চলেছিলেন।

সমস্ত গৃহবাসীদের কুরবানী :

ইসলামের ইতিহাসে আরো অনেক ধরনের শাহাদাতের ঘটনা রয়েছে। আর যে-কোন শাহাদাত মানেই মুসলমানদের স্বার্থ। কিন্তু হযরত হোসাইন রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হুর শাহাদাত অন্যান্যদের শাহাদাতের তুলনায় অত্যধিক গুরুত্বপূর্ণ। দুনিয়ার বিভিন্ন স্থানে এই শাহাদাতের মর্যাদা অন্য সব শাহাদাতের চাইতে অধিক এ কারণেই যে, এতে শহীদ হওয়া ব্যক্তিবর্গের সাথে নবী পাকের বিশেষ সম্পৃক্ততা রয়েছে। তদুপরি শাহাদাতের এই উপাখ্যান নবী-বাগানের কেবল একটি মাত্র ফুলকে ঘিরেই রচিত হয় নি, বরং এ হচ্ছে সম্পূর্ণ নবী-বাগানেরই কুরবানী। অন্য সব শাহাদাতের ইতিহাস এক, দুই, তিন কি চারজনের শাহাদাত বরণ করার মধ্যেই সীমিত থেকে যায়। কিন্তু কারবালার ঘটনা নবী-বাগানের বিশ বিশটি ফুলই অকালে ঝরে যাওয়ার ইতিহাস। তাই ইতিহাসের কোন যুগেই মুসলিম উম্মাহ্ কারবালার ঘটনার কথা, সেটির পুংখানুপুংখ ইতিহাসের কথা এবং সেটির গুরুত্বের কথা ভুলে যেতে পারে না। কিন্তু তা সত্ত্বেও কিছু কিছু নির্বোধ লোক মূর্খতা হেতু কিংবা আহলে বাইতের মহব্বত থেকে বঞ্চিত হওয়া ও নিজের বদবখতীর কারণে আহলে বাইত-বিদ্বেষী রূপে যারা তাদের মাঝে ঢুকে রয়েছে কারবালার ঘটনার গুরুত্ব কমিয়ে দেওয়ার জন্য সর্বদা চেষ্টিত থাকে। আর নাঊযু বিল্লাহ্ দুই শাহজাদার যুদ্ধ নামে চালিয়ে দিয়ে ঘটনাটিকে অন্যদিকে প্রবাহিত করার অভিসন্ধি চালায়। কারবালার ঘটনাটিকে দুই শাহজাদার যুদ্ধ বলে চালিয়ে দেবার চেষ্টা করা অতি বড় অবিচার, মুনাফিকীর পক্ষপাতিত্ব এবং ইচ্ছাকৃতভাবে মহাসত্য এড়িয়ে চলা ছাড়া

আর কিছুই নয়। তাছাড়া এটি সরাসরি ইসলামের ইতিহাসকে বিকৃত করারই শামিল। কিন্তু ওসব অপচেষ্টা অব্যাহত থাকা সত্ত্বেও সবশেষে বলতে হয় :

قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے
اسلام زندہ ہوتا ہے کربلا کے بعد

হোসাইন জিয়েছে, হয়েছে শহীদ, মরেছে এজিদ!
ভাই!
ইসলামের পুনঃ জীবন লাভে
কারবালা হওয়া চাই।

অধ্যায় : ০৩

ইমাম হোসাইন

রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হুর

শাহাদাত নবী-চরিতেরই একটি অধ্যায়

ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, ইসলামের প্রারম্ভিক যুগ থেকে আজ পর্যন্ত এমন দুইটি মূলতত্ত্ব রয়েছে, যেগুলোর বিশদ আলোচনা বিভিন্ন গ্রন্থে পরিলক্ষিত হয়। আর সেগুলো এতই ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ সহকারে বর্ণনা করা হয়েছে যে, মনে হয় অন্য কোন মূলতত্ত্বই প্রসিদ্ধি ও ব্যাখ্যার দিক থেকে সেই মর্যাদায় পৌঁছাতে পারে নি। সেই দুইটি মূলতত্ত্বের একটি হল নবী-চরিত আর অপরটি হচ্ছে ইমাম হোসাইনের শাহাদাত।

নবী-চরিত ও শাহাদাতে-হোসাইনের বিশেষত্ব :

মানব ইতিহাসের বিভিন্ন যুগে সঠিক পথের দিশা দেবার জন্য এ ধরায় আগমন করেছেন দীনের অসংখ্য পৃষ্ঠপোষক। তাঁদের জীবনী ও জীবন-চরিত নিয়ে তাঁদেরই অনুরাগীরা অসংখ্য গ্রন্থও প্রণয়ন করেছেন। কিন্তু নবী পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম ব্যতীত আজ পর্যন্ত কোন যুগে কোন জাতির মাঝে এমন কোন পথ-প্রদর্শক নাই, যার আবির্ভাব থেকে শুরু করে তিরোধান পর্যন্ত সারাটি জীবনের সব কটি অধ্যায় ও দিকের সমস্ত বিষয় বিদ্যমান রয়েছে। যাঁর বরকতময় পবিত্র সত্তা সম্পর্কে আমরা এতই আলোচনা ও বর্ণনা পাই যে, বেলাদত থেকে আরম্ভ করে বেসাল পর্যন্ত তাঁর ঘরের বা বাইরের কোন দিকই এমন নাই যা বিশ্ব-মানবতার সমক্ষে প্রকাশমান ও বিদ্যমান নয়। চৌদ্দশত বৎসর অতিবাহিত হয়ে যাওয়ার পরও সীরতুন্নবী বা নবী-চরিতের কোন একটি দিকই আমাদের দৃষ্টি থেকে গোপন নয়। সেই দিক থেকে নবী পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের সীরত বা জীবন-চরিত স্বতন্ত্র ও বিশেষত্বেরই একমাত্র দাবীদার।

অনুরূপ হক ও বাতিলের ইতিহাসে কল্যাণ ও অকল্যাণের লাখো যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে। শহীদ হয়েছেন হাজারো। বিশেষ করে ইসলামের প্রথম যুগগুলো ভরপুর ছিল অগণিত মহান শাহাদাতের ইতিহাসে। তা সত্ত্বেও এই কথা দিব্যি সূর্যালোকের ন্যায় জাজ্জ্বল্যমান যে, আজও পর্যন্ত অন্য কারো শাহাদাত এত বেশি প্রসিদ্ধি, গ্রহণযোগ্যতা ও সর্বজন আলোচ্য বিষয়ে রূপ নিতে পারে নি, যা নিয়েছে হযরত হোসাইন রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হুর শাহাদাত। সাড়ে তের শত বৎসর অতিবাহিত হয়ে যাওয়ার পরও হযরত ইমাম হোসাইন রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হুর শাহাদাতের কথা আজও সারা বিশ্বে আলোচিত হতে রয়েছে। তাঁর প্রসিদ্ধি ও আলোচনার আজও পর্যন্ত কমতি হয় নি। তাঁর শাহাদাতের কথা বৃদ্ধিই পেতে চলেছে। এমনকি যে-কোন যুগেই 'হোসাইনিয়াত' বা হোসাইনী দর্শন চিরসত্যের অম্লান প্রতীক হয়ে রয়েছে, আছে এবং থাকবে। পক্ষান্তরে

'এজিদিয়াত' বা এজিদী কর্মকাণ্ড যে-কোন যুগেই চিহ্নিত হয়ে থাকবে ফিত্না-ফসাদ ও নষ্টের আলামত রূপে।

শাহাদাতে-হোসাইন ঃ নবী-চরিতেরই একটি অধ্যায় :

যদিও কোন কোন নবী এবং অনেক অনেক জলীলুল কদর সাহাবাও শাহাদাতের সৌভাগ্য লাভ করেছেন, কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, নবী না হওয়া সত্ত্বেও যে প্রসিদ্ধি হযরত ইমাম হোসাইনের অর্জিত হয়েছে এমনরূপ প্রসিদ্ধি আর কারো ভাগ্যেই জোটে নি।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের আলোচনা তো খাতামুন নবিয়্যিন (সর্বশেষ নবী) হওনের আওতায় কেয়ামত পর্যন্ত অক্ষুন্ন ও চির চর্চামান থাকতে হয়। যেহেতু নবী পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুয়ত সর্বজাগতিক, সার্বজনীন এবং স্থান-কাল ও পাত্রের অনেক উর্ধ্বে, তাই তাঁর বরকতপূর্ণ আলোচনারও এহেন আলাদা বিশেষত্বজনিত মর্যাদা রয়েছে যে, তা সর্বদা চর্চামান থাকবে, কখনো ম্লান হয়ে যেতে পারবে না। এমন ধরনের অবিসম্বাদিত চির অম্লান রূপ ও রঙ যদি হযরত হোসাইন রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হুর শাহাদাতেও পরিদৃষ্ট হয়, তাহলে ইমাম হোসাইন রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হুর শাহাদাত নবী পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের মোবারক সীরতের কিতাবেরই কোন অধ্যায় হয়ে যায় না কি! যা নবী পাকের মোবারক জীবনে রচিত হতে পারে নি, যে কারণে মহান আল্লাহ্ নবী-চরিতের এই দিকটির পূর্ণ বিকাশের জন্য তাঁরই বংশ হতে ইমাম হোসাইনকেই নির্বাচিত করে রাখেন।

আর ইমাম হোসাইনের শাহাদাতের সর্বযুগীয় চর্চা, স্থায়ী আলোচনা এবং বহুল প্রসিদ্ধি মূলত এ কারণেই যে, তাঁর শাহাদাতটি বস্তুত নবী-চরিতেরই একটি অধ্যায়, নবীর পবিত্র জীবন-চরিতের বিভিন্ন দিকসমূহেরই একটি দিক এবং তাঁর মর্যাদা ও পরমত্বসমূহেরই একটি পূর্ণতা। তাঁর এই শাহাদাতের অস্তিত্ব নবী-চরিত থেকে ভিন্ন নয়। এ কারণেই মর্যাদা ও গ্রহণযোগ্যতার যে রূপ ও রঙ আমরা নবী-চরিতের মাঝে দেখতে পাই, সেই রূপ ও রঙের ঝলক নবী করীমের সীরতের বদৌলতে ইমাম হোসাইনের শাহাদাতেও বিরাজমান রয়েছে!

ইমাম হোসাইনের শাহাদাত নবী-চরিতেরই একটি অধ্যায়– এটি প্রমাণিত করার পূর্বেই আমরা ভূমিকায় আলোচনা করেছি যে, শাহাদাতও হল আল্লাহ্র একটি মহান নেয়ামত। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর নেয়ামতপ্রাপ্ত বান্দাদের মধ্যে

শহীদগণকেও শামিল করেছেন। যথা, সূরা নিসায় আল্লাহ্ তা'আলা এরশাদ করছেন :

وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ فَأُوْلَٰٓئِكَ مَعَ ٱلَّذِينَ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ ٱلنَّبِيِّـۧنَ وَٱلصِّدِّيقِينَ وَٱلشُّهَدَآءِ وَٱلصَّٰلِحِينَ ۚ ﴿٦٩﴾

–যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও রাসূলের আনুগত্য পোষণ করবে, সে আল্লাহ্র নেয়ামতপ্রাপ্ত বান্দা নবী, সিদ্দীক, শহীদ ও সালিহ্দের সঙ্গ লাভ করবে।[১]

আর এই সেই নেয়ামতপ্রাপ্ত বান্দা যাঁদের পথকে আল্লাহ্ তা'আলা 'সিরাতে মুস্তাকীম' নাম দিয়েছেন। এবং সেই পথের দিশা পাবার আরাধনা করার জন্য সকলের প্রতি নিজের পক্ষ থেকে শিক্ষা দিয়েছেন।

সূরা ফাতিহা ও হেদায়তের প্রার্থনা :

সকল মুসলমানদেরকে সূরা ফাতিহায় শিক্ষা দেওয়া হয়েছে এই প্রার্থনা করার জন্য:

ٱهْدِنَا ٱلصِّرَٰطَ ٱلْمُسْتَقِيمَ ﴿٥﴾ صِرَٰطَ ٱلَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ

–(হে আল্লাহ!) তুমি আমাদেরকে সঠিক পথে পরিচালিত কর, সেই সব লোকদের পথে, যাদের প্রতি তুমি অনুগ্রহ করেছ।[২]

اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ এই শব্দগুলো দিয়ে মহান আল্লাহ্র দরবারে মানুষের মনের ভেতর থেকে এই আরাধনাই ফুটে ওঠে, হে আলমীনের প্রতিপালক! তুমি আমাদের জানিয়ে দাও, আমাদের জীবনের মূল উদ্দেশ্য কী? আমাদের দায়িত্ব কী? আমাদের জীবনের অভীষ্ট কী? আমাদের জীবনের শেষ কোথায়? যা অর্জন করার জন্য আমরা জীবন লাভ করেছি আর আদিষ্ট হয়েছি।

মানুষের মাঝে যখন তার মূল অভীষ্ঠের বোধগম্যতা জাগ্রত হয় এবং জীবনের লক্ষ্য স্থির হয়ে তার সম্মুখে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে তখন বান্দার অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে আরাধনার সুর ফুটে ওঠে, 'হে সঠিক পথের দিশা দানকারী! তুমি আমাদেরকে সঠিক পথের দিশা দান করে মূল অভীষ্ঠে নিয়ে যাও।' কিন্তু

১. সূরাঃ নিসা, ৪:৬৯।
২. সূরাঃ ফাতিহা, ১: ৫-৬।

হেদায়ত বা পথের দিশার মূল উদ্দেশ্য এই দুইটি চাহিদা দিয়েই পূর্ণ হয় না। বরং এর জন্য প্রয়োজন সেই মঞ্জিল পর্যন্ত পৌঁছার বিশ্বস্ত জিম্মাদারিও যেন সুলভ হয়। কেননা, জীবনের এই দুর্গম সফর বড়ই বিপজ্জনক। অনেক অনেক অপশক্তি মানুষদেরকে সঠিক পথ থেকে সরিয়ে আনার কাজে সদা চেষ্টিত রয়েছে। শয়তানের সবচেয়ে বড় আক্রমণও হয়ে থাকে এই 'সেরাতে মুস্তাকীমে'রই উপর। পবিত্র কুরআন সাক্ষী, মহান আল্লাহ্‌র দরবারে ইবলিস শপথ করে বলেছিল :

لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ

–আমি অবশ্য অবশ্যই লোকদেরকে গোমরাহ্ করার জন্য তোমার 'সেরাতে মুস্তাকীমে' ওঁৎ পেতে বসে থাকব।[১]

তাই কেবল এতটুকু সম্ভব হতে পারে যে, মূল লক্ষ্য ও সঠিক পথের দিশা পেয়ে কেউ হয়ত সফরে বেরিয়ে পড়বে। কিন্তু পথিমধ্যেই আক্রান্ত হবে। এবং যথোপযুক্ত পাথেয় থাকা সত্ত্বেও মূল অভীষ্টে পৌঁছাতে পারবে না। তাই বান্দা আরাধনা করে থাকে, হে সাফল্য দানকারী! তুমি আমাকে অটলত্বের দৌলত দিয়ে ধন্য কর। যাতে আমি নির্ভরযোগ্যতার সাথে আমার মূল লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারি। এমন যেন কখনো না হয় যে, সঠিক পথে চলতে চলতে হঠাৎ পথহারা হয়ে যাই। আর পথের দিশা না পাই। তাই তুমি আমাকে সেই পথেই পরিচালিত কর, যে পথ নিরাপদ ও নিরুপদ্রব। যে পথে না থাকবে ডাকাতের ভয়, না থাকবে শয়তানের আক্রমণের উৎকণ্ঠা। যে পথে চললে নিশ্চিত অভীষ্টে পৌঁছার নির্ভরযোগ্যতা সৃষ্টি হয়।

অতএব, হেদায়তের মূল বিষয়বস্তু আর সেরাতে মুস্তাকীমের আসল অর্থ সুনির্ধারিত করার জন্য আল্লাহ্ তা'আলা পাশেই বলে দিয়েছেন :

صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ

–তাদের পথে, যাদের তুমি পুরস্কার দান করেছ।[২]

সেরাতে মুস্তাকীমের মর্মার্থ :

সেরাতে মুস্তাকীম কী? সে সম্পর্কে মহান আল্লাহ্ এরশাদ করেছেন, সেরাতে মুস্তাকীম হল আল্লাহ্‌র পুরস্কারপ্রাপ্ত বান্দাদেরই পথ। মহান আল্লাহ্ যদি ইচ্ছা

১. সূরা: আরাফ, ৭: ১৬।
২. সূরা: ফাতিহা, ১: ৬।

করতেন, লোকদের প্রার্থনা করার নিয়ম এরূপও শিখিয়ে দিতে পারতেন, হে আমার বান্দারা! তোমরা এভাবে প্রার্থনা করবে– 'হে আল্লাহ্! তুমি আমাদেরকে সঠিক পথের দিশা দাও। সেই সঠিক পথ যা তোমার কুরআনেরই পথ, সেই অহীরই পথ, যা তুমি আসমান থেকে নাযিল করেছ'। এতে তো কোনরূপ সন্দেহ নাই যে, হেদায়তের মূল উৎস তো কুরআন ও অহী। কিন্তু কেবল যদি এটিই বলা হয় যে, আল্লাহ্‌র কুরআন ও আল্লাহ্‌র অহী সঠিক পথ, তা হলে সেটি একটি নিরেট ভাবগত বস্তুই হয়ে যায়, বস্তুগত থাকে না। কেননা, কোন মতবাদ তখনই কার্যত রূপ পরিগ্রহ করতে পারে যখন সুনির্দিষ্ট রূপ দিয়ে সেটির কোন নমুনা পেশ করা সম্ভব হয়। আর সেই মতবাদ ও মতাদর্শ দ্বারা বিশ্ব-মানবতা তখন পর্যন্ত হেদায়ত প্রাপ্ত হতে পারবে না, যখন পর্যন্ত সেই মতবাদ ও মতাদর্শটি বস্তুগত কোন নমুনার আকারে চোখের সামনে না আসে। কেননা, মানুষ ভাবগত কোন বিষয়কে ভালভাবে বুঝতে পারে বস্তুগত উপমার মাধ্যমেই।

নবী-রাসূল প্রেরণের লক্ষ্য :

নবী-রাসূলদেরকে প্রেরণ করার লক্ষ্যও এই যে, হেদায়ত যেন বস্তুগত রূপে জনসমক্ষেই বিদ্যমান থাকে। আর বিশ্ব-মানবতা যেন সেই বস্তুগত নমুনাগুলো দেখে দেখে হেদায়ত অর্জন করে। কেবল আল্লাহ্‌র অহী ও আল্লাহ্‌র কালামের মাধ্যমে যদি মানব-মণ্ডলীকে হেদায়ত দান করার উদ্দেশ্য পূর্ণ হতে পারত, তবে আল্লাহ্ তা'আলা পৃথিবীতে কখনো নবী-রাসূল প্রেরণ করতেন না। বরং আল্লাহ্ সেই ব্যাপারেও সক্ষম ছিলেন যে, তিনি তাঁর হেদায়তের বাণীগুলো অহী ও ইলহামের আকারে সরাসরি মানুষে মানুষে পৌঁছে দিতেন।

মাওলানা আবদুল মাজেদ দরেয়া-আবাদী রাহমাতুল্লাহি আলাইহ উদাহরণ স্বরূপ একটি সুন্দর কথাই বলেছেন। তিনি বলেছেন, আল্লাহ্ তা'আলা সেই ব্যাপারেও ক্ষমতা রাখতেন যে, কেউ আজ ঘুম থেকে উঠতেই আল্লাহ্‌র কালাম, তাঁর হেদায়তের বাণী কাগজের আকারে তার শিয়রের পাশে পড়ে থাকা পেয়ে যেত। সেখানে লেখা থাকত, এটি আমার কালাম আর এটি আমার হুকুম। তুমি এটির উপর আমল কর। আল্লাহ্ তা'আলা কিন্তু এরূপ করেন নি। বরং তিনি কোটি কোটি মানুষকে হেদায়ত দেওয়ার জন্য একজন ব্যক্তিকে নমুনা স্বরূপ বানিয়েছেন। হেদায়তকে মানরূপী করে দিয়ে তিনি এরশাদ করেন:

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ

–নিঃসন্দেহে আল্লাহ্‌র রাসূলের পবিত্র সত্তার মাঝে রয়েছে তোমাদের জন্য উত্তম আদর্শ।[১]

মানবরূপী হেদায়ত দান করার রহস্য :

সাহাবায়ে কেরাম প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লামকে চোখে দেখেছেন, কানে শুনেছেন, তাঁর মজলিসে বসেছেন, তাঁর সাথে সফর করেছেন, বসবাস করেছেন, আচার-আচরণ লক্ষ্য করেছেন, বিভিন্ন বিষয় জিজ্ঞাসা করেছেন, জবাব পেয়েছেন। যেহেতু তাঁর সাথে সাহাবায়ে কেরামদের ব্যক্তিগত যোগাযোগ ছিল, সেহেতু হেদায়ত সশরীরি রূপে তাঁদের চোখের সামনে উদ্ভাসিত হয়ে উঠে আর বাস্তব নমুনা পেশ করার লক্ষ্য অর্জিত হয়।

নবী পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওফাতের পর তাঁর কর্মের বাস্তব নমুনাগুলো হাদিস ও সুন্নত নামে গ্রন্থাকারে সংরক্ষিত হয়ে যায়। তাঁর সর্বময় কর্মের বাস্তব নমুনা গ্রন্থরূপে আমাদের সামনে এসে গেলেও আমরা কিন্তু প্রিয় নবীর বাণীগুলো সরাসরি শোনার, তাঁর নূরানী দেহাবয়ব অবলোকন করার এবং তাঁর খেদমতে কসার সুযোগ থেকে বঞ্চিত। বলতে গেলে, নবী পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে দেখা-সাক্ষাৎ সহ তাঁর নিকট থেকে সরসরি উপকার ভোগ করার যেসব সুযোগ সাহাবায়ে কেরাম লাভ করেছেন, এখন সেই সুযোগ আমাদের নাই, কেয়ামত পর্যন্তও সেই সুযোগ কেউ পাবে না।

পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফ গ্রন্থাকারে আমাদের মাঝে বিদ্যমান। পবিত্র কুরআনের তাফসীরগুলোতে যেভাবে মতবৈষম্য পরিলক্ষিত হয়, অনুরূপভাবে হাদিস শরীফের মর্ম নিরিখেও মতবৈষম্য রয়েছে। মনে রাখতে হবে, এমন কোন মতবৈষম্য সাহাবায়ে কেরামগণের জীবদ্দশায় কখনো হয় নি। কেননা, তাঁরা সর্বদা নবী পাকের সাথেই অবস্থান করতেন। কখনো কারো মতবিরোধ হয়ে থাকলে সাথে সাথে নবী পাক থেকে জেনে নিয়ে সেই বিরোধ নিরসন করে নিতেন। কিন্তু এখন কারো যদি কুরআন-হাদিসের অর্থ নিরিখে এবং মর্ম বোধনের ক্ষেত্রে মতবিরোধ হয়ে যায়, বর্তমানে যেভাবে উম্মতদের মাঝে হচ্ছে, এবং প্রত্যেকেই এই দাবী করছে যে, তার বলা অর্থটিই সঠিক, অন্যের বলা অর্থটি ভুল– তবে এর ফায়সালা কীভাবে হতে পারবে? কাকে এই অথারিটি দেওয়া যাবে যে, বিচার করে দেবেন, এটি শুদ্ধ, এটি গলদ?

[১]. সূরা: আহযাব, ৩৩: ২১।

আসলে মূলতত্ত্ব কথা এই যে, হেদায়াতের মূল উৎসই হল কুরআন ও সুন্নাহ্। যার মর্মার্থ হল, ভিন্ন ভিন্ন ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণগুলোর (কুরআন-সুন্নাহ্) মধ্য থেকে সঠিক হবে কেবল একটিই এবং সেটিই হবে অনুসরণীয়। সেটিই নির্ধারিত হওয়া আবশ্য। এর জন্য একটি সুনির্দ্দিষ্ট নীতিমালা থাকা প্রয়োজন। যে নীতিমালার নিরিখে প্রতিপন্ন হওয়া মর্মই আসল মর্ম হিসাবে সাব্যস্ত হবে। অতএব, মহান আল্লাহ্ সেই নীতিমালা নির্ধারণ করে দিয়েছেন এই বলেই : صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ -'তাদের পথে পরিচালিত কর, যাদের আপনি অনুগ্রহ করেছেন'। অর্থাৎ, কোন্ মর্ম, ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণটি বিশুদ্ধ তা জানতে চাইলে নিজেদের মাঝে মতবিরোধ বাদ দিয়ে সেই বিষয়টিকে আমার সেসব বান্দাদের কর্ম দিয়ে বিচার করবে যাদের উপর আমার পক্ষ থেকে পুরস্কার আসে, যারা আমার গজব থেকে পরিত্রাণ পায় এবং যে-কোন ধরনের গোমরাহী থেকে মাহফুজ থাকে। কেননা, তাদের কর্ম ও কর্মপদ্ধতিই বিশুদ্ধ ও সঠিক। অতএব, যে মর্ম ও ব্যাখ্যা তাদের মর্ম ও ব্যাখ্যার সাথে মিলবে, সেটিকেই গ্রহণ করে নেবে, অন্যটিকে বাদ দিয়ে দেবে।

হেদায়ত ও গোমরাহী ঃ বিশ্ব-মানবতার নিরিখে :

মহান আল্লাহ্ হেদায়ত ও গোমরাহীকে মানুষদের সাথে নিরিখ করে দিয়েছেন। এভাবে যে, যাদের উপর আল্লাহ্‌র গজব এসেছে তারা গোমরাহীর শিকার, পক্ষান্তরে যাদের উপর আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে পুরস্কার এসেছে তারা হেদায়তের উপর প্রতিষ্ঠিত। পবিত্র কুরআন যেন এই শিক্ষাই দেয় যে, তোমরা যদি হেদায়ত অন্বেষা কর, সেটি তোমাদের জ্ঞান-বুদ্ধির পথ দিয়ে অর্জিত হবে না। কেননা, তোমরা যদি কুরআন-সুন্নাহ্‌র নির্দ্দিষ্ট কোন অর্থ মনের মধ্যে লালিত করে রাখ, আর বল যে, এটিই কুরআনের হেদায়ত আর এটিই নবীর হেদায়ত, অন্যগুলো ভুল –এটি হবে নিতান্তই জেদ। এ দ্বারা ফয়সালা হবে না। কেননা, এ ধরনের দাবী তো যে-কেউই করতে পারে। বরং গোমরাহ্ ব্যক্তিরা এই দাবীটিই তো করে থাকে।

অতএব, হেদায়ত অন্বেষীদের উদ্দেশ্যে মহান আল্লাহ্ পবিত্র কুরআনের মাধ্যমে এরশাদ করছেন, হে হেদায়তের পথ অন্বেষণকারী ব্যক্তিরা! আস, আমি তোমাদেরকে বলছি, হেদায়তের পথ কোন্‌টি। আমি কোটি কোটি মানুষের মাঝে আমার নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হেদায়তের উৎস-মূল রূপে প্রেরণ করেছি। তিনি আমার হেদায়তকে সরাসরি

সংগ্রহ করেন আর সেটিকে তিনি ব্যবহারিক পদ্ধতিতে আমার বান্দাদের সামনে পেশ করেন। অনুরূপ আমি তাঁরই ফয়য দ্বারা তাঁরই উম্মতদের মধ্য থেকে যুগে যুগে অনেককে হেদায়তের নমুনা বানিয়ে দিয়েছি, যাদের উপর আমার রহমত অবারিতভাবে পতিত হতে থাকে, যাদের কলব ও অন্তরে আমার পুরস্কারসমূহ বৃষ্টির ন্যায় প্রতিনিয়ত পড়তে থাকে। তারা সেই ব্যক্তিবর্গ যাদের অন্তরের সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত রয়েছে আমার মাহবুব (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এবং স্বয়ং আমার সাথে। তাদের জাহের ও বাতেন সম্পূর্ণরূপে হেদায়তপ্রাপ্ত। এরা হল পুরস্কারপ্রাপ্ত বান্দা। আর যদি কোথাও এ বিষয়ে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয় যে, আল্লাহ্ ও তদীয় রাসূল যে সত্য কথা বলেছেন, সেটি কোন্‌টি? এ ধরনের দ্বন্দ্বের ফয়সালা কখনো তোমরা নিজের জ্ঞান-বুদ্ধি দিয়ে করতে যাবে না। বরং দেখবে যে, আমার পুরস্কারপ্রাপ্ত বান্দারা কোন্ পথে চলেন। যে পথে তোমরা তাদের চলতে দেখবে, সেই পথই অবলম্বন করবে। সেই পথই হবে আমার রাসূলের (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম) পথ। আর সেই পথই হবে আমার হেদায়তের পথ।

পুরস্কারপ্রাপ্ত বান্দা কারা?

পবিত্র কুরআন যখন এই কথা বলে যে, যাদের উপর আল্লাহ্‌র পুরস্কার এসেছে তাদের পথই সঠিক পথ, তখন মনের মধ্যে প্রশ্ন সৃষ্টি হয় যে, আল্লাহ্‌র পুরস্কারপ্রাপ্ত বান্দা কারা? কেননা, যে-কোন মানুষই এই দাবী করতে পারে যে, সে-ই পুরস্কারপ্রাপ্ত। এই প্রশ্নেরই জবাবে আল্লাহ্ তা'আলা এরশাদ করছেন :

وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ فَأُوْلَٰٓئِكَ مَعَ ٱلَّذِينَ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ ٱلنَّبِيِّـۧنَ وَٱلصِّدِّيقِينَ وَٱلشُّهَدَآءِ وَٱلصَّٰلِحِينَ

–যেসব ব্যক্তি আল্লাহ্ ও রাসূলের আনুগত্য পোষণ করবে, তারা আল্লাহ্‌র পুরস্কারপ্রাপ্ত বান্দা নবী, সিদ্দীক, শহীদ ও সালিহ্‌দের সঙ্গ পাবে।[১]

এরশাদ করেছেন, আমার পুরস্কারপ্রাপ্ত বান্দাদের স্তর চারটি। প্রথম স্তর নবী-রাসূলগণের, দ্বিতীয় স্তর সিদ্দীকগণের, তৃতীয় স্তর শহীদগণের এবং চতুর্থ স্তর সালিহীনদের।

১. সূরা: নিসা, ৪: ৬৯।

হেদায়তের উৎসমূল কি কেবল নবী-রাসূলগণই?

কেউ কেউ মনে করে যে, হেদায়তের উৎসমূল কেবল নবী-রাসূলগণই। তাঁদের ব্যতীত উম্মতগণের মধ্য হতে অন্য কারো থেকে হেদায়ত গ্রহণ করা যাবে না। এই ধারণাটি ভুল। কেননা, হেদায়ত ও সেরাতে মুস্তাকীমের বাস্তব নমুনা যদি কেবল নবী-রাসূলগণকেই বানানো হয়ে থাকত, আর তাঁদের মাধ্যম ও ফয়যপ্রাপ্ত হয়ে পরবর্তী উম্মতগণের জন্য হেদায়ত যদি চলমান না থাকত, তা হলে আল্লাহ্‌র পুরস্কারপ্রাপ্ত বান্দাদের দলে কেবল নবী-রাসূলদের নামই উল্লেখ থাকার কথা ছিল। সে ক্ষেত্রে আল্লাহ্ তা'আলা কেবল এই কথা বলেই শেষ করে দিতেন যে, فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ অর্থাৎ, যাদের উপর আমার পুরস্কার এসেছে তারা হলেন কেবল নবী-রাসূল।[১] ব্যাপার যদি এমনই হত, তাহলে তো যারা নবীর জাহেরী জীবনের সময়কাল না পেত, সরাসরি নবীকে দেখতে না পেত, শুনতে না পেত, তাঁর মজলিসে বসে কিছু জিজ্ঞাসা করতে না পারত, তারা তো এই চাহিদাটির সম্মুখীন হত যে, এমন কোন মানুষরূপী নমুনা থাকা দরকার, যার কর্মের নমুনা তাদের মতাবৈষম্যের ফয়সালা হয়, যার কর্মের নমুনাগুলো দেখে তারা হক ও বাতিলের মধ্যে পার্থক্য করতে পারে। রাসূলের পরবর্তীতে রাসূলের সীরতকে সম্যক ও শুদ্ধরূপে জানার জন্যও কোন নমুনা থাকা দরকার। অতএব, মহান আল্লাহ্ তাঁরই হেদায়তের প্রতীক ও আদর্শ বানিয়েছেন নবী পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লামকে। আর রাসূলের হেদায়তের প্রতীক ও আদর্শ বানিয়েছেন সিদ্দীক, শহীদ ও সালিহীনদের। আর হেদায়তের এই ধারাটি তিনি কেয়ামত পর্যন্ত প্রবাহমান করে দিয়েছেন।

যে ব্যক্তি এই কথা বলবে যে, সে কেবল আল্লাহ্ ও রাসূলের কথাই মানবে, কুরআন-হাদিসের কথাই মানবে। এতদুভয় ব্যতীত অন্য কারো কথা মানবে না। সে ক্ষেত্রে জেনে রাখুন, যে ব্যক্তি সিদ্দীক, শহীদ, সালিহীন, আউলিয়ায়ে কেরাম, আয়িম্মায়ে এজাম, বুজুর্গানে দীন ও আসলাফগণের কথা মানবে না, সে ব্যক্তি সরাসরিই কুরআনের বিধানের বরখেলাফ ও বিরোধী হয়ে গেল। মূলত সে তো নিজের কথারই বিরোধিতা করেছে। সে তো কুরআনের কথাই মানল না। কেননা, পবিত্র কুরআন নবীগণের পরবর্তীতেও তিনটি স্তর নির্ধারণ করে দিয়েছেন। আর ওসব স্তরের লোকদেরকে আল্লাহ্‌র পুরস্কারপ্রাপ্ত বান্দা

১. আল কুরআন : সূরা নিসা, ৪:৬৯।

বলে ঘোষণা দিয়েছেন। তাঁদের যে কারো পথই প্রকৃত প্রস্তাবে আল্লাহ্‌র হেদায়তেরই পথ। এই সব পথই নবুয়তের পথ থেকেই উৎসরিত হয়েছে। সকলে নবুয়তের হেদায়তের আলো থেকেই আলো গ্রহণ করেছেন। সেখান থেকেই সকলের প্রদীপ প্রজ্জ্বলিত হয়েছে আর পরবর্তীতেও প্রদীপ থেকে প্রদীপ জ্বলতে থেকেছে। যতদিন পর্যন্ত মানব-গোষ্ঠী পৃথিবীর বুকে বিদ্যমান থাকবে, হেদায়তের প্রতীক ও আদর্শের এ সকল মানুষরূপী নমুনারা হেদায়তের প্রদীপ-বঞ্চিত মানবদেরকে পথ দেখাতে থাকবেন।

মহান চারটি নেয়ামত :

মাটি ও পানির এই পৃথিবীতে এবং আখিরাতেও মহান আল্লাহ্ তা'আলা আমাদেরকে লাখো-কোটি নেয়ামত দান করেছেন। নেয়ামতগুলো যখন সর্বশেষ চূড়ান্ত পূর্ণতায় পৌঁছে তখনই এই চারটি নেয়ামত নবুয়ত, সিদ্দীকিয়ত, শাহাদাত ও সালিহিয়াতে রূপ নেয়। আর এই চারটি নেয়ামতই মহান আল্লাহ্ তা'আলার গুরুত্বপূর্ণ ও মহান নেয়ামত। এই নেয়ামতগুলো আল্লাহ্ তা'আলার পুরস্কারপ্রাপ্ত চারটি স্তর নবীগণের স্তর, সিদ্দীকীনের স্তর, শহীদগণের স্তর এবং সালিহীনদের স্তরে দান করা হয়। সূরা নিসার উপরোক্ত আয়াত থেকে সেটিই প্রতীয়মান হয়।

প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সমস্ত গুণাবলিরই সমন্বিত রূপ :

এ কথা অবিসম্বাদিত যে, মহান আল্লাহ্ যত প্রকারের নেয়ামতই সারা দুনিয়ার সবাইকে দান করেছেন তত প্রকারের নেয়ামতগুলো তিনি প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের মহান সত্তার মাঝে সমন্বিত করে দিয়েছেন। নবী পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম সমস্ত নেয়ামতেরই সমন্বয়কারী। আল্লাহ্ তা'আলার কোন নেয়ামত এমন নাই যা থেকে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম বঞ্চিত রয়েছেন। ইউসুফের সৌন্দর্যই হোক, ঈসার ফুৎকারই হোক আর মূসার ইয়াদে বয়জাই হোক– সমস্ত পূর্ণতা ও সৌন্দর্য যা বিভিন্ন নবী-রাসূলগণের মাঝে বিচ্ছিন্ন রূপে পরিলক্ষিত হয়, সেসব পূর্ণতা ও সৌন্দর্যের সবগুলোই প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাঝে পূঞ্জীভূত করে দেওয়া হয়েছে। আর সমস্ত সৌন্দর্য ও পূর্ণতা যে কেবল তাঁর পবিত্র সত্তার মাঝেই পূঞ্জীভূত রয়েছে তা-ই নয়, বরং সেগুলো এমন রূপেই বিদ্যমান যে, কোন পূর্ণতা, কোন শ্রেষ্ঠত্ব এবং কোন সৌন্দর্যে তাঁকে কেউ কোন দিক থেকে অতিক্রম করতে পারেন না, যা তিনি লাভ করেছেন। কেউ খুব সুন্দরই বলেছেন:

حسن یوسف دم عیسی ید بیضاء داری
آنچہ خوبان ہمہ دارند تو تنہا داری

হুসনে ইউসুফ, দমে ঈসা, ইয়াদে বয়জা দারী
আঁচে খুবাঁ হামাহ্ দারন্দ তো তনহা দারী।

নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম : সমস্ত নেয়ামতরাজির পরিবন্টনকারী :

মহান আল্লাহ্ তা'আলা সমস্ত নেয়ামতরাজি নবী পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লামেরই মাধ্যমে বাদবাকি সৃষ্টিজগতের মাঝে পরিবন্টন করে থাকেন। সহীহ্ বোখারী শরীফে উল্লেখ রয়েছে, নবী পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করছেন :

إِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَخَازِنٌ وَاللهُ يُعْطِي.

–(নিঃসন্দেহে আল্লাহ্‌র সমস্ত নেয়ামতরাজি) আমিই বন্টন করি আর দান করেন আল্লাহ্।[১]

অতএব, যে কেউই আল্লাহ্‌র কোন নেয়ামত পেয়ে থাকে, সে তা নবী পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লামেরই নূরানী দরবার থেকেই পেয়ে থাকে। ইমাম শরফুদ্দীন বুসীরি রাহমাতুল্লাহি আলাইহ স্বীয় বিখ্যাত কসীদা বোর্দা শরীফে বলছেন :

وَكُلُّهُمْ مِنْ رَسُوْلِ اللهِ مُلْتَمِسٌ ○ غَرْفًا مِنَ الْبَحْرِ أَوْ رَشْفًا مِنَ الدِّيَمِ
فَإِنَّ مِنْ جُوْدِكَ الدُّنْيَا وَضَرَّتَهَا ○ وَمِنْ عُلُوْمِكَ عِلْمَ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ

–তাঁরা সবাই আল্লাহ্‌র রাসূলের কাছেই দরখাস্ত করে থাকেন। যেমন সমুদ্র থেকে এক গণ্ডুষ পানি আর মেঘ থেকে এক বিন্দু বৃষ্টি। সমগ্র দুনিয়া ও তাতে যা যা বিদ্যমান সব কিছু আপনার দানেরই বহিঃপ্রকাশ। আর লওহ ও কলমের সমস্ত এলম আপনার এলমেরই অংশ বিশেষ।

এয়া রাসূলাল্লাহ্! নবীগণের প্রত্যেকেই এবং বাকি দুনিয়ার সকল মানুষ নিজেদের আশা ও আরাধনার আবেদন নিয়ে আপনার চিরন্তন দান ও

[১]. সহীহ্ বোখারী, কিতাবুল ইল্‌ম।

বদান্যতার ভাণ্ডারের সম্মুখেই যেন ঠায় দাঁড়িয়ে আছেন। যে কেহই কিছু প্রাপ্ত হয়, তা সে আপনারই দরবার থেকে প্রাপ্ত হয়। নিঃসন্দেহে আপনার ভাণ্ডারে একদিকে যেমন দুনিয়ার নেয়ামতগুলো বিদ্যমান রয়েছে, অপর দিকে আখিরাতের নেয়ামতগুলোও। আর লওহ ও কলমের এলম আপনার এলমেরই একটি অংশ মাত্র।

নবীদেরকে নবুয়তের যে নেয়ামত, সিদ্দীকদেরকে সিদ্দীকিয়তের যে নেয়ামত, শহীদদেরকে শাহাদাতের যে নেয়ামত, সালিহীনদের সালিহিয়তের যে নেয়ামত মোটকথা, এই ইহজগতে বিশ্বস্রষ্টা মহান আল্লাহ্ তা'আলা যাকে যেই নেয়ামতই দান করেছেন তা তিনি তাঁর প্রিয় মাহবুব সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের বদান্যতা ও দানের ফয়জ থেকেই করেছেন।

যে-কোন নেয়ামত অর্জিত হয় মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামেরই মাধ্যমে :

মহান আল্লাহ্ তাঁর প্রিয় মাহবুব সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সমস্ত গুণাবলির সমন্বিত রূপ বানিয়েছেন। আর তাঁর সমস্ত নেয়ামতরাজি প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাঝেই পূঞ্জীভূত করে দিয়েছেন। এই নেয়ামতসমূহ তাঁকে এমন পরমভাবে দান করেছেন যে, দুনিয়ার কোন মানুষ বলতেই কোন দিক থেকেই কোন নেয়মতে আকায়ে দো জাহানের উপর শ্রেষ্ঠত্ব রাখে না।

আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, নবী-রাসূলগণও নেয়ামতপ্রাপ্ত হয়েছেন প্রিয় নবী থেকেই। কেননা, তিনি স্বয়ং নবুয়তের মর্যাদায় ধন্য। সিদ্দীকীনদেরও তাঁরই ফয়জ থেকে নেয়ামত অর্জিত হয়েছে। তিনি নিজেও সিদ্দীকিয়তের মর্যাদাপ্রাপ্ত। সালিহীনদের সালিহিয়তের নেয়ামত তাঁরই রহমতের দামান থেকে অর্জিত হয়েছে। কেননা, তাঁর পবিত্র সত্তাও সালিহিয়তের গুণে গুণান্বিত।

এখন প্রশ্ন হতে পারে, এ কথা যদি সত্য হয়ে থাকে যে, নবীদের নবুয়তি নেয়ামত নবী পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকেই অর্জিত হয়েছে, সিদ্দীকীনদের সিদ্দীকিয়তের নেয়ামত সিদ্দীকিয়তে-মোস্তফা থেকে মিলেছে আর সালিহীনদেরও সালিহিয়তের নেয়ামত অর্জিত হয়েছে সালিহিয়তে-মোস্তফা থেকেই, তা হলে শহীদরা কীভাবে তাঁর নিকট থেকে শাহাদাতের নেয়ামত লাভ করতে পারেন? কেননা, নবী পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তো বাহ্যিক দৃষ্টিতে শাহাদাতের নেয়ামতপ্রাপ্ত বলে পরিলক্ষিত হয় না। কারণ, তাঁর জাহেরী জীবনে শাহাদাত অর্জিত হয়নি।

শাহাদাতের গুণে গুণান্বিত হওয়া বাঞ্ছনীয় প্রিয় নবীর :

এ বিষয়টি সর্বজন স্বীকৃত যে, কেউ কোন বিষয়ে নবী পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর আংশিকভাবেও শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করতে পারে নি। কিন্তু একটি প্রশ্ন বাকি থেকে যায় যে, তিনি বাহ্যিক দৃষ্টিতে শাহাদাতপ্রাপ্ত ছিলেন না। অথচ সার্বিক ও সর্বতোভাবে তাঁর যে শ্রেষ্ঠত্ব থাকার কথা, সেই শ্রেষ্ঠত্বের দাবী হচ্ছে তাঁর জীবনে শাহাদাতের বৈশিষ্ট্য থাকা। তাও এমন রূপেই থাকা উচিৎ যে, দুনিয়ার অন্য কারো জীবনে যেমন রূপ শাহাদাত হয় নি বা হতে পারে না। প্রশ্নটির জবাব হচ্ছে, তাঁর মাঝে শাহাদাতের গুণ বিদ্যমান থাকা দুটি কারণেই বাঞ্ছণীয়।

প্রথম কারণ : নবী পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক শাহাদাতের গুণে গুণান্বিত হতে হওয়ার প্রথম কারণ হল, যেহেতু আল্লাহ্ তা'আলা হুজুর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সমগ্র নেয়ামতের সমন্বয়কারী এবং মানব-শ্রেষ্ঠ বানিয়েছেন। সেটির দাবী তো হল দুনিয়ার কোন মানুষ আল্লাহ্র নেয়ামতগুলোর কোন একটিতেও আংশিকভাবেও তাঁকে অতিক্রম করতে পারে না। আর তাঁর পবিত্র সত্তার মাঝে এসব নেয়ামত পূর্ণতা ও পরমত্ব সহকারে বিদ্যমান থাকে।

আমরা যদি এই কথা বলি যে, নাউযু বিল্লাহ্, নবী পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবন ছিল শাহাদাতশূণ্য, অর্থাৎ জাহেরী জিন্দেগীতে তাঁর শাহাদাত অর্জিত হয় নি, সে ক্ষেত্রে তো শাহাদাতের নেয়ামতপ্রাপ্ত হয়েছেন এমন সব নবী-রাসূল সহ সাধারণ মানুষও তাঁর উপর আংশিকভাবে হলেও শ্রেষ্ঠত্ব পেয়ে যায়। অথচ মহান আল্লাহ্ চান না যে, অন্য কোন মানুষ নবী পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের চাইতে আংশিক শ্রেষ্ঠত্বও নিয়ে যায় (যিনি হলেন সমগ্র নেয়ামতের কেন্দ্র ও উৎসমূল, সকল নেয়ামতের শুরু ও শেষ), এও চান না যে, তাদের কেউ এমন কোন শ্রেষ্ঠত্ব খোদার নিকট পেশ করে, যা থেকে নবী পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম বঞ্চিত। তাই আবশ্যক ছিল যে, নবী পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লামকেও শাহাদাতের নেয়ামত দ্বারা ধন্য করা। আর সেই শাহাদাতও এমন রূপ হতে হয়, যা শাহাদাতের পরম পূর্ণতা ও চরম পরাকাষ্ঠা।

দ্বিতীয় কারণ : নবী পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক শাহাদাতের গুণে গুণান্বিত হতে হওয়ার দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে, মানুষের কোন

কাজ যদি নবী-আদর্শের আনুগত্য-বিবর্জিত হয়ে থাকে, তাহলে সেই কাজটি নেকী হিসাবে পরিগণিত হতে পারে না। যথা, পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ তা'আলা এরশাদ করছেন :

مَّن يُطِعِ ٱلرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ ٱللَّهَ

–যে ব্যক্তি রাসূলের আনুগত্য করে, সে যেন আল্লাহ্রই আনুগত্য করল।[১]

অন্যত্র রয়েছে :

قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ ٱللَّهَ فَٱتَّبِعُونِى

–(হে মাহবুব!) আপনি বলে দিন, তোমরা যদি আল্লাহ্কে ভালবেসে থাক, তাহলে আমার আনুগত্য কর।[২]

আরেক জায়গায় উল্লেখ রয়েছে :

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِى رَسُولِ ٱللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ

–নিশ্চয় আল্লাহ্র রাসূলের মাঝে রয়েছে তোমাদের জন্য উত্তম আদর্শ।[৩]

নবী পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের মহান মোবারক সত্তাকে 'উত্তম আদর্শ' বলার মর্ম হল সেই আদর্শের নিগড়ে অর্থাৎ হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের তরিকায় যেসব আমল করা হবে সেসব আমল যেন নেক কাজ হিসাবে স্বীকৃতি পায়। যেমন ধরুন, আমরা আহার করি। এটি নেক আমল নহে। এটি দিয়ে বরং আমাদের প্রয়োজনই মিটাই। কিন্তু আমরা যদি এই আহারের কাজটি নবী পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের আমল মোতাবেক করি, তাহলে সেটি নেক আমল হয়ে যায়। আমরা ঘুমাই আমাদের দেহের প্রশান্তি ও আরামের জন্যই। কিন্তু অযু করে কেবলামুখি হয়ে যদি ঘুমাই, তাহলে সেই ঘুমটিও নেকী। কেননা, নবী পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম এভাবে ঘুমাতেন। আহার ও ঘুমানোর

১. সূরাঃ নিসা, ৪: ৮০।
২. সূরাঃ আলে ইমরান, ৩: ৩১।
৩. সূরাঃ আহ্যাব, ৩৩: ২১।

কাজ এ কারণেই নেকী হয়ে যায় যে, সেই কাজগুলোতে হুজুর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনুগত্য ও অনুসরণ পাওয়া যায়। কোন কাজই হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনুগত্য ব্যতীত নেকী হিসাবে পরিগণিত হতে পারে না। এ কথা যদি সঠিক হয়ে থাকে, তা হলে সেই পর্যন্ত আনুগত্য করা যাবে না, যদি সেই বিষয়টি স্বয়ং হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের মোবারক সত্তায় বিদ্যমান না থাকে আর সেই আমলটি হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে না করে থাকেন। সুতরাং শাহাদাতের ন্যায় আমলকে নেকী বলে ঘোষণা দেওয়া তখনই সম্ভব হবে, যদি আল্লাহ্র পথে জীবন উৎসর্গ করা আমরা নবী পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবন থেকে দেখতে পাই আর তাঁর পবিত্র সত্তা শাহাদাতের গুণে গুণান্বিত হয়। যেহেতু হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র সত্তায় বাহ্যদৃষ্টিতে শাহাদাত পরিলক্ষিত হয় না, সেহেতু শাহাদাতকে নেকী হিসাবে গণ্য না করাই বাঞ্ছনীয়। কিন্তু অন্য দিকে আমরা দেখতে পাই যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর পথে জীবন দান ও শাহাদাতকে নেকী বলে ঘোষণা করেছেন। তাই আবশ্যক হয়ে গেছে যে, হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুকাদ্দাস সত্তা শাহাদাতশূণ্য হতে পারে না। যদি তাই হয়, তাহলে শাহাদাতকে নেকী বলে ঘোষণা করা যায় না।

তাহলে এ কথা সাব্যস্ত হয়ে গেল যে, হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের রাহমতের দামান শাহাদাতের নেয়ামতশূণ্য নয় আর তাঁকে আল্লাহ্ তা'আলা শাহাদাতের নেয়ামতও দান করেছেন পরমত্ব ও পূর্ণতা সহকারে। কেননা, সৃষ্টিজগতের উপর তাঁর সার্বিক শ্রেষ্ঠত্বের দাবীও তা-ই। তা হলে আসুন, আমরা খতিয়ে দেখি, হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র সত্তাকে আল্লাহ্ তা'আলা শাহাদাতের নেয়ামত দ্বারা কী ভাবে ধন্য করেছেন?

আমলের দু'টি দিক ঃ মৌল রূপ ও ব্যবহারিক রূপ :

যে-কোন আমলের দু'টি দিকই রয়েছে।

১. আমলের জওহার ও রূহ্। এটি হল আমলের হাইয়াতে আসলিয়া বা মৌল রূপ।
২. আমলের বাহ্যিক রূপ ও আকার। এটি হল আমলের হাইয়াতে কাযায়িয়া বা ব্যবহারিক রূপ।

প্রথম রূপটি হল আমলটির অন্তর্নিহিত গোপন দিক। পক্ষান্তরে অপর রূপটি তার বাহ্যিক বা প্রকাশমান দিক। যেমন ধরুন, আমরা নামাজ পড়ি। এটি একটি আমল। এই নামাজের মৌলিক জওহার হল আল্লাহ্‌র স্মরণ করা। আর যেই রূপ, আকার, আকৃতি ও শর্তসমূহ পালনের মাধ্যমে আমরা নামাজ পড়ি সেগুলো হচ্ছে নামাজের হাইয়াতে কাযায়িয়া বা ব্যবহারিক রূপ। অতএব, যে-কোন আমলই তার রূহ বা মৌল রূপ এবং ব্যবহারিক রূপ –এই দুইটির সমন্বয়েই অস্তিত্ব লাভ করে থাকে।

শাহাদাতও একটি আমল। এই আমলটি শাহাদাতেরই একটি রূহ। অপর দিকে রয়েছে এর ব্যবহারিক রূপও। এটির একদিকে যেমন রয়েছে হাইয়াতে আসলী বা মৌল রূপ অপর দিকে রয়েছে হাইয়াতে কাযাঈ বা ব্যবহারিক রূপ। এখন আমরা সমীক্ষা চালিয়ে দেখব যে, শাহাদাতের হাইয়াতে আসলিয়া বা মৌল রূপটি কী? আর তার হাইয়াতে কাযায়িয়া বা ব্যবহারিক রূপই বা কোন্‌টি? শাহাদাতের রূহ্ কী? তার বাহ্যিক রূপ ও আকৃতি কী? আরও খতিয়ে দেখব যে, এই গুণটি হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনে বিদ্যমান ছিল কি না?

শাহাদাতের মৌল রূপ :

শাহাদাতের মৌল রূপ বা রূহ হচ্ছে আল্লাহ্‌র পথে জীবন উৎসর্গ করে দেওয়ার বাসনা। আর এর ব্যবহারিক রূপ হচ্ছে মৃত্যু সংঘটিত হওয়া। হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র সত্তায় শাহাদাতের আমলটি আছে কি না তা খতিয়ে দেখার জন্য সর্বপ্রথম আমাদের দেখতে হবে শাহাদাতের মৌল রূপ বা রূহটির দিকে। অর্থাৎ দেখতে হবে শাহাদাতের এই রূহটি এবং মৌলিক জওহারটি হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র সত্তায় বিদ্যমান ছিল কি না?

রহমতের নবীর মধ্যে শাহাদাতের রূহ ও জওহার বিদ্যমান ছিল :

শাহাদাতের রূহ্ হচ্ছে আল্লাহ্‌র পথে জীবনকে উৎসর্গ করার বাসনা। এই বাসনাটি হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র সত্তার মধ্যে পূর্ণ মাত্রায় এবং পূর্ণতা সহকারে বিদ্যমান ছিল। অনেক অনেক হাদিসই বিষয়টির প্রমাণ বহন করে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ্‌র পথে নিজের জীবন উৎসর্গ করে দেবার অদম্য বাসনা পোষণ করতেন।

হযরত আবু হোরায়রা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলছেন, আমি নবী পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এরশাদ করতে শুনেছি, যেই মহান সত্তার পবিত্র হাতে আমার জীবন, তাঁর নামে শপথ করে বলছি, মানুষেরা যদি উৎকণ্ঠিত না হয়ে পড়ত যে, আমি তাদের ছেড়ে জেহাদে চলে যাই আর আমার নিকট এমন সংখ্যক বাহন থাকত যে, সবাইকে সাথে করে নিয়ে যেতে পারি, তা হলে আমি সেসব দলের সাথেই বেরিয়ে পড়তাম যেগুলো আল্লাহ্‌র পথে জেহাদের জন্য গমন করে।

وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوَدِدْتُ أَنِّي أُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللهِ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلُ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلُ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلُ

–যাঁর হাতে আমার জীবন, তাঁর নামে শপথ করে বলছি, আমার অদম্য বাসনা যে, আল্লাহ্‌র পথে আমার মৃত্যু হয়। আবারো জীবিত করা হয়, আবারো মৃত্যু হয়। আবারো জীবিত করা হয়, আবারো মৃত্যু হয়। আবারো জীবিত করা হয়, আবারো মৃত্যু হয়।[১]

এতে করে বুঝা যায় না কি যে, হুজুর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে রাহে খোদায় জীবন উৎসর্গ করার অদম্য আগ্রহ ও বাসনা পূর্ণ মাত্রায় বিদ্যমান ছিল! আর তিনি চাইতেন না কি যে, মহান আল্লাহ্ তাঁকে যদি কোটি কোটি জীবনও দান করতেন, তবু প্রতি বারই তিনি তাঁর উদ্দেশ্যে সেই জীবনগুলো কুরবান করেই যাবেন। খোদার রাহে জীবন উৎসর্গ করার ধারা এমন ভাবে অব্যাহত থাকবে যে, কখনো নিঃশেষিত হবে না! শাহাদাতের মূল রূহ ও বাস্তব জওহার খোদার রাহে জীবন উৎসর্গ করার অদম্য বাসনারই নাম। শহীদ হওয়ার বাসনা যখন হুজুর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র সত্তার মাঝে বিদ্যমান পাওয়া গেল, এতে করে বুঝা গেল যে, শাহাদাত নামের আমলের মূল রূহটি নবী পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাঝে বিদ্যমান ছিল।

আমল নির্ভর করে নিয়তের উপর :

যে কোন আমল তার নিয়তের উপরই নির্ভরশীল। নিয়ত পাওয়া গেল, কিন্তু আমল পাওয়া যায় নি, তবু সেই নিয়তের সওয়াব মিলবে। যে-কোন আমলের সওয়াব আমলটির নিয়তের সাথেই সম্পৃক্ত। নিয়ত যেমনিরূপ হবে সওয়াবও

১. সহীহ্ বোখারী, ১ম খণ্ড, কিতাবুল জিহাদ, বাবু তামান্নিশ শাহাদাত।

মিলবে তেমনি রূপ। অতএব, কোন ব্যক্তির মৃত্যু যদি যুদ্ধের ময়দানে হয়, কিন্তু সেই ব্যক্তির মনে আল্লাহ্‌র রাহে জীবন কুরবান করার বাসনা না থাকে, বরং মরে গেলে শহীদ বলবে, বেঁচে গেলে গাজী বলবে, এ ধরনের সুনাম বা সুখ্যাতির লোভ থাকে, তাহলে তাকে শহীদ বলা যাবে না। তার কারণ হল, যদিও তার মৃত্যু যুদ্ধের ময়দানে কোন কাফিরেরই হাতেই হয়েছে, কিন্তু শাহাদাতের রূহটি বাসনা রূপে তার মাঝে বিদ্যমান ছিল না। তাই আল্লাহ্‌র নিকট তার এই মৃত্যুটি শাহাদাতের মৃত্যু হিসাবে স্বীকৃত হবে না। এর বিপরীতে সূরা নিসায় আল্লাহ্ তা'আলার ইরশাদ লক্ষ্য করা যায়:

وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً ۚ وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ

–যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র রাস্তায় বেরিয়ে পড়বে, সে পৃথিবীতে অনেক জায়গাও পাবে, স্থানও পাবে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি আপন ঘর-বাড়ি ত্যাগ দিয়ে আল্লাহ্ ও তদীয় রাসূলের প্রতি হিজরত করে, পরে তার মৃত্যু হয়, সেই ব্যক্তির প্রতিদান আল্লাহ্‌র যিম্মায় চলে গেল।[১]

যদিও আমল বাহ্যদৃষ্টিতে সম্পূর্ণ হয়নি, তবু আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে সেই আমলটির প্রতিদান সাব্যস্ত হচ্ছে। কেননা, সেই ব্যক্তিটি আমলটি পূর্ণ করার নিয়তেই ঘর থেকে বের হয়েছিল। তাই নবী পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন,

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ

–নিশ্চয় আমলের প্রতিদান নিয়তের উপরই নির্ভরশীল।[২]

অন্যত্র এরশাদ হচ্ছে:

إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى صُوَرِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ

–নিশ্চয় আল্লাহ্ তোমাদের রূপ ও ধন-সম্পদের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন না, বরং তিনি দেখেন তোমাদের অন্তর ও আমলের দিকেই।[১]

১. সূরা: নিসা, ৪: ১০০।
২. সহীহ্ বোখারী, কিতাবুল ওয়হী।

অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের ধন-সম্পদ ও গতরের রূপ দেখেন না, বরং তোমাদের অন্তর ও তোমাদের নিয়তের দিকেই দেখে থাকেন। তিনি দেখে থাকেন আমলটি তুমি কোন্ নিয়তকে সামনে রেখে করেছ।

অতএব, পবিত্র কুরআন ও উল্লিখিত হাদিস শরীফের আলোকে এই কথা সাব্যস্ত হয়ে গেল যে, শহীদ হওয়ার যে বসনাটি শাহাদাতের রূহ, সেটি অধিকহারে এবং অতিমাত্রায় নবী পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের মধ্যে বিদ্যমান ছিল। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, কেবল শাহাদাতের মৌল রূপ (শাহাদাতের বাসনা) পাওয়া গেলেই তো শাহাদাত বলা যাবে না, শাহাদাত তো তখনই বলা যাবে, যখন শাহাদাতের মৌল রূপের পাশাপাশি তার ব্যবহারিক রূপও পাওয়া যাবে। অতএব, শাহাদাতের হাইয়াতে কাযাইয়া বা শাহাদাতের ব্যবহারিক রূপও হুজুর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনে পাওয়া যেতে হবে।

শাহাদাতের ব্যবহারিকে রূপ :

আমল স্বরূপ আল্লাহ্‌র রাহে মৃত্যু সংঘটিত হওয়াই হল শাহাদাতের ব্যবহারিক রূপ। শাহাদাতের ব্যবহারিক রূপ আবার দুই প্রকারের। যথা,

১. শাহাদাতে সিররী বা গোপন শাহাদাত :

এটিকে গোপন শাহাদাত বা ছোট শাহাদাতও বলা হয়ে থাকে। যেমন, কারো পানিতে ডুবে মৃত্যু হওয়া কিংবা কারো বিষ পান করানোর কারণে মরে যাওয়া।

২. শাহাদাতে জিহুরী বা প্রকাশ্য শাহাদাত :

এটিকে প্রকাশ্য শাহাদাত কিংবা বড় শাহাদাতও বলা হয়ে থাকে। যেমন, কোন মুসলমান যুদ্ধের ময়দানে শত্রুর হাতে মরে গেল।

আমরা এবার শাহাদাতের ব্যবহারিক রূপের এই দুইটি প্রকার নবী পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র জীবনে খুঁজে দেখব।

আমলের শুরুর দিক ও শেষের দিক :

যে-কোন আমলেরই একটি শুরুর দিক থাকবে, আর থাকবে একটি শেষের দিক। শাহাদাত নামের আমলটিরও একটি শুরুর দিক রয়েছে। আর রয়েছে

১. সহীহ্ মুসলিম, কিতাবুল বিরর।

একটি শেষের দিক। প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র জীবনে গোপন শাহাদাতের শুরুর দিকটি যেমন বিদ্যমান রয়েছে, তেমনিরূপ প্রকাশ্য শাহাদাতের শুরুর দিকটিও লক্ষ্য করা যায়।

গোপন শাহাদাতের শুরুর দিক :

প্রিয় নবীর পবিত্র জীবনে গোপন শাহাদাতের শুরুর দিক বিদ্যমান রয়েছে। নিচের ঘটনাটি লক্ষ্য করুন।

খাইবরের যুদ্ধে যায়নব বিনতে হারেছ নামীয়া এক ইহুদী মহিলা হলাহল মিশ্রিত ছাগলের ভুনা গোশত প্রিয় নবীকে হাদিয়া দিয়েছিল। তিনি তা থেকে সামান্য খেয়ে নিয়েছিলেন। তখন সেই ভুনা গোশত হুজুরকে সংবাদ দিয়েছিল যে, তার মধ্যে হলাহল মেশানো আছে। তৎক্ষণাৎ তিনি আহার বন্ধ করে দিলেন। প্রিয় নবীর সাথে হযরত বশীর বিন বারা নামের তাঁর এক সাহাবীও বিষমাখা গোশত খেয়েছিলেন। তিনি ঘটনাস্থলেই বিষক্রিয়াজনিত কারণে শহীদ হয়ে যান।

প্রিয় নবীর হেফাজত আল্লাহ্‌রই যিম্মায় :

আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় হাবীবের হেফাজতের দায়িত্ব নিজের যিম্মাতেই নিয়ে নিয়েছেন। যেমন, খাইবরের যুদ্ধে বিষমিশ্রিত গোশত হযরত বশীর বিন বারা কেবল এক লোকমাই খেয়েছিলেন। তাতেই তাঁর মৃত্যু হয়েছিল। কিন্তু সেই বিষমেশানো গোশত খাওয়ার পরও প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম শহীদ হন নি। অবশ্য সেই বিষেরই প্রভাব ওফাতের সময়কাল পর্যন্ত প্রিয় নবীর রগ-রেশায় বিরাজিত ছিল। যেমন, হযরত আয়েশা সিদ্দীকা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা বলছেন, নবী পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর ওফাত-কালীন অসুস্থতার সময় এরশাদ করেছিলেন,

يَا عَائِشَةُ مَا أَزَالُ أَجِدُ أَلَمَ الطَّعَامِ الَّذِي أَكَلْتُ بِخَيْبَرَ وَهَذَا أَوَانُ وَجَدْتُ انْقِطَاعَ أَبْهَرِي مِنْ ذَلِكَ السَّمِّ،

–হে আয়েশা! খাইবারে বিষমেশানো যে খাবার আমি খেয়ে ফেলেছিলাম, সেই বিষের কষ্ট তো আমি সারা জীবনই ভোগ করেছি, কিন্তু এখন (এই অসুস্থতার সময়) তো মনে হয় যে, সেই বিষের প্রভাবে আমার শাহ্‌রগই ছিঁড়ে যাবে।[১]

[১]. মিশকাত, বাবু ওয়াফাতিন্নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া সাল্লাম।

বিষমিশ্রিত গোশত খাওয়া সত্ত্বেও প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের শাহাদাত সংঘটিত না হওয়ার কারণ এই ছিল যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর হাবীবের সাথে ওয়াদা করে রেখেছেন, وَاللهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ 'আর আল্লাহ্ আপনাকে মানুষ থেকে হেফাজতে রাখবেন।'[১]

প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওফাত কোন মানুষের হাতে সংঘটিত না হওয়া ছিল পবিত্র কুরআনের ওয়াদা। আর এই ওয়াদাটি এ কারণেই আবশ্যক ছিল যে, তাঁর ওফাত যদি বিষ বা তরবারির আকারে কাফির অথবা শত্রুর হাতে সংঘটিত হত, তাহলে তাঁর শাহাদাতের কারণে ইসলামের সাথে যাদের বিশ্বস্ততা এখনো পাকা-পোক্ত হয়ে ওঠে নি এমনসব নও-মুসলিমদের মনে এই ধারণা আসতে পারত যে, যে নবী মানুষের হাতেই মারা গেলেন, সেই নবীর দীনের কী দশা হবে! এই ভেবে তারা ইসলাম পরিহার করত। অনুরূপ প্রিয় নবীর ওফাত কেবল একজন মানুষের ওফাতই হয়ে থাকত না, বরং এতে করে ইসলামী আন্দোলনেরই অকালমৃত্যু হত। কাজেই ইসলামী আন্দোলনকে জীবিত রাখার জন্যই নবীকে জীবিত রাখতে হয়।

আমরা বাস্তবেও দেখতে পাচ্ছি যে, ওহুদ যুদ্ধে প্রিয় নবীকে শহীদ করে দেওয়া হয়েছে মর্মে প্রপাগাণ্ডা ছড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে সাহাবায়ে কেরামগণ সাহস হারিয়ে ফেলেছিলেন। ময়দান ছেড়ে দিয়েছিলেন। মনে মনে বলেছিলেন, একমাত্র যাঁকে অবলম্বন করেই আমরা আজ যুদ্ধের ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়েছি, তিনিই যখন আর নাই, লড়ে আর কী কাজ? কিন্তু আল্লাহ্‌র ইচ্ছা, ইসলামের আন্দোলনকে সফল করে তোলা, জীবিত রাখা। তাই প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনকে মানুষদের হাত থেকে হেফাজত করে রাখা হয়েছিল।

শাহাদাতে জিহ্‌রীর (প্রকাশ্য শাহাদাতের) শুরুর দিক :

শাহাদাতে সিররীর (গোপন শাহাদাতের) ন্যায় শাহাদাতে জিহ্‌রীর (প্রকাশ্য শাহাদাতের) শুরুর দিকটিও প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র জীবনে বিদ্যমান রয়েছে।

[১] সূরা: মায়িদা, ৪: ৬৭।

শাহাদাতে জিহ্‌রীর (প্রকাশ্য শাহাদাতের) চারটি শর্ত রয়েছে। যথা,

১. যুদ্ধের ময়দানে কাফিরের সশস্ত্র তেড়ে আসা।
২. আক্রান্ত হওয়া।
৩. কোন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ আহত হয়ে রক্ত বের হওয়া।
৪. প্রাণে মরে যাওয়া।

ওহুদ যুদ্ধে কাফিররা প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লামকে পাথর আর তীর দিয়ে হামলা করেছিল। পাথরের আঘাতে তাঁর একটি দাঁত মোবারকের কিছু অংশ শহীদ হয়ে গিয়েছিল। সে কারণে রক্ত বের হয়েছিল। শাহাদাতে জিহ্‌রীর (প্রকাশ্য শাহাদাতের) প্রথম তিনটি শর্ত পাওয়া গেল। চতুর্থ শর্তটির প্রপাগান্ডা ছড়ানো হয়েছিল। কিন্তু কোন অবস্থাতেই চতুর্থ শর্তটি বাস্তবায়িত হওয়ার মত ছিল না। কেননা, আল্লাহর ওয়াদা 'আমি আপনাকে মানুষ থেকে হেফাজতে রাখব' বাধা ছিল।

এখানে একটি বিষয় লক্ষ্যণীয় যে, দাঁত মোবারকের একটি অংশ বা প্রান্ত ভেঙে গিয়েছিল। সম্পূর্ণ দাঁত ভাঙে নি। তার কারণ এই যে, যদি সম্পূর্ণ দাঁতই ভেঙে যেত, তাহলে সে কারণে প্রিয় নবীর নূরানী চেহারার সৌন্দর্য কমে যেত। অথচ সেটি আল্লাহ্ তা'আলার নিকট শোভনীয় নয়। তাই দাঁতের কিনারা এমনভাবে পড়ে গিয়েছিল, যেভাবে পড়ে যায় জ্যোতি: ছড়ানো হীরার টুকরা! তাতে মূল হীরার ঔজ্জ্বল্যে স্বল্পতা আসে না, বরং আরো বৃদ্ধি পায়। অতএব, তাঁর অঙ্গ আহত হল। অথচ এমনভাবে যে, তা মোবারক অঙ্গটির সৌন্দর্যকে আরো বাড়িয়ে দিল।

সুতরাং, শাহাদাতে সিররী (গোপন শাহাদাত) ও জিহ্‌রী (প্রকাশ্য শাহাদাত) উভয়টির শুরুর দিকই প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র জীবনে বিদ্যমান দেখা যায়। কিন্তু শেষের দিকটি বিদ্যমান ছিল না। কেননা, প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওফাত ছিল স্বাভাবিক।

মৃত্যুর ধরণ বা রূপ:

মৃত্যু সংঘটিত হওয়ার তিনটি ধরণ বা রূপ রয়েছে। যথা,

১. স্বাভাবিক মৃত্যু। এটিকে শাহাদাতের মৃত্যু বলা যাবে না।
২. নিজে নিজে বিষ খেয়ে মারা যাওয়া। এটিও শাহাদাতের মৃত্যু নয়।
৩. অন্য কারো হাতে অত্যাচারের শিকার হয়ে মৃত্যু বরণ করা। এটি শাহাদাতের মৃত্যু।

প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের মৃত্যু স্বাভাবিকভাবে হয়েছিল। কারণ, তিনি নিজে নিজে মৃত্যু ঘটাতে পারেন না। কারণ, সেটি আত্মহত্যা হয়ে যায়। অন্য কারো হাতেও তাঁর মৃত্যু হওয়া সম্ভব ছিল না। কেননা, আল্লাহ্‌র ওয়াদা وَاللّٰهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ 'আল্লাহ্ আপনাকে মানুষ থেকে হেফাজতে রাখবে' বাধা ছিল। এখন এক দিকে আল্লাহর ওয়াদা হচ্ছে কোন কাফিরের আঘাতের শিকার হয়ে প্রিয় নবীর মৃত্যু না ঘটা, অন্য দিকে আল্লাহ্‌র ইচ্ছা হচ্ছে প্রিয় নবীর সত্তা শাহাদাতের গুণে গুণান্বিত হওয়া। কেননা, তিনি সর্বতোভাবে মানবকুলের মাঝে সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বগুণে গুণান্বিত।

কাজেই আবশ্যক হয়ে পড়ে যে, শাহাদাতের রূহ্ (শাহাদাতের মূল) গোপন শাহাদাত ও প্রকাশ্য শাহাদাতের শুরুর দিক প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের সত্তায় বিরাজিত থাকা। আর গোপন শাহাদাত ও প্রকাশ্য শাহাদাতের পূর্ণতা তাঁর পবিত্র দেহ মোবারকে সংঘটিত না হয়ে বরং এমন কোন দেহের উপর সংঘটিত হওয়া, যেই দেহের সাথে প্রিয় নবীর অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক থাকার ভিত্তিতে তাঁরই দেহে সংঘটিত হয়েছে বলে ধারণা করা যায়।

উভয় ধরনের শাহাদাতেরই চরম প্রকাশ :

যেহেতু শাহাদাত দুই ধরনের; গোপন শাহাদাত ও প্রকাশ্য শাহাদাত, সেহেতু আল্লাহ্ তা'আলা প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র জীবনে শাহাদাতের অধ্যায়টিকে পূর্ণ করার জন্য দুইজন ব্যক্তিকে নির্বাচন করেন। তাঁদের একজন হয়ে থাকবেন গোপন শাহাদাতের নিদর্শন। অর্থাৎ, বিষ খাওয়ানোর কারণে শহীদ হবেন। অপরজন হয়ে থাকবেন প্রকাশ্য শাহাদাতের মূর্তপ্রতীক। অর্থাৎ, নিঃস্ব অবস্থায় অত্যাচারের শিকার হয়ে দুশমনদের হাতে প্রকাশ্য দিবালোকে শহীদ হবেন।

এই দুইজন নির্বাচিত ব্যক্তির জন্য বাঞ্ছনীয় ছিল তাঁরা যেন প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঘনিষ্ট আপনজন হন। পর না হন। কেননা, অনাত্মীয় কারো মাধ্যমে যদি প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই গুণের প্রকাশ হয়, তাহলে প্রিয় নবীর উপর তাঁর এহসান হয়ে যায়। অথচ আল্লাহ্‌র কাছে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর অনাত্মীয়ের কোন এহসান সহনীয় নয়। তাই সেই দুইজন ব্যক্তিও প্রিয় নবীরই আপনজন হওয়া বাঞ্ছনীয়। এমন আত্মীয় যে, তাঁদের

দৈহিক আকার-আকৃতিতেও তাঁরই সাদৃশ্য থাকবে। অন্তর্নিহিত দিক থেকেও তাঁরা প্রিয় নবীর সাথে মিল রাখবেন।

অতএব, যেই গোপন শাহাদাত ও প্রকাশ্য শাহাদাতের শুরুর দিকের বিকাশ নবী পাকের জীবনে হয়েছিল সেই দুই ধরনের শাহাদাতের পূর্ণতা ও চরম বিকাশ ঘটানোর জন্য আল্লাহ্ তা'আলা দুই দুইজন শাহজাদাকে আগে থেকেই নির্বাচন করে রেখেছিলেন। তাঁদের একজন হযরত সাইয়েদুনা ইমাম হাসান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হু। যাঁকে নির্বাচন করা হয় গোপন শাহাদাতের জন্য। অপরজন হযরত সাইয়েদুনা ইমাম হোসাইন রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হু। যাঁকে নির্বাচন করা হয় প্রকাশ্য শাহাদাতের জন্য।

হাসনাইনে করীমাইনকে (হাসান-হোসাইনকে) নির্বাচিত করে রাখার কারণ:
গোপন শাহাদাত ও প্রকাশ্য শাহাদাতের পূর্ণ বিকাশ ঘটানোর জন্য আল্লাহ তা'আলা হাসনাইনে করীমাইনকে (হাসান-হোসাইনকে) এ কারণেই নির্বাচন করেছেন যে, এই দুইজনই ছিলেন নবী পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের একান্ত আপনজন। পর ছিলেন না। ছিলেন ভো দৌহিত্র, কিন্তু তিনি তাঁদেরকে কখনো দৌহিত্র (নাতি) বলে ডাকেন নি। বরং সর্বদা 'পুত্র' বলেই সম্বোধন করতেন। প্রিয় নবীরই রক্ত এই দুই শাহজাদার রগ-রেশায় মিলে মিশে একাকার ছিল। হাসান-হোসাইনকে প্রিয় নবীর পর হিসাবে কল্পনাও করা যায় না। উপরন্তু তাঁরা দু'জনই ছিলেন প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের অংশ। এবং তাঁরা দু'জনই ছিলেন প্রিয় নবীর সাদৃশ্য।

হাসান-হোসাইন (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা) ঃ রাসূলের অংশ বিশেষ:
হযরত হাসান ও হোসাইন রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হুমা উভয়ে হচ্ছেন এক দিকে 'ইবনে রাসূল' (নবী-পুত্র) অন্য দিকে 'জুয্য়ে রাসূল' (নবীর অংশ বিশেষ)। তাঁরা দু'জন যে নবীর অংশ বিশেষ সে কথা পবিত্র কুরআন থেকে সাব্যস্ত। পবিত্র কুরআনে এরশাদ হচ্ছে :

فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَآءَنَا وَأَبْنَآءَكُمْ وَنِسَآءَنَا وَنِسَآءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَل لَّعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَذِبِينَ

–(হে হাবীব! নজরানের পাদ্রীদের) বলুন, আসুন আমরা ডেকে নিয়ে আসি আমাদের পুত্রদেরকে আর আপনাদের পুত্রদেরকে, আমাদের স্ত্রীদেরকে আর আপনাদের স্ত্রীদেরকে, স্বয়ং আমাদেরকে আর আপনাদেরকে। অতঃপর একে অপরকে অভিশম্পাৎ দিই। মিথ্যুকদের উপর আল্লাহ্র অভিশাপ কামনা করি।[১]

আয়াতটি 'আয়াতে মুবাহালা' (অভিশাপ ডেকে আনার আয়াত) নামে প্রসিদ্ধ। আয়াতটি নাযিল হওয়ার পর প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাইয়েদা ফাতেমা যাহরা, হযরত আলী মুরতাযা, হযরত ইমাম হাসান ও হযরত ইমাম হোসাইনকে সাথে নিয়ে নজরানের পাদ্রীদের মোকাবেলায় অভিশাপ ডেকে আনার জন্য গিয়েছিলেন। তখন তিনি বলেছিলেন: اَللّٰهُمَّ هٰؤُلَاءِ أَهْلِيْ 'হে আল্লাহ্! এরাই আমার পরিবার-পরিজন'।[২]

অতএব, মুবাহালার উক্ত আয়াতটি থেকে সাব্যস্ত হয় যে, 'اَبْنَاءَنَا' (আমাদের পুত্রগণ) বলতে যা বুঝায় তা-ই ছিলেন হযরত হাসান ও হযরত হোসাইন। অর্থাৎ, এঁরা দুইজন প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের পুত্রবৎ ছিলেন।

পবিত্র কুরআনের ভাষ্য অনুযায়ী দৌহিত্রগণ পুত্রেরই সমপর্যায়ভুক্ত। এই কারণেই হযরত ঈসা আলাইহিস সালামকে 'বনী ইসরাঈল' গণ্য করা হয়। অর্থাৎ, তিনি হযরত এয়াকুব আলাইহিস সালামের পুত্র হিসাবে গণ্য হলেন। অথচ তাঁর কোন পিতা ছিল না। তাঁর মাতাজানের সম্পর্কের দিক থেকে তাঁকে বনী ইসরাঈলে গণ্য করা হয়। অনুরূপ প্রিয় নবী-তনয়া হযরত ফাতেমা যাহরার সম্পর্কের দিক থেকে হাসান-হোসানইও নবী-বংশেরই গৌরবোজ্জ্বল দুই রক্ষত্র হিসাবে মহান গৌরবের অধিকারী।

এই কথাটি হযরত উসামা বিন যায়দ রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হুর রেওয়ায়ত থেকে আরো পরিষ্কার হয়। তিনি প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লামকে স্বচক্ষে দেখেন যে, তিনি দুই শাহজাদা হযরত হাসান ও হযরত হোসাইনকে সাথে নিয়ে বসে বলেছিলেন:

هٰذَانِ ابْنَايَ وَابْنَا ابْنَتَيَ اللّٰهُمَّ إِنِّي أُحِبُّهُمَا فَأَحِبَّهُمَا وَأَحِبَّ مَنْ يُحِبُّهُمَا.

–এরা দুইজন আমার এবং আমার কন্যার পুত্র। হে আল্লাহ্! আমি তাদের ভালবাসি। তুমিও তাদের ভালবাসিও। তাদেরকেও ভালবাসিও যারা তাদের ভালবাসে।[৩]

---

১. সূরা: আলে ইমরান, ৩: ৬১।
২. সহীহ্ মুসলিম, কিতাবুল ফাযায়িল।
৩. তিরমিযী, আবওয়াবুল মানাকিব।

প্রিয় নবীর সাথে হযরত হাসান-হোসাইনের জাহেরী ও বাতেনী সাদৃশ্য :

হযরত হাসান ও হযরত হোসাইন রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হুমা প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে সাদৃশ্য রাখতেন। এই সাদৃশ্য কেবল জাহেরীভাবেই ছিল না, বরং বাতেনীভাবেও ছিল। জাহেরী সাদৃশ্যের কথা আমরা আমীরুল মুমিনীন হযরত আলী মুরতাদ্বা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হুর বর্ণিত এই হাদিসটি থেকেও পাই। তিনি বলছেন:

الْحَسَنُ أَشْبَهُ بِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا بَيْنَ الصَّدْرِ إِلَى الرَّأْسِ وَالْحُسَيْنُ أَشْبَهُ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا كَانَ أَسْفَلَ مِنْ ذَلِكَ.

–রাসূলুল্লাহ্‌র বক্ষ থেকে মস্তক পর্যন্ত বহুলাংশে সাদৃশ্য হাসানের। আর বক্ষ থেকে পা পর্যন্ত সর্বাধিক সাদৃশ্য হোসাইনের।[১]

রেওয়ায়তটিতে এও বলা হয়েছে যে, দুই শাহজাদাই প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের দৈহিক আকার-আকৃতিতে এত বেশি সাদৃশ্য রাখতেন যে, দুইজনকে যদি একত্র করা হত, তাহলে স্পষ্ট হয়ে যেত যে, দুই জনের মাঝে যেন প্রিয় নবীর পূর্ণ ছবি মূর্ত হয়ে আছে!

তাই, প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওফাতের পর সাহাবায়ে কেরাম রিদ্বওয়ানুল্লাহি তা'আলা আলাইহিম আজমাঈন যখন নবীকে এক নজর দেখার জন্য পাগলপারা হয়ে উঠতেন, তাঁদের চোখগুলো যখন নবীর নূরানী চেহারা দেখার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠত, তখন তাঁরা হযরত হাসান ও হযরত হোসাইন রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হুমাকে একত্র করে দেখে নিতেন। এভাবে দুই শাহজাদাকে এক সাথে দেখে প্রিয় নবীরই আপাদমস্তক দেখার সাধ মিটাতেন তাঁরা!

হযরত ওকবা বিন হারেছ রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হু বর্ণনা করছেন, হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হু একবার আসরের নামায শেষে বাইরে এসে কোথাও যাওয়ার জন্য রওয়ানা দিলেন। তাঁর সাথে হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হুও ছিলেন। পথিমধ্যে হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হু হযরত হাসান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হুকে দেখতে পেলেন তিনি বালকদের সাথে খেলা করছিলেন। তিনি তাঁকে নিজ কাঁধে চড়িয়ে নিলেন। আর বললেন:

[১]. তিরমিযী, আবওয়াবুল মানাকিব।

بِأَبِي شَبِيهٌ بِالنَّبِيِّ لَيْسَ شَبِيهًا بِعَلِيٍّ وَعَلِيٌّ يَضْحَكُ.

–আমার পিতা কুরবান হয়ে যাক! (এই হাসানের) প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে সমাধিক মিল। আলীর সাথে কম। হযরত আলী হাসছিলেন।[১]

হযরত আবু হুজাইফা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হু থেকে বর্ণিত:

رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ يُشْبِهُهُ.

–আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখেছি, হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হুর পুত্র হযরত হাসান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হুর সাথে তাঁর খুবই মিল ছিল।[২]

তিরমিযী শরীফেরই রেওয়ায়ত, হযরত আনস বিন মালেক রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হু বলছেন, আমি তখন ছিলাম ইবনে যিয়াদের নিকট। এমন সময় হযরত হোসাইন রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হুর শির মোবারক আনা হল। একটি ছোরা নিয়ে সে শিরটির নাকের উপর আঘাত করে করে বলছিল: 'এর মত সুন্দর মানুষ তো আমি আর কোথাও দেখি নি। এর আলোচনা হয় কেন?'

হযরত আনস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হু বলছেন:

أَمَا إِنَّهُ كَانَ مِنْ أَشْبَهِهِمْ بِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

–হযরত হোসাইন রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হু সেসব লোকদেরই একজন, যাদের সাথে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের সর্বাধিক মিল ছিল।[৩]

হযরত আনস বিন মালেক রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হু থেকেই বর্ণিত, তিনি বলেন:

لَمْ يَكُنْ أَحَدٌ أَشْبَهَ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ.

–আল্লাহ্‌র রাসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হুর পুত্র হযরত হাসান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হুর চাইতে অধিক মিল আর কারো ছিল না।

[১] মিশকাতুল মাসাবীহ্, কিতাবুল মানাকিব।
[২] সুনানে তিরমিযী, আল জিলদুস সানী, আবওয়াবুল মানাকিব।
[৩] সুনানে তিরমিযী, আল জিলদুস সানী, আবওয়াবুল মানাকিব।

وَقَالَ فِي الْحسن أَيْضًا: كَانَ أَشْبَهَهُمْ بِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

–হযরত আনস রাদিয়াল্লাহু আন্হু হযরত হোসাইন রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হু সম্পর্কেও বলেছেন, তিনিও রাসূলুল্লাহ্‌র সাথে সমধিক সাদৃশ্য রাখতেন।[১]

উল্লিখিত হাদিসাদি দ্বারা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, হযরত হাসান ও হযরত হোসাইন রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হুমা দুইজনই প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের জাহেরী ও বাতেনী উভয় ধরনের সাদৃশ্য লাভ করেছিলেন।

প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে বাতেনী মিল :

রাহমতুল্লিল আলামীন সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে হযরত হাসান-হোসাইনের কেবল জাহেরী সাদৃশ্যই ছিল না, বরং বাতেনী মিলও ছিল। হযরত হোযায়ফা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হু থেকে বর্ণিত, তিনি বলছেন, একদা আমার পিতা আমার নিকট জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'তুমি প্রিয় নবীর সাথে কখন সাক্ষাৎ করেছিলে?' আমি বলেছিলাম, 'তা অনেক দিনই তো হয়।' আমার এ কথা শুনে আমার পিতা অত্যন্ত দুঃখিত হলেন। আমি তাঁকে বললাম, 'যদি অনুমতি হয় তাঁর পেছনে আমি মাগরিবের নামাযটি পড়ি, আমার আর আপনার জন্য মাগফিরাতের সোয়াল করি।' অতএব, আমি প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে গিয়ে উপস্থিত হলাম। তাঁর পেছনে মাগরিবের নামায আদায় করলাম। এমনকি এশার নামাযও পড়লাম। এরপর তিনি মসজিদ থেকে বের হলেন। আমিও তাঁর পেছনে পেছনে চললাম। তিনি আমার চলার আওয়াজ শুনতে পেয়ে বললেন, 'কে? হোযায়ফা না কি?' আমি বললাম, 'জী হাঁ, এয়া রাসূলাল্লাহ্!' বললেন, 'কিছু বলবে না কি? আল্লাহ্ তোমাকে আর তোমার মাকে মাফ করে দিন!' অতঃপর বললেন, 'ইনি একজন ফেরেশতা, যিনি আজ রাতের পূর্বে কখনো পৃথিবীতে অবতরণ করেন নি। ইনি আল্লাহ্‌র কাছ থেকে অনুমতি নিয়েছেন আমাকে সালাম করার জন্য আর আমাকে এই সুসংবাদ দেবার জন্য যে,

فَاطِمَةَ سَيِّدَةُ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَأَنَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ سَيِّدَا شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ،

–(হযরত) ফাতিমা জান্নাতের সমস্ত রমণীগণের সর্দার। আর (হযরত) হাসান ও হোসাইন (উভয়ে) জান্নাতের যুবকগণের সর্দার।[২]

[১] মিশকাতুল মাসাবীহ্, আবওয়াবুল মানাকিব।

প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম উভয়জগতের সর্দার। তিনি হযরত হাসান ও হোসাইন রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হুমাকে জন্নতের যুবকদের সর্দার ঘোষণা দিলেন। এই বিষয়টি লক্ষ্যণীয় যে, জন্নতবাসী সবাই যুবকই হবেন। প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেমনিরূপ সর্বোপরি নেতৃত্বের অধিকারী তদ্রূপ হযরত হাসান-হোসাইনকেও সর্বোপরি নেতৃত্ব দান করা হয়েছে। তাঁরা দুইজনকে এই সর্বোপরি নেতৃত্ব দান করা প্রিয় নবীর সাথে তাঁদের রূহানী ও বাতেনী সাদৃশ্যেরই ইঙ্গিত বহন করে।

অনুরূপ প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করছেন:

إِنَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ هُمَا رَيْحَانَايَ مِنَ الدُّنْيَا،

–নিশ্চয় হাসান ও হোসাইন পৃথিবীতে আমার দুইটি ফুল।[২]

এ কথা সর্বজনবিদিত যে, ফুলের মাঝে যে রূপ ও সৌন্দর্য তা তার নিজস্ব নয়। এই রূপ ও সৌন্দর্য মূলত তার মূলেরই। এই দুইটি ফুল (হাসান ও হোসাইন) তাঁদের মূল নবী পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে একদিকে যেমন রূপ ও সৌন্দর্যের ফয়য অর্জন করেছেন, অন্যদিকে পূর্ণতার ফয়যও অর্জন করেছেন। হযরত হাসান-হোসাইনকে প্রিয় নবী কর্তৃক নিজের দুই ফুল ঘোষণা দেওয়া তাঁর সাথে তাঁদের রূহানী সাদৃশ্যের প্রতি ইঙ্গিত বহন করে।

প্রিয় নবীর সাথে হযরত হাসান-হোসাইনের রূহানী ও বাতেনী সাদৃশ্যের নমুনা এ থেকেও বুঝা যায় যে, একের ভালবাসা অন্যের ভালবাসা হয়ে যায়, একের বিদ্বেষ অন্যের বিদ্বেষ হয়ে যায়। তাঁদের সাথে ভালবাসা নবীর সাথে ভালবাসার রূপ নেয়, তাঁদের সাথে বিদ্বেষ নবীর সাথে বিদ্বেষের রূপ নেয়।

হযরত আবু হোরায়রা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হু থেকে বর্ণিত, নবী পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন:

مَنْ أَحَبَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ فَقَدْ أَحَبَّنِي وَمَنْ أَبْغَضَهُمَا فَقَدْ أَبْغَضَنِي،

–যে ব্যক্তি হাসান ও হোসাইনকে ভালবাসে, সে (প্রকৃত প্রস্তাবে) আমকে ভালবাসে। যে ব্যক্তি তাদের সাথে বিদ্বেষ রাখে, সে (প্রকৃত প্রস্তাবে) আমার সাথেই বিদ্বেষ রাখে।[১]

[১]. তিরমিযী, আবওয়াবুল মানাকিব।
[২]. মিশকাতুল মাসাবীহ্, কিতাবুল মানাকিব।

হযরত সালমান ফরেসী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলছেন:

مَنْ أَحَبَّهُمَا أَحَبَّنِي، وَمَنْ أَحَبَّنِي أَحَبَّهُ اللهُ، وَمَنْ أَحَبَّهُ اللهُ أَدْخَلَهُ الْجَنَّةَ، وَمَنْ أَبْغَضَهُمَا أَبْغَضَنِي، وَمَنْ أَبْغَضَنِي أَبْغَضَهُ اللهُ، وَمَنْ أَبْغَضَهُ اللهُ أَدْخَلَهُ النَّارَ،

–যে ব্যক্তি এই দুইজনকে ভালবাসে, সে আমাকে ভালবাসে। যে আমাকে ভালবাসে, সে আল্লাহ্‌কে ভালবাসে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌কে ভালবাসে, আল্লাহ্ তাকে জান্নাত দান করবেন। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি এই দুইজনের সাথে বিদ্বেষ রাখে, সে আমার সাথে বিদ্বেষ রাখে। যে ব্যক্তি আমার সাথে বিদ্বেষ রাখে, সে আল্লাহ্‌র সাথে বিদ্বেষ রাখে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র সাথে বিদ্বেষ রাখে, আল্লাহ্ তাকে জাহান্নামে দেবেন।[২]

হযরত ইমাম হাসান এবং হযরত ইমাম হোসাইন রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা দুইজনই নবী পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাতেনী সাদৃশ্যের প্রতিচ্ছবি ছিলেন। এটির প্রমাণ এর চেয়ে আর কী হতে পারে যে, প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বয়ং এরশাদ করছেন:

حُسَيْنٌ مِنِّي وَأَنَا مِنْ حُسَيْنٍ أَحَبَّ اللهُ مَنْ أَحَبَّ حُسَيْنًا،

–হোসাইন আমা হতে আর আমি হোসাইন হতে। যে ব্যক্তি হোসাইনকে ভালবাসে, তাকে আল্লাহ্ ভালবাসেন।[৩]

'আনা মিন হোসাইন' (আমি হোসাইন হতে) -এর মর্ম :

প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের 'হোসাইন আমা হতে' উক্তিটি তো পরিষ্কার বুঝে আসে। কেননা, হোসাইন তো বাস্তবেই রাসূল থেকেই। কারণ, তিনি তাঁরই পুত্র তথা দৌহিত্র। তিনি হলেন 'মূল' আর হোসাইন হচ্ছেন 'অংশ'। অংশ তো মুল থেকেই হয়ে থাকে। কিন্তু 'আনা মিন হোসাইন' বা আমি হোসাইন হতে এই কথাটি কীভাবে বুঝে আসবে? কেননা, অংশ তো মূল থেকেই হয়। কিন্তু মূল কীভাবে অংশ থেকে হতে পারে? পুত্র তো পিতা থেকেই হবে। নাতি তো হবে নানা থেকেই। কিন্তু পিতা তো কখনো পুত্র থেকে আর নানা তো কখনো নাতি থেকে হতে পারে না!

১. সুনানে ইবনে মাজাহ্, আল মুকাদ্দামা, ফযলুল হাসানে ওয়াল হোসাইন ইবনাই আলী ইবনে আবি তালিব।
২. আল মুসতাদরিক লিল হাকিম, আল জিলদুস সালিস, ১৬৬।
৩. সুনানে তিরমিযী, আল জিলদুস সানী, আবওয়াবুল মানাকিব।

একটু ভেবে দেখলেই হাদিসটির অর্থ বুঝে আসে। 'হোসাইন আমা হতে' এই উক্তিটি দ্বারা প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই দিকেই ইঙ্গিত করছেন যে, হোসাইন নামের ব্যক্তিসত্তা এবং তাঁর মাঝে জাহেরী ও বাতেনীভাবে যত প্রকারের রূপ ও সৌন্দর্যই বিদ্যমান রয়েছে, সবকিছু তিনি রাসূলের মাধ্যমেই প্রাপ্ত হয়েছেন। পক্ষান্তরে 'আমি হোসাইন থেকে' এই উক্তিটি দ্বারা তিনি ইঙ্গিত করেন যে, তাঁর সকল ফযীলত ও পূর্ণতার একটি বিকাশ হোসাইনের মাধ্যমেই ঘটবে। তাঁর শাহাদাত-জনিত ফযীলত ও পূর্ণতার পূর্ণাঙ্গ বিকাশ ঘটবে হোসাইনের মধ্য দিয়েই।

যেহেতু খাইবরের যুদ্ধের সময়কালে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের যে গোপন শাহাদাতটি সূচিত হয়েছিল, সেটি পূর্ণতা লাভ করেছিল হযরত ইমাম হাসানকে বিষ পান করানোর মধ্য দিয়ে। যে কারণে তাঁর অন্ত্র থেকে বের হয়ে পড়েছিল সত্তরটি টুকরা। আর খাইবারের যুদ্ধের সময় প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের যে প্রকাশ্য শাহাদাতটি সংঘঠিত হয়েছিল, সেটির পূর্ণতা লাভ করেছিল কারবালার ময়দানে হযরত ইমাম হোসাইন রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর শাহাদাতের মধ্য দিয়ে।

ইমাম হোসাইনের শাহাদাত ঃ প্রিয় নবীর শাহাদাতের জওহারের পূর্ণ বিকাশ :

হযরত ইমাম হাসান ও হযরত ইমাম হোসাইন উভয়ের শাহাদাতই ছিল প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের শাহাদাতের জওহারেরই পূর্ণ বিকাশ। বাহ্যিকদৃষ্টিতে তো হাসান-হোসাইনের শাহাদাত প্রিয় নবীর শাহাদাতেরই পূর্ণ বিকাশ হিসাবে বুঝে আসে না, কিন্তু একটি উদাহরণের মাধ্যমে তা পুরোপুরি পরিষ্কার হয়ে যায়।

ধরুন, কোন বৃক্ষের দুইটি শাখায় ফল ধরল। বাহ্যিক চোখে যারা দেখে তারা বলবে, এ ফল শাখারই। কিন্তু বাস্তবে ফলগুলো শাখার নয়, বৃক্ষেরই। বৃক্ষটি শাখার বা ডালের রূপেই বিস্তার লাভ করে আছে। অনুরূপ রাহমতে দো-আলম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম হলেন নবুয়তের এক পূর্ণাঙ্গ বৃক্ষ। সেই বৃক্ষেরই একটি শাখা হযরত ইমাম হাসান এবং অপর শাখা হযরত ইমাম হোসাইন রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা। হযরত ইমাম হাসানের শাখায় ফল ধরেছে গোপন শাহাদাতের। আর হযরত ইমাম হোসাইনের শাখায় ধরেছে প্রকাশ্য শাহাদাতের ফল। বাহ্যিক চোখ দিয়ে যারা দেখে তারা বুঝে যে,

গোপন শাহাদাত হযরত ইমাম হাসানের এবং প্রকাশ্য শাহাদাত হযরত ইমাম হোসাইনের। কিন্তু বাস্তবতা এই যে, হযরত ইমাম হাসানের গোপন শাহাদাত প্রিয় নবীর গোপন শাহাদাতের আর হযরত ইমাম হোসাইনের প্রকাশ্য শাহাদাত নবী করীমের প্রকাশ্য শাহাদাতেরই পূর্ণ বিকাশ। দুই শাখার কোন ফলই ইমাম হাসান ও হোসাইনের ফল নয়; বরং মোস্তফা-বৃক্ষেরই ফল।

প্রিয় নবীর পুত্র সন্তান না থাকার রহস্য :

হযরত ইমাম হাসান ও হযরত ইমাম হোসাইনের শাহাদাতকে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের শাহাদাতের জওহারের বিকাশ হিসাবে ঘোষণা দেওয়া আপেক্ষিক ও মনগড়া কোন উক্তি নয়; বরং প্রথম থেকেই আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় এই বিষয়টি প্রতিপন্ন ছিল যে, প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের গোপন ও প্রকাশ্য শাহাদাতের পূর্ণ বিকাশ হযরত হাসান ও হোসাইনকে দিয়েই হবে।

প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের গোপন শাহাদাত ও প্রকাশ্য শাহাদাত কোনটিরই জওহারের বিকাশ তাঁর সত্তায় সংঘটিত হতে পারত না। কেননা, তাতে বাধা ছিল আল্লাহ্‌র বাণী وَاللهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ 'আল্লাহ্ আপনাকে মানুষ থেকে হেফাজতে রাখবেন'। সুতরাং, এই জওহারটির বিকাশের দুইটি রূপ হতে পারে। প্রথম রূপ, তাঁর পুত্র সন্তান বিদ্যমান থাকা, যাঁর উপর সেই জওহারটি বিকাশ লাভ করা যায়। কিন্তু তাও সম্ভব ছিল না। কেননা, তিনি তো 'খাতামুন নবিয়ীন', আখেরী নবী। পবিত্র কুরআনে এরশাদ হচ্ছে:

مَّا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَآ أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّـۧنَ

–মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তোমাদের মধ্য হতে কোন পুরুষের পিতা নহেন। তিনি হচ্ছেন আল্লাহ্‌র রাসূল এবং সর্বশেষ নবী।[১]

তাই তো, প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের পুত্র সন্তান শিশু কালেই তিরোহিত হয়ে যান। কেননা, তাঁর 'আখেরী নবী' হওয়ার এবং সকল নবী-রাসূলগণের উপর তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠিত হওয়ার দাবীই তো হচ্ছে তাঁর

[১] সূরা: আহযাব, ৩৩: ৪০।

প্রাপ্ত-বয়স্ক কোন পুরুষ সান্তান বিদ্যমান না থাকা। সে কারণেই তো, পূর্বতন নবীগণ নিজেরাও নবী হতেন এবং তাঁদের সন্তানরাও নবী হতেন। এ ছিল নবী পাকের অন্যমত ফযিলত যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে প্রাপ্ত-বয়স্ক কোন পুরুষ সন্তানের পিতা করেন নি। কেননা, তাঁর পুত্র যদি প্রাপ্ত-বয়স্ক হতেন আর নবী না হতেন, তাহলে প্রিয় নবীর ফযিলত কমে যেত। পক্ষান্তরে পুত্র যদি প্রাপ্ত-বয়স্ক হতেন এবং নবীও হতেন, তাহলে তিনি তো 'আখেরী নবী' হওয়ার মর্যাদা হারাতেন!

প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের শাহাদাতের জওহারের বিকাশ ঘটানোর আরেকটি রূপ এ হতে পারত যে, তাঁর গোপন ও প্রকাশ্য শাহাদাতের বিকাশ এমন কোন দেহের উপর ঘটানো হত, যাঁর সাথে তাঁর সুদৃঢ় সম্পর্ক থাকার ভিত্তিতে সেই দেহে সংঘটিত হওয়া আমলটি প্রিয় নবীর দেহেই সংঘটিত হয়েছে বলে ধরে নেওয়া যায়। অতএব, সেই লক্ষ্যেই মহান আল্লাহ্ তা'আলা হযরত হাসান ও হযরত হোসাইনকে নির্বাচন করে রেখেছিলেন। তাঁরা দুইজন প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের কেবল 'অংশ' হওয়ার মর্যাদাই রাখেন না, বরং তাঁদের জাহের ও বাতেনও প্রিয় নবীর সাথে পূর্ণাঙ্গ রূপে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল।

'হাসান' ও 'হোসাইন' নাম রাখার কারণ :

হযরত হাসান ও হোসাই নাম দুইটি তাঁদের পিতা-মাতার রাখা নাম নয়; এই নাম দুইটি রেখেছিলেন স্বয়ং প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লামই। হযরত আলী কাররামাল্লাহু তা'আলা ওয়াজ্‌হাহু বলছেন,

لَمَّا وُلِدَ الْحَسَنُ سَمَّيْتُهُ حَرْبًا، فَجَاءَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: أَرُونِي ابْنِي، مَا سَمَّيْتُمُوهُ؟ قَالَ: قُلْتُ: حَرْبًا. قَالَ: بَلْ هُوَ حَسَنٌ فَلَمَّا وُلِدَ الْحُسَيْنُ سَمَّيْتُهُ حَرْبًا، فَجَاءَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: أَرُونِي ابْنِي، مَا سَمَّيْتُمُوهُ؟ قَالَ: قُلْتُ حَرْبًا. قَالَ: بَلْ هُوَ حُسَيْنٌ،

–(হযরত) হাসানের জন্ম হলে আমি তার নাম রেখেছিলাম 'হারব'। আল্লাহ্‌র রাসূল এসে বললেন, 'আমাকে আমার পুত্রটি দেখাও। তোমরা তার কী নাম রেখেছ?' হযরত আলী বলছেন, আমি বললাম, 'হারব'। তিনি বললেন, 'না, এর নাম 'হাসান'।' এর পর যখন

হোসাইনের জন্ম হল, আমি তার নাম রাখলাম 'হারব'। আল্লাহ্‌র রাসূল আগমন করলেন। বললেন, 'আমাকে আমার পুত্রটি দেখাও। তোমরা তার কী নাম রেখেছ?' হযরত আলী বলছেন, 'আমি বললাম, হারব'। তিনি বললেন, 'না, এর নাম 'হোসাইন'।[১]

অতঃপর তৃতীয় পুত্রটির জন্ম হলে আমি তার নাম রাখলাম 'হারব'। নবী পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম আগমন করলেন। বললেন, 'আমাকে আমার পুত্রটি দেখাও। তোমরা তার কী নাম রেখেছ?' হযরত আলী বলছেন, 'আমি বললাম, হারব'।' তিনি বললেন, 'না, এর নাম হবে 'মুহসিন'। অতঃপর নবী পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'আমি তাদের নাম রাখলাম হযরত হারূন আলাইহিস সালামের সন্তান শব্বর, শব্বীর ও মুশাব্বিরের নাম অনুসারে।'

প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুই শাহজাদার নাম বদলিয়ে 'হাসান' আর 'হোসাইন'ই কেন রাখলেন? এ এমন একটি প্রশ্ন যার উত্তর বাহ্যিকভাবে বুঝা যায় না, কিন্তু একটু ভেবে দেখলেই বুঝে আসে যে, পূর্বের দেওয়া নাম বদলিয়ে 'হাসান' আর 'হোসাইন' করে দেওয়ার মাঝে বিশেষ এক রহস্য নিহিত ছিল। রহস্যটি হল, 'হাসান' ও 'হোসাইন' নাম দুইটিতে 'হুস্না' শব্দটি সমভাবে অংশীদার। 'হুস্না' অর্থ সৌন্দর্য। 'হুসনা' শব্দের মূল অক্ষরগুলো 'হাসান' ও 'হোসাইন' উভয়টিতেই বিদ্যমান। কিছু কিছু অভিধানে 'হুস্না' শব্দের অর্থ লেখা হয়েছে: اَلشَّهَادَةُ لِاَنَّهَا حَسَنَةُ الْعَوَاقِبِ (المنجد) 'হুস্না বলা হয় শাহাদাতকে। কেননা, শাহাদাত হল সুন্দর এক পরিণাম'।[২]

প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম পয়গাম্বরি দৃষ্টিশক্তি দিয়ে এবং আল্লাহ্-প্রদত্ত জ্ঞানবলে জানতেন যে, হাসান তাঁর গোপন শাহাদাতের বিকাশ ঘটানোর জন্যই জন্ম নিয়েছেন। আর হোসাইন জন্ম নিয়েছেন তাঁর প্রকাশ্য শাহাদাতের বিকাশ সাধনের জন্য। তাই হযরত ইমাম হাসানের নাম শব্বর রাখার স্থলে হাসান রাখলেন। যাতে করে, শহীদ হওয়ার সুন্দর পরিণামটি তাঁর নাম দ্বারাও প্রতিপন্ন হয়ে যায়। আর অপরজনের নাম রাখেন হোসাইন। যাতে করে, এই নামটি প্রকাশ্য শাহাদাতের চরম বিকাশের প্রতি

[১]. মুসনাদে ইমাম আহমদ বিন হাম্বল, ১: ৯৮।
[২]. আল মুনজিদ;

ইঙ্গিত বহন করে। বলা যেতে পারে, প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম উভয় শাহজাদার নাম বদলিয়ে মহান আল্লাহ্‌র সেই শাশ্বত অভিপ্রায়ের দিকেই ইঙ্গিত করেছিলেন যে, উভয় শাহজাদার ললাটেই নিহিত রয়েছে শাহাদাতের মহান সৌভাগ্য।

কিছু সূক্ষ্ম বিষয় :

দুই শাহজাদার নাম হাসান ও হোসাইন রাখা থেকে কিছু গুরুত্বপূর্ণ সূক্ষ্ম দিক ও সূক্ষ্ম বিষয় বোধগম্য হয়। যেমন,

১. হযরত হাসানের শাহাদাত ছিল গোপন শাহাদাত। পক্ষান্তরে হযরত হোসাইনের শাহাদাত ছিল প্রকাশ্য। ইমাম হাসানের শাহাদাত যেহেতু গোপনেই ঘটেছিল, তাই সেই শাহাদাতের আলোচনাও আজ পর্যন্ত গোপনভাবেই চলছে। পক্ষান্তরে ইমাম হোসাইনের শাহাদাত যেহেতু প্রকাশ্য ছিল, আর প্রকাশ্য শাহাদাতের দাবীও যেহেতু প্রকাশমান হওয়া, তাই সেই শাহাদাতের আলোচনাও বিশ্বের সর্বত্র আজও প্রকাশ্যেই চলছে।

২. আরবি ভাষার একটি নিয়ম হচ্ছে, যে শব্দের বানানে অক্ষর বেশি, সেটি অর্থের আধিক্যের দিক থেকেও বেশি। পক্ষান্তরে যে শব্দের বানানে অক্ষর কম, সেটি অর্থেরও স্বল্পতার প্রতি ইঙ্গিত করে। আরবি حَسَنٌ 'হাসান' শব্দটিতে রয়েছে তিনটি অক্ষর এবং حُسَيْنٌ 'হোসাইন' শব্দটিতে চারটি। যেহেতু জৈষ্ঠ্য দৌহিত্র থেকে এমন শাহাদাত প্রকাশ পাওয়াই প্রতিপন্ন ছিল যা অর্থের দিক থেকে ছোট ছিল। তাই জৈষ্ঠ্য দৌহিত্রের নাম রাখা হয় হাসান। এতে অক্ষর তিনটি। পক্ষান্তরে কনিষ্ঠ দৌহিত্র থেকে যেহেতু এমন শাহাদাত প্রকাশ পাওয়া প্রতিপন্ন ছিল যা অর্থের দিক থেকে বড়। তাই কনিষ্ঠ দৌহিত্রের নাম রাখা হয় হোসাইন। এতে অক্ষর চারটি। 'হাসান' আর 'হোসাইন' নাম দুইখানি অক্ষরের কম-বেশির দিক থেকেই ইঙ্গিত প্রদান করছে, তাঁদের কার দ্বারা কোন্ ধরনের শাহাদাত সংঘটিত হবে!

৩. হযরত ইমাম হাসান জন্ম নিলে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর নাম শব্বর না রেখে হাসান রাখলেন। আর যখন ইমাম হোসাইনের জন্ম হল, তাঁর নাম শিব্বীর না রেখে হোসাইন রাখলেন। আরবি নিয়ম অনুযায়ী হোসাইনে 'ইয়া' অক্ষরটি তছগীরের জন্যই

ব্যবহৃত। এই হোসাইন নামটি তিনি প্রথম পুত্রের বেলায় রাখেন নি। কারণ, তিনি জানতেন যে, তাঁর এই পুত্রটি দিয়ে তাঁর শাহাদাতের একটি দিক পূর্ণ হবে। তাঁর পরে তাঁরই এক কনিষ্ঠ ভ্রাতা জন্ম নেবেন। যাঁকে দিয়ে তাঁর শাহাদাতের আর একটি দিক পূর্ণ হবে। তাই তিনি জৈষ্ঠ্য পুত্রের নাম রাখলেন হাসান আর কনিষ্ঠের নাম রাখলেন হোসাইন।

উক্ত আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, হযরত ইমাম হোসাইনের শাহাদাত মূলত প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবন-চরিতেরই একটি অধ্যায়। যা وَاللّٰهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ 'আল্লাহ্ আপনাকে মানুষ থেকে রক্ষা করবেন'– আল্লাহ্র এই বাণীটি বাধা হওয়ার ভিত্তিতে প্রিয় নবীর প্রকাশ্য জীবনে প্রতিফলিত হতে পারে নি। যেটির প্রতিফলন ঘটানোর জন্য এবং নবী-জীবনে যে দিকটির চরম বিকাশ ঘটানোর জন্য মহান আল্লাহ্ প্রিয় নবীর সেই দৌহিত্রকে নির্বাচন করেছেন, যাঁকে তিনি নিজের পুত্র বলেই সম্বোধন করতেন। যাতে করে হযরত হোসাইনের শাহাদাত নবী-চরিতেরই একটি অধ্যায় রূপে, নবী-জীবনেরই বিভিন্ন দিক থেকে একটি দিক রূপে এবং তাঁরই শ্রেষ্ঠত্ব ও চরমত্বের এক পূর্ণতা হয়ে চিরদিনের জন্য মর্যাদার আসনে সমাসীন হয়, গ্রহণযোগ্যতা পায় ও স্থায়িত্ব লাভ করে।

অধ্যায় : ০৪

শাহাদাতে ইমাম হোসাইন ঃ ঘটনা ও বাস্তবতা

ইসলামের ইতিহাসে শহীদ হয়েছেন অগণিত-অজস্র মুসলমান। প্রতিটি শাহাদাতই স্বকীয় বিবেচনায় বাহ্যতঃ গুরুত্ব বহন করে। প্রতিটি শাহাদাতই স্ব স্ব স্থানে যারপর নাই মর্যাদা ও গৌরব রাখে। প্রতিটি শাহাদাতের মধ্যেই নিহিত আছে ইসলামের সনাতনত্বের ও প্রিয় নবীর সুন্নাতকে চির উজ্জীবিত রাখার গোপন রহস্য। এ কারণেই ইসলামের ইতিহাসে প্রতিটি শাহাদাতকে স্বকীয়ভাবে গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচনা করা হয়। কিন্তু হযরত ইমাম হোসাইন রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হুর শাহাদাতের ঘটনা কতিপয় দিক থেকে অন্যান্য যে-কোন শাহাদাত থেকে ভিন্ন ও একক বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। এই শাহাদাতের স্বাতন্ত্র্যের একটি কারণ হচ্ছে তিনি ছিলেন রাসূল-পরিবারেরই একটি উৎস-প্রদীপ। আর তাও এমন উৎস-প্রদীপ যে, তিনি সরাসরি প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোলেই লালিত-পালিত হয়েছেন, তাঁর মোবারক কাঁধে আরোহন করেছেন, তাঁর মুখের থুথু মোবারক আহার করেছেন এবং তাঁর পুত্র হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেছেন। সে কারণেই নিঃস্ব অবস্থায়, ভিনদেশের মাটিতে অত্যাচারে জর্জরিত হয়ে আপন নানাজানের ভক্তদের হাতে শাহাদাত বরণ করা নিশ্চয় অন্যান্য যে-কোন শাহাদাতের তুলনায় আলাদা শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদার প্রমাণ বহন করে।

খেলাফতে রাশেদার সময়কাল :

প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরবর্তীতে কোন্ ধরনের রাষ্ট্র পরিচালনা হবে তার পরিচিতি পূর্বেই তিনি (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম) দিয়ে দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন:

الْخِلَافَةُ ثَلَاثُونَ سَنَةً ثُمَّ تَكُونُ مُلْكًا.

–আমার পরবর্তীতে খেলাফত থাকবে ত্রিশ বৎসর পর্যন্ত। এর পর থেকে শুরু হবে রাজতন্ত্র।[১]

প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের উক্তি অনুসারে খেলাফতে রাশেদা চলবে তাঁর পরবর্তী ত্রিশ বৎসর পর্যন্ত এবং তৎপরবর্তীতে রাজতন্ত্রের গোড়াপত্তন হবে। রাষ্ট্র পরিচালনার কল্যাণকর ও হিতকর নিয়মনীতির রাষ্ট্রনীতি পরিবর্তন করে দেওয়া হবে। আর মুসলিম উম্মাহ্র মাঝে রাজনৈতিক নেতৃত্ব অর্জনের যে অবস্থার সৃষ্টি হবে সেটি হবে রাজতন্ত্রীয় রূপে। অতএব, হুজুর

[১]. মিশকাতুল মাসাবীহ্। কিতাবুল ফিতন।

পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হু প্রায় আড়াই বৎসর যাবৎ খেলাফতের দায়িত্বে অধিষ্ঠিত ছিলেন। দ্বিতীয় খলিফা হযরত ওমর ফারূক রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হু প্রায় দশ বৎসর যাবৎ মসনদের শোভা বর্ধন করেন। অতঃপর তৃতীয় খলিফা হযরত ওসমান গনী যুন্নুরাইন রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হুর সময়কাল। তিনি রাষ্ট্র পরিচালনা করেন বার বৎসর যাবৎ। তাঁর পরবর্তীতে চতুর্থ খলিফা হযরত আলী কাররামাল্লাহু তা'আলা ওয়াজহাহু পাঁচ বৎসর যাবৎ রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্বে নিয়োজিত থাকেন। আর দীনের তাবলীগের জন্য যা যা করা যায় প্রাণান্তর প্রচেষ্টা সহকারে অত্যন্ত নৈপুন্য ও সাহসিকতার সাথে উৎসাহ ও উদ্দীপনা নিয়েই সবকিছু তাঁরা করেছিলেন। তাঁর শাহাদাতের পর তাঁরই শাহজাদা হযরত ইমাম হাসান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হু রাষ্ট্র পরিচালনার এই গুরু দায়িত্ব পালন করেন। প্রায় ছয় মাস তিনি মসনদে ছিলেন। সাইয়েদুনা ইমাম হাসান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হুর খেলাফতকালের ছয় মাস সহ ত্রিশ বৎসরের এই সময়কালটিকেই খেলাফতে রাশেদা বলা হয়ে থাকে।

শেরে খোদা হযরত আলী কাররামাল্লাহু ওয়াজহাহুর খেলাফতকালে বরং তাঁর খেলাফতের ঘোষণার পর পরই সিরিয়া রাজ্যে হযরত আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হু স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়ে দেন। হযরত আলী কাররামাল্লাহু ওয়াজহাহুকে তিনি আমীর হিসাবে মেনে নেন নি। এই কথায় মুসলিম উম্মাহ্ একমত যে, যে-কোন বিবেচনায় খেলাফতের হক হযরত সাইয়েদুনা আলীরই ছিল। তিনিই ছিলেন হক খলিফা এবং খলিফায়ে রাশেদ। আহলে সুন্নাতের সমুদয় ইমামগণ হযরত আমীরে মুয়াবিয়ার এই সিদ্ধান্ত এবং এই উদ্যোগকে খাতায়ে ইজতিহাদী বা ইজতিহাদগত ভুল হিসাবে চিহ্নিত করেছেন।

হযরত আমীরে মুয়াবিয়ার বিচ্ছিন্ন স্বাধীনতা ঘোষণার পর হযরত আলীর সাথে তাঁর বৈরিভাব আরম্ভ হয়ে যায়। ফলে দুইজনের মাঝে 'উষ্ট্রের যুদ্ধ' ও 'সিফফীনের যুদ্ধের' ন্যায় ছোট-বড় যুদ্ধের অবতারণা হয়। এমনকি হযরত আলীকে শহীদ করে দেওয়া হয়।

নূতন জঙ্গী বাহিনীর আত্মপ্রকাশ :

ক্ষমতার দ্বন্দ্বের এই যুগে চারটি দল আত্মপ্রকাশ করে। তন্মধ্যে একটি দল প্রকাশ্যে হযরত আলীর পক্ষে অবস্থান নেয় এবং বনু উমাইয়াসহ অপরাপর

ব্যক্তিবর্গের বিরোধিতার ঘোষণা দেয়। এই দলটি নিজেদেরকে 'শীয়ানে আলী' বলে পরিচয় দেয়। (শীয়ান শব্দটি আরবি, এর অর্থ দল)। অর্থাৎ দলটি নিজেদেরকে হযরত আলীর দল বলে পরিচয় দেয় এবং রাজনৈতিকভাবে সেই লক্ষ্যকে সামনে নিয়েই দলটি পরবর্তীতে 'শীয়ানে আলী' নামে পরিচয় লাভ করে।

স্মর্তব্য যে, সেই সময়ে যা 'শীয়ানে আলী' নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল, তা দ্বারা পরবর্তীতে ফিকহী ও ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে সেই শীয়াদের বুঝাত না যারা পরবর্তীতে যথারীতি ফিকাহশাস্ত্রের প্রণয়ন ও সংকলনের পর অস্তিত্ব লাভ করেছিল। তারা বরং হযরত আলীর খেলাফতের পক্ষে রাজনৈকিতভাবে সাহায্য-সহযোগিতা করার লক্ষ্যেই সেই সময়ে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল, যখন হযরত আলী ও আমীরে মুয়াবিয়ার মাঝে রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব বিরাজমান ছিল।

অপরপক্ষে আরেকটি দল অস্তিত্ব লাভ করে হযরত আলীর বিরুদ্ধে তাঁর শত্রু হয়ে বনু উমাইয়ার পক্ষে। প্রথম প্রথম এই দুইটি দল পরস্পর যুদ্ধংদেহী মনোভাব পোষণ করে। সেই সময়ে তৃতীয় আরেকটি দলও আত্মপ্রকাশ করে, যে দলটি হযরত আলী ও আমীরে মুয়াবিয়া উভয়েরই বিরোধিতায় মেতে উঠে। এই দলটি এই দুই মহামান্যের বিরুদ্ধে সশস্ত্র অস্থিতিকর পরিস্থিতির অবতারণা করে। এদের বলা হয় 'খাওয়ারিজ'। এই খারেজীরা নামাজ, রোজা ও যাকাতের পাবন্দ ছিল। বিভিন্ন ধরনের নফল নামাজ, তাহাজ্জুদ, জিকির-আজকার সহ কুরআন তিলাওয়াতের ন্যায় আমলগুলোও করত। إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ 'আল্লাহ্ ছাড়া কারো হুকুম মানি না, মানব না'– এর মিছিল তুলত। কিন্তু নাউযু বিল্লাহ্ তারা হযরত আলী ও আমীরে মুয়াবিয়াকে 'ওয়াজিবুল কতল' (কতল করে ফেলা ওয়াজিব) বলত।

আহ্লে সুন্নাতের দৃষ্টিকোণ :

এহেন রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা এবং উত্বেগ ছড়ানো পরিস্থিতিতে নীতিবান লোকের সংখ্যাও কম ছিল না। তাঁরা বিষয়টিকে বাস্তব দর্পণে প্রত্যক্ষ করে দলাদলির পথ পরিহার করেন। পরবর্তীতে এই দলটিই আহ্লে সুন্নাত ওয়াল জামাত নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। এই দলটিতে মুসলিম উম্মাহ্র সিংহ ভাগই শরিক ছিল। এই দলে সাহাবায়ে কেরাম ও তাবেঈনে এজামদেরও আধিক্য ছিল। এঁরা হযরত আলী কাররামাল্লাহু ওয়াজহাহুর খেলাফতকেই সব দিক থেকে সত্য বলে জানতেন এবং মানতেন। তাঁর খেলাফতকে তাঁরা খেলাফতে

রাশেদা বলে প্রতিপন্ন করতেন। হযরত আমীরে মুয়াবিয়ার স্বাধীনতার ঘোষণা ও খেলাফতের ঘোষণাকে সঠিক উদ্যোগ বলে মনে করতেন না। কিন্তু রাসূলের সাহাবী হওয়ার কারণে আদব রক্ষার্থে তাঁর বিষয়ে নীরব থাকতেন। এবং হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটি উক্তি 'আমার প্রত্যেকটি সাহাবাই ন্যায়-পরায়ণ'–এর পরিপ্রেক্ষিতে সম্ভ্রম বিবেচনায় আমীরে মুয়াবিয়ার খেলাফত নিয়ে কোন রূপ উচ্চবাচ্য করতেন না। কিন্তু সত্য প্রতিষ্ঠার স্বার্থে তাঁরা সবাই ছিলেন হযরত আলীরই পক্ষে। তাঁরা হযরত আলীর খেলাফতকেই সত্য প্রতিপন্ন করতেন। তাঁরা ছিলেন হযরত আলীর সত্যিকারের অনুসারী ও সাথী। কিন্তু তাঁর বিরুদ্ধে যত বিরোধিতা হয়েছে কিংবা শত্রুতা হয়েছে কোনটাতেই তারা যথারীতি কোন দলের ছত্রছায়ায় এসে যুদ্ধ-বিগ্রহে শরিক হয়ে তাঁকে সাহায্য-সহযোগিতায় অংশ নেন নি। তাঁরা কিতাব-সুন্নাহ্ নিয়েই মশগুল থাকতেন। হযরত আলীর ওফাত হলে এঁদের অধিকাংশই হযরত ইমাম হাসানকে নিজেদের খলিফা হিসাবে মেনে নেন। খেলাফতের ছয় মাস অতিবাহিত হওয়ার পরও যখন মুসলিম উম্মাহ্র উপর রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা বরাবর আগের মতই থেকে যায় এবং দলাদলিও বন্ধ হয়ে না যায়, তখন সাইয়েদুনা ইমাম হাসান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু মুসলিম উম্মাহ্র ঐক্য ও সংহতি ফিরিয়ে আনার উদ্দেশ্যে খেলাফতের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি প্রদানের ঘোষণা দেন। এবং মসুলিম উম্মাহ্র সমধিক হিত কল্পনায় আমীরে মুয়াবিয়ার শাসন মেনে নেওয়ার ঘোষণা দেন। অতএব, এই চতুর্থ দলটিও অর্থাৎ আহ্লে সুন্নাত ওয়াল জামাতও সাইয়েদুনা ইমাম হাসান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর আনুগত্য ও অনুসরণে মুসলিম উম্মাহ্র হিত বিবেচনায় হযরত আমীরে মুয়াবিয়ার শাসন মেনে নিলেন। বনু উমাইয়ার খেলাফতের বিরুদ্ধে একেবারেই নামলেন না।

খেলাফতের কেন্দ্রস্থল ঃ কুফার :

হযরত আলী কররারামাল্লাহু তা'আলা ওয়াজহাহু তাঁর খেলাফতকালে মদীনা শরীফ থেকে স্থানান্তরিত করে রাষ্ট্রীয় সিংহাসনটি কুফায় নিয়ে এসেছিলেন। এর কারণ, হযরত আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর রাজধানী ছিল দামেশকে। মদীনা ছিল দামেশক থেকে অনেক দূরে দীর্ঘ সফরের পথে। এত দূরত্বে অবস্থান করে খেলাফতের পরিপূর্ণ ব্যবস্থাপনা ও রাষ্ট্রীয় কার্য পরিচালনা দুষ্কর ছিল। তাই এই অসুবিধা ও এলাকায় একের পর এক সংঘটিত হওয়া বিরোধিতা ও সহিংসতা ঠেকাতে তিনি নিজের রাজধানী হিসাবে কুফাকে

নির্বাচন করেছিলেন। অবশ্য হেজায ও হেরমাইন (পবিত্র মক্কা-মদীনা) নিরাপদই ছিল। হযরত আলী কাররামাল্লাহু ওয়াজহাহু যখন কুফাকে খেলাফতের কেন্দ্র বানিয়ে নিলেন, তখন যারা নিজেদেরকে 'শীয়ানে আলী' (হযরত আলীর দল) বলে দাবী করত হযরত আলীর সাহচর্যের মনোভাবে দুনিয়ার বিভিন্ন অঞ্চল থেকে কুফায় এসে জড়ো হতে থাকে। তারা কুফায় সংখ্যালঘু আকারে অবস্থান নেয় এবং বসবাস করতে থাকে। এভাবে কুফা নগরী 'শীয়ানে আলী'দের কেন্দ্রে পরিণত হয়ে যায়।

হযরত আমীরে মুয়াবিয়া সম্পর্কে আহ্‌লে সুন্নাতের মতবাদ :

হযরত আমীরে মুয়াবিয়া অবশ্যই ইসলাম ও মুসলমানদের হিতাকাঙ্ক্ষী ছিলেন। তিনি খেলাফত প্রশ্নে আগেকার ন্যায় মুসলমানদের মাঝে খুনাখুনি ও রক্তপাত চান নি। বিগত অবস্থাদির প্রেক্ষাপটে তিনি এও বুঝতেন যে, তিনি যদি খেলাফত ও ক্ষমতা স্বাভাবিকভাবেই বাদ দিয়ে দেন কিংবা কোন কমিশনকে খলিফা নির্বাচনের দায়িত্ব দিয়ে দেন, তা হলে লোকেরা কখনো কোন ব্যক্তি বিশেষের উপর একমত হবে না। তখন বিভিন্ন এলাকা হতে খেলাফতের অনেক অনেক দাবীদার দাঁড়িয়ে যাবে। এতে করে মস্ত এক অস্থিতিকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হবে। তিনি এও উপলব্ধি করতেন যে, খেসাফত যদি বনু হাশেমকে দিয়ে দেওয়া হয়, তা হলে বনু উমাইয়ার লোকেরা যারা জাতিগত ভাবে অবিচ্ছিন্ন কখনো মেনে নেবে না। ফলে যুদ্ধ-বিগ্রহের নির্ঘাত এক ক্রমবর্ধমান ধারারই অবতারণা হবে। অতএব, তিনি বনু উমাইয়ার উপর আপন পুত্র এজিদকে প্রাধান্য দিলেন। ঐতিহাসিকদের মতে যে ছিল রাজনৈতিক বিষয়ে খুবই পারদর্শী ও সিদ্ধহস্ত। তিনি ভুল করুক আর শুদ্ধ করুক, এ কথাটি অবশ্য সর্বজনবিদিত যে, এসব কিছু তিনি মুসলমানদের মাঝে খুনাখুনি ও রক্তারক্তি বন্ধ করার মানসেই করেছিলেন। এই কথাটির সাক্ষী তাঁর এই দোয়াটি, যা তিনি এজিদকে দায়িত্বভার অর্পণ করার পরে করেছিলেন।

اَللّٰهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي وَلَّيْتُهُ لِأَنَّهُ فِيمَا أَرَاهُ أَهْلٌ لِذٰلِكَ فَأَتَمِمْ لَهُ مَا وَلَّيْتُهُ،

وَإِنْ كُنْتَ وَلَّيْتُهُ لِأَنِّي أُحِبُّهُ فَلَا تُتِمَّ لَهُ مَا وَلَّيْتُهُ.

–হে আল্লাহ্! তুমি যদি জান যে, এজিদকে আমি তার যোগ্যতার ভিত্তিতে দায়িত্বভার অর্পণ করেছি, তা হলে তুমি তাকে দিয়ে এই দায়িত্ব পূর্ণ করিয়ে নাও। পক্ষান্তরে তুমি যদি এই কথা জান যে, স্বজনপ্রীতির বশবর্তী হয়ে আমি তাকে এই দায়িত্ব অপর্ণ করেছি, তা হলে তুমি তাকে দিয়ে এই দায়িত্ব পূর্ণ করিও না।[১]

হযরত আমীরে মুয়াবিয়ার এই উদ্যোগকে শুদ্ধ বলুন আর ভুল বলুন, এ কথাটি কখনো অস্বীকার করা যায় না যে, তাঁর এই উদ্যোগের পেছনে কাজ করেছিল হিত ও মঙ্গল কামনা। ওলামায়ে আহ্‌লে সুন্নাতগণ এই উদ্যেগের কথা ভেবে এবং নবীর সাথে সম্পৃক্ততার অর্থাৎ সাহাবা হওয়ার কথা বিবেচনা করে হযরত আমীরে মুয়াবিয়ার ব্যাপারে উচ্চবাচ্য করা, তাঁর সমালোচনা করা, তাঁকে গালমন্দ করা এবং ভালমন্দ বলা হারাম বলে ঘোষণা দিয়েছিলেন।

আমীরে মুয়াবিয়া ব্যক্তি হিসাবে সৎ হোক বা তাঁর উদ্দেশ্যই সৎ হোক, কিছু কিছু লোক কিন্তু এরই অন্তরালে ঘোলা পানিতে মাছ শিকার করার সুযোগ নিতে থাকে। তারা বলে থাকে, এজিদের দায়িত্বপ্রাপ্তি ও শাসনভার অকাট্য, বিশুদ্ধ ও অবিসম্বাদিত। এভাবে তারা এজিদের শাসনামলের যে-কোন উদ্যোগকেও সঠিক বলে মন্তব্য করে। যাতে করে হোসাইন হত্যার ন্যায় ন্যাক্কারজনক এজিদী তাণ্ডবকেও সঠিক বলে চালিয়ে দেওয়া যায়। তারা এই উদ্দেশ্যে কিছু ছিঁটে-ফুঁটো ও ভিত্তিহীন প্রমাণাদির আশ্রয় গ্রহণ করে। অথচ এজিদের সমুদয় উদ্যোগকেই বিশেষ করে সাইয়েদুনা ইমাম হোসাইন রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হুর বিরুদ্ধে এজিদের সকল অপকর্মকেই সঠিক বলে চালিয়ে দেওয়া তাদের অপকৌশলই ছিল। এবং বিপরীতে ইমাম আলী মকামকে বিদ্রোহী বলা, তাঁর অনুপম শাহাদাতকে ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করার অপচেষ্টা চালানো মূলত আহ্‌লে বাইত ও প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি প্রচ্ছন্ন বিদ্বেষ ছাড়া আর কিছুই নয়। এ কেবল হীনতা আর ভাগ্যহীনতাই নয়, বরং নিজেদেরকে জাহান্নামের ইন্ধনে পরিণত করারই নামান্তর। সেই ব্যক্তি কোন অবস্থাতেই ঈমানের দাবী করতে পারে না, যার হৃদয়ে আহলে-বাইতের ভালবাসা থাকে না, রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভালবাসা থাকে না।

ঈমান মূলত নবী পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভালবাসা ও মর্যাদাবোধ, তাঁর সাহাবাদের প্রতি অদম্য ভালবাসা ও মর্যাদাবোধ এবং নবী-পরিবারের প্রতি অকুণ্ঠ ভালবাসা ও মর্যাদাবোধেরই নাম। যার হৃদয়ে নবী পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি ভালবাসা নাই, যে সাহাবা ও

১. আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া : ৮: ৮০।

আহলে-বাইতগণের সমালোচনা করে, তাছাড়া পবিত্র আহলে-বাইতগণের প্রতি ভালবাসা ও মর্যাদাবোধ রাখে না, সে আদৌ ঈমান নামের দৌলতের ভাগীদার নয়। যে ব্যক্তি রাসূল-দৌহিত্রের শাহাদাতকে অস্বীকার করে, নবী-পরিবারের আদব ও মমত্ববোধকে আবশ্যক বলে মনে করে না, সেই ব্যক্তির জন্য জান্নাত হারাম। কেননা, এসব তো নবী আখেরুজ্জমান এবং তাঁর আহলে-বাইতগণের কদমেরই সদকা। সুতরাং, যে ব্যক্তি নিজেকে নবীর আহ্‌লে-বাইতের দাস বলে মনে করতে পারে, নিজেকে রাসূল-পরিবারের গোলাম বলে মনে করতে পারে এবং নবী-পরিবারের প্রত্যেকের কদমের ধূলিকে চোখের সুরমা বানাতে পারে, সেই ব্যক্তিই কেয়ামত দিবসে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের শাফাআতের যোগ্য হতে পারে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি নিজের অন্তরে নবী, আহ্‌লে-বাইত ও আলে-রাসূলের আদব, মহব্বত ও সম্পর্ক উপলব্ধি করে না, সে জেনে রাখুক, সেই ব্যক্তির উপর হীনতা ও ভাগ্যহীনতাই চড়াও হয়েছে। নবী পাকের সাথে তার দূরতম সম্পর্কও বিদ্যমান নাই। সে দৈহিক, আর্থিক ও মৌখিক যত এবাদতই করুক না কেন, তার কোন আমলই আল্লাহ্‌র দরবারে এতটুকু গুরুত্ব রাখবে না। তার সব আমল তার মুখের দিকে ছুঁড়ে মারা হবে।

৬০ হিজরীর শেষভাগ থেকে আশ্রয় প্রার্থনার নির্দেশ :

হযরত ইমাম হোসাইন রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হুর শাহাদাতের এ এক একক বৈশিষ্ট্য যে, প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর শাহাদাতের বিশদ বিবরণ আগেই দিয়ে দিয়েছেন। এমনকি পবিত্র আহ্‌লে-বাইতের আবাল-বৃদ্ধ-বণিতাসহ বিশিষ্টজনেরাও সে কথা জানতেন। তাঁরা ভাল করেই জানতেন, ভবিষ্যতে কী হবে? আশ্চর্যজনক অভূতপূর্ব ঘটনার এই আগাম বিবরণকে মুজেযারূপী ভবিষ্যদ্বাণী ছাড়া আর কী বলা যায়? এ কারণেই তো, সিফফীনের ময়দানে যাবার পথে শেরে খোদা আলী মুরতাদ্বা কাররামাল্লাহু ওয়াজহাহু কারবালার সেই স্থানগুলোও দেখিয়ে দিয়েছিলেন, যেখানে এই হযরতগণ শহীদ হবেন।

এসব ঘটনার অন্তরপট পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায় যে, হুজুর নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম অন্যান্যদের বিবরণের পাশাপাশি কিছু কিছু বিশেষ ব্যক্তিবর্গের ব্যাপারে মাস ও সাল পর্যন্ত নিরিখ করে দিয়েছিলেন। আর তিনি অকাট্যরূপেই জানতেন যে, এই উদ্বেগজনক মুহূর্তটির বাস্তব প্রতিফলন কখন ঘটবে?

হযরত আবু হোরায়রা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হুও ছিলেন সেসব বিশেষ ব্যক্তিবর্গের এবং সম্মানিত রহস্যভেদী বন্ধুদের একজন, যাঁরা ভাল করেই জানতেন যে, হিজরী ষাট সনের শেষভাগ পর্যন্ত রাজনৈতিক ও রাষ্ট্রীয় অবস্থা এমনরূপ থাকবে না। বরং এতে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন সাধিত হবে। রাষ্ট্রের লাগামের রশিটি এমন কিছু অসাধু ও স্বল্প-বয়স্ক ছোকরাদের হাতে চলে যাবে, যাদের কারণে কেবল আল্লাহ্‌র আমানতই নয় বরং জনজীবনই বিপন্ন হয়ে যাবে। আর তারা ক্ষমতাকে ব্যবহার করবে আয়েশী জীবন-যাপনে, মদ্য পানে, কুধর্মাচারে, ভবঘুরেমীতে, কুস্বভাবে এবং জনসাধারণের উপর নিপীড়ন ও নির্যাতনে। তাই হযরত আবু হোরায়রা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হু অধিকাংশ সময় দোয়া করতেন:

أَعُوذُ بِاللهِ مِنْ رَأْسِ السِّتِّينَ وَإِمَارَةِ الصِّبْيَانِ.

–আমি ষাটের হিজরীর শেষভাগ থেকে এবং স্বল্প-বয়সীদের শাসন থেকে আল্লাহ্‌র নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি।[১]

অন্য এক বর্ণনায়, হযরত আবু হোরায়রা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হু হাটে-বাজারে চলাফেরার সময় এই প্রার্থনা করতেন:

اللَّهُمَّ لَا تُدْرِكْنِي سَنَةَ سِتِّينَ وَلَا إِمَارَةَ الصِّبْيَانِ.

–হে আল্লাহ্! আমি যেন ষাটের হিজরী ও ছোকরাদের শাসন না পাই।[২]

তাঁর বাসনা ছিল, এমন এক ভয়ানক সময়কাল আসবে, যার আগেই এই দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়ে যেতে হবে। তাঁর দোয়া কবুল হয়েছিল। এক বৎসরে আগেই তিনি ইন্তিকাল হয়ে যান।

ষাট হিজরীতে এজিদ সিংহাসনে আরোহন করে। একষট্টি হিজরী শুরু হওয়ার দশ দিনের মধ্যেই কারবালার মর্মান্তিক ঘটনা সংঘটিত হয়। যার পরিষ্কার মর্মার্থ এই যে, হুজুর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম এজিদের শাসন থেকে পানাহ্ প্রার্থনা করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। বলে দিয়েছিলেন, এ হবে সেই ব্যক্তি, যে আহ্‌লে-বাইতের রক্ত দিয়ে হাত রাঙাবে। সেই হুকুমের পায়রভী করতে গিয়ে হযরত আবু হোরায়রা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হু

১. ফতহুল বারী। ১: ২১৬।
২. ফতহুল বারী। ১২: ১০।

আনাড়ি এজিদের বেপরোয়া শাসন এবং তার জুলুম-অত্যাচারের শাসনকাল হতে আশ্রয় প্রার্থনা করতেন।

এজিদের প্রতি হযরত আমীরে মুয়াবিয়ার অছিয়ত :

হযরত আমীরে মুয়াবিয়া যখন এজিদকে মসনদে বসানোর সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললেন, তখন সুশীল সমাজ তাতে অমত পোষণ করে বললেন, আমরা মানি, তিনি আপনার সন্তান। তাই বলে তার অর্থ এই নয় যে, আপনি তাঁকে মুসলিম উম্মাহ্‌র সর্ব-বরণীয় মহান ব্যক্তিবর্গের উপর চাপিয়ে দেবেন। কেননা, সে একজন বিলাসী, কামচোর, উদাস ও বেপরোয়া কিশোর। রাষ্ট্রের দায়-দায়িত্ব সম্পর্কে যার কোন আন্তরিকতা নাই। সে দিবানিশি খেল-তামাশায় মত্ত থাকে। সময় কাটায় ভবঘুরে কিশোরদের নিয়ে। কাজেই, আমাদের দ্ব্যর্থহীন ও ঐকান্তিক মতামত হল, আমরা তার বশ্যতা মেনে নেব না।

হযরত আমীরে মুয়াবিয়া জবাবে বললেন, আমি আশা রাখি, তার উপর যখন রাষ্ট্রের সমুদয় দায়-দায়িত্ব এসে পড়বে, তখন সে নিজেকে সংশোধন করে নেবে। তবু রাজনৈতিক দূরদর্শিতার ভিত্তিতে হযরত আমীরে মুয়াবিয়া জানতেন যে, দেশের নেতৃবর্গ ও বিশিষ্ট লোকজন তার বশ্যতা মেনে নেবেন, কিন্তু নবী-বংশের উৎস ও প্রদীপ হযরত ইমাম হোসাইন রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হু এজিদের বশ্যতা স্বীকারে রাজি হবেন না। আরো কিছু সাহাবা সম্পর্কেও তিনি জানতেন। তাঁদের মধ্যে হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে যোবাইর, হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর ও হযরত আবদুর রহমান বিন আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হুমও শামিল ছিলেন। তাই ইন্তিকালের পূর্বে তিনি এজিদকে অছিয়ত করেছিলেন যে, হযরত হোসাইন বিন আলী কোমল হৃদয়ের মানুষ। ইরাকবাসীরা তাঁকে হেজায থেকে বহিষ্কার করে দেবে। অতএব, তিনি যদি বেরিয়ে আসেন আর তুমি যদি তাঁর উপর জয় লাভ কর, তাহলে তাঁকে কোন ধরনের বাধা দেবে না। তাঁকে তাঁর অবস্থাতেই থাকতে দেবে। কেননা, তাঁর একান্ত সম্পর্ক স্বয়ং রাসূলেরই সাথে।[১]

মদীনার গভর্নরের নিকট এজিদের চিঠি:

সিংহাসনে আরোহন করার পর এজিদের কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়ে দাঁড়াল হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর, হযরত ইমাম হোসাইন এবং হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে যোবাইরকে বশে আনা। কেননা, তাঁরা এজিদের শাসন মেনে

১. ইবনে আছীর, ৪:৬।

নেন নি। তাছাড়া উনারা গোটা মুসলিম উম্মাহ্‌র এমন উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তিত্ব ছিলেন, যাঁদের ব্যাপারে এজিদের সন্দেহ ছিল যে, পাছে কখনো তাঁদের কেউ খেলাফতের দাবী করে বসেন। কাজেই, এজিদের পক্ষে তার রাষ্ট্রের স্থায়িত্ব ও অটলত্বের জন্য তাঁদের বশে আনার প্রয়োজন ছিল। তাই সিংহাসনে বসার সাথে সাথেই এজিদ মদীনার গভর্নর ওয়ালিদ বিন ওকবাকে হযরত আমীরে মুয়াবিয়ার ওফাতের সংবাদ পাঠিয়ে দেয়। সাথে ফরমান পাঠিয়ে দেয়, 'হযরত ইমাম হোসাইন, হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে যোবাইর এবং হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমরের কাছ থেকে আমার পক্ষে সম্মতি নিয়ে নেবেন। তাঁরা যতক্ষণ পর্যন্ত আমাকে মেনে না নেবেন, ততক্ষণ পর্যন্ত নিস্তার দেওয়া যাবে না।'[১]

মারওয়ানের নিকট ওয়ালিদের পরামর্শ গ্রহণ :

ওয়ালিদ বিন ওকবা ছিলেন কোমল হৃদয়ের লোক। নবী-বংশের প্রতি অগাধ সম্মান ও মমত্ববোধ-সম্পন্ন গভর্নর ছিলেন তিনি। এজিদের এই নির্দেশে তিনি অত্যন্ত ভীত হন। এহেন নির্দেশ পালন করা তাঁর পক্ষে দুরূহ ছিল। এই নির্দেশ পালন না করলে কী পরিণতি যে হবে, সে ব্যাপারেও তিনি ভাল করেই জানতেন। পরামর্শ গ্রহণের জন্য তিনি আপন প্রতিনিধি মারওয়ান বিন হাকমকে ডাকা পাঠালেন। তিনি তাঁকে সম্পূর্ণ ব্যাপার খুলে বললেন। মারওয়ান ছিলেন অত্যন্ত কঠোর ও শক্ত মনের মানুষ। তিনি বললেন, আমার মতে, আপনি এক্ষুণি তাঁদের ডেকে নিয়ে আসুন আর বশ্যতা স্বীকার করতে বলুন। তাঁরা যদি মেনে নেন, তাহলে তো ভাল কথা, আর যদি গড়িমসি করেন, তাহলে তিন জনকেই কতল করে দিন। আপনি যদি এই কাজটি না করে থাকেন, তা হলে আমীরে মুয়াবিয়ার মৃত্যুর সংবাদ পাওয়ার সাথে সাথেই তাঁরা তিনজনই আলাদা আলাদা জায়গায় গিয়ে খেলাফতের দাবীদার হয়ে বসবেন। পরে তাঁদের বিরুদ্ধে পেরে উঠা দুষ্কর হয়ে যাবে। অবশ্য ইবনে ওমর যুদ্ধ-বিগ্রহ পছন্দ করেন না। তিনি খেলাফতের খায়েশও রাখেন না। কিন্তু কথা হচ্ছে খেলাফত তাঁকে তুলে দেওয়া হবে।[২]

ওয়ালিদ হযরত ইমাম হোসাইন এবং হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে যোবাইরকে ডেকে আনার জন্য দূত পাঠিয়ে দিলেন। দূত উভয়কে মসজিদে নববী শরীফে

১. আত তাবারী: ৬: ২৪। ইবনে আছীর: ৪: ১৪। আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ৮খ: ১৪৬।
২. ইবনে আছীর, ৪: ১৫। আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ৮: ১৪৭।

বসা অবস্থায় পেলেন। দূতটি এমন এক সময়ে তাঁদের কাছে এলেন যখন ওয়ালিদ কারো সাথে সদ্ভাব রাখতেন না। দূত বললেন, 'আপনারা দুইজনকে আমীর ডেকেছেন'। তাঁরা দূতকে বললেন, 'আপনি যান, আমরা আসছি'। পরে হযরত ইবনে যোবাইর হযরত ইমাম হোসাইনকে বললেন, 'আপনার কী মনে হয়, এমন সময়ে আমীর আমাদের কেন তলব করলেন, যে সময়ে তিনি কারো সাথে সদ্ভাব রাখেন না'?

হযরত ইমাম হোসাইন বললেন, 'আমার মনে হয়, হযরত আমীরে মুয়াবিয়া ওফাত পেয়েছেন। তাই তিনি আমাদের তলব করেছেন। এ কারণে যে, তাঁর মৃত্যুর সংবাদ চতুর্দিকে ছড়ানোর আগেই যেন এজিদের পক্ষে আমাদের সম্মতি নেওয়ার কাজটি শেষ হয়ে যায়'। হযরত ইবনে যোবাইর বললেন, 'আমারও একই ধারণা'। এরপর তিনি হযরত ইমাম হোসাইনকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'এই মুহূর্তে আপনি কী করবেন'? তিনি বললেন, 'আমি এই মুহূর্তে আমার জওয়ানদের নিয়ে রওয়ানা দেব। কেননা, অস্বীকার করলে বিষয়টি নাজুক পরিস্থিতির সৃষ্টি করতে পারে'।

হযরত ইমাম হোসাইন আত্মরক্ষামূলক ব্যবস্থা নিয়ে ওয়ালিদের নিকট গিয়ে উপস্থিত হলেন। তিনি সাথীদের বললেন, 'আমি ঘরের ভেতর প্রবেশ করছি। আমি যদি আপনাদের ডাকি কিংবা যদি শুনতে পান যে, আমার আওয়াজ বড় হচ্ছে, তখন সাথে সাথেই ভেতরে চলে আসবেন। আর যতক্ষণ আমি বাইরে আসব না, ততক্ষণ পর্যন্ত আপনারা স্থান ত্যাগ করবেন না'। তিনি ভেতরে প্রবেশ করলেন। সালাম করেই বসে পড়লেন। সেই সময়ে ওয়ালিদের পাশে মারওয়ানও ছিলেন। ওয়ালিদ তাঁকে হযরত আমীরে মুয়াবিয়ার ওফাতের কথা জানালেন এবং এজিদের পক্ষে সম্মতি দেওয়ার কথাও বললেন। তিনি শোক প্রকাশ পূর্বক বললেন, 'আমার মত ব্যক্তি এমনভাবে গোপনে সম্মতি দিতে পারি না। আর এরূপ গোপনে সম্মতি দেওয়া আমার পক্ষে শোভাও পায় না। আপনি যদি বাইরে এসে জনসাধারণসহ আমাকেও সম্মতি জ্ঞাপনের জন্য আহ্বান করেন, তা ভিন্ন কথা।' ওয়ালিদ যেহেতু একজন শান্তিপ্রিয় লোক ছিলেন, তাই তিনি বললেন, 'ঠিক আছে। আপনি চলে যান'। এতে মারওয়ান ওয়ালিদকে বললেন, 'এখন যে আপনি তাঁকে চলে যেতে দিলেন, সম্মতিও নিলেন না, মনে রাখবেন, বহু মানুষের কতল হয়ে যাওয়ার আগে আপনি কখনো তাঁকে বাগে আনতে পারবেন না। তাঁকে আপনি বন্দী করে ফেলুন। তিনি যদি সম্মতি দেন, ভাল কথা। না হয় তাঁর শিরচ্ছেদ করে দিন।' হযরত

ইমাম হোসাইন—৮

ইমাম হোসাইন এ কথা শোনামাত্র দাঁড়িয়ে গেলেন। আর বললেন, 'ইবনে যারকা! আমাকে খুন কি তুমি করবে, না এ করবে? আল্লাহ্‌র কসম, তুমি একজন মিথ্যুক, তুমি একজন হীন মানুষ'। এ বলে তিনি নিজ গৃহে চলে আসেন।

তাঁর চলে আসার পর মারওয়ান ওয়ালিদকে বললেন, 'আপনি তো আমার পরামর্শ গ্রহণ করলেন না। দ্বিতীয়বার কখনো এ ধরনের সুযোগ পাবেন না'। ওয়ালিদ বললেন, 'আপনার উপর আফসোস! আপনি আমাকে এমন পরামর্শ দিচ্ছেন। আল্লাহ্‌র কসম, সারা পৃথিবীর সমস্ত সম্পদ, সমগ্র ভোগ-বিলাস ও বাদশাহীও যদি আমি এর বিপরীতে পাই যে, রাসূলের দৌহিত্রকে এজিদের পক্ষে সম্মতি না দেওয়ার কারণে কতল করব, আমি কস্মিনকালেও তা গ্রহণ করব না। আল্লাহ্‌র কসম, কেয়ামত দিবসে যাকে হোসাইনের খুন নিয়ে কৈফিয়ৎ দিতে হবে, সে কখনো মীজানে পার পেতে পারবে না'। মাওয়ান বললেন, 'আপনি ঠিকই বলছেন'। কথাটি তিনি নিতান্তই মুখ থেকেই বলেছিলেন। মূলত তিনি ওয়ালিদের কথাকে অপছন্দই করছিলেন।[১]

মদীনা মুনাওয়ারা থেকে রওয়ানা :

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে যোবাইর এই-সেই বাহানা দিয়ে ওয়ালিদের দূতকে এড়িয়ে চলতে থাকেন আর ওয়ালিদের কাছে গেলেন না। পরের দিন তিনি আপন ভাই জাফরের সাথে মদীনা মুনাওয়ারা থেকে মক্কা শরীফ রওয়ানা হয়ে যান। ওয়ালিদের আমলারা তাঁকে অনেকই খুঁজেছেন। কিন্তু পান নি। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে যোবাইরের মদীনা রওয়ানা হওয়ার পরের রাত হযরত ইমাম হোসাইন নিজের পরিবার-পরিজন, আত্মীয়-স্বজন ও আপনজনদের একত্র করলেন। এবং মদীনা মুনাওয়ারার সম্মানের খাতিরে এখান থেকে পবিত্র মক্কা নগরী চলে যাবার ইচ্ছার কথা ব্যক্ত করলেন। পরিবারের সবাইকে প্রস্তুতি গ্রহণের নির্দেশ দিয়ে তিনি মসজিদে নববীতে আপন নানাজানের রওজায়ে আকদাসে এসে উপস্থিত হলেন। নফল নামাজ আদায় করলেন। হাত বেঁধে দাঁড়িয়ে সালাম আরজ করলেন। দুই চোখ দিয়ে দর দর ধারায় অশ্রু বেরিয়ে এল। গুম্বদে খাদ্বরার নিচে চিরশায়িত নানাজানের বিচ্ছেদ আর মদীনা মুনাওয়ারার বিরহের ভাবনা তাঁকে আবেগাপ্লুত করে তোলে। এই শহরেই তিনি জীবনের একটি বিরাট অংশ কাটিয়েছেন। এই শহরেরই আলো-বাতাসে তিনি

---

[১]. ইবনে আছীর: ৪: ১৫-১৬।

শৈশব থেকে বড় হয়েছেন। মদীনা ছেড়ে দূরে চলে যাওয়া তাঁর পক্ষে দুর্বিসহ ছিল।

হযরত মোহাম্মদ বিন হানাফিয়ার পরামর্শ :

হযরত মোহাম্মদ বিন হানাফিয়া ব্যতীত গোষ্ঠীর সকলেই তাঁর সাথে মদীনা থেকে পবিত্র মক্কা নগরী হিজরত করেন। হযরত মোহাম্মদ বিন হানাফিয়া তাঁকে বললেন, 'ভাই! দুনিয়ার সকলের চেয়ে আপনিই আমার কাছে বেশি প্রিয়। আমার পরামর্শ, আপনি কোন শহরে অবস্থান করবেন না; অবস্থান করবেন গ্রাম এলাকায় আর মরু এলাকায়। দূত পাঠিয়ে লোকদেরকে বাইয়াতের জন্য আহ্বান করবেন। লোকেরা আপনার বাইয়াত গ্রহণ করলে আল্লাহ্‌র শুকরিয়া আদায় করবেন। তারা যদি অন্য কারো বশ্যতা মেনে নিতে একমত পোষণ করে, তাতে আপনার মহত্বে, গুণে ও বৈশিষ্ট্যে কোনরূপ ঘাটতি আসবে না। আমার ভয় হচ্ছে, আপনি যদি কোন বিশেষ শহরে বা বিশেষ দলে যোগ দেন তাহলে তাদের মধ্যে মতবৈষম্য সৃষ্টি হবে। একটি দল আপনার পক্ষে যেমন আসবে, অন্য দল বিপরীতেও যাবে। পরে সেই দুই দলে যুদ্ধ-বিগ্রহ হবে। এতে করে সর্বপ্রথম আপনি নিজেই তাদের টার্গেটে পরিণত হবেন। পরিস্থিতি যদি এমন হয়, তাহলে একজন মর্যাদাশালী কুলীণ ব্যক্তিসত্তা, বংশ ও আভিজাত্যে যিনি সমস্ত উম্মতদের মাঝে শ্রেষ্ঠ, তাঁর রক্তই সবচেয়ে সস্তা বস্তুতে পরিণত হবে এবং তাঁর পরিবার-পরিজনকে অপদস্থ করা হবে।'

এ কথা শুনে হযরত ইমাম হোসাইন বললেন, 'ভাই! তাহলে আমি কোথায় যেতে পারি'? তখন মোহাম্মদ হানাফিয়া বললেন, 'আপনি মক্কা নগরী চলে যান। সেখানে যদি আপনার ভাল লাগে, তো ভাল, ভাল না লাগলে কোন পাহাড়ী এলাকায় বা মরু এলাকায় চলে যাবেন। এভাবে বারবার জায়গা বদল করতে থাকবেন। লোকেরাও আপনার স্থান পরিবর্তনের বিষয়টি লক্ষ্য করবে। আপনি কোন না কোন ফলাফলে পৌঁছে যাবেন। কেননা, ঘটনা যখন এগিয়ে আসতে থাকে, সিদ্ধান্তও সঠিক হয়ে যায়।' তিনি বললেন, 'ভাই! আপনি আমার অনেক উপকার করলেন। আপনি আমার কল্যাণ কামনা করলেন এবং আমার সাথে সদ্ব্যবহার করলেন। আল্লাহ্ চাহেন তো, আপনার মতামতই সঠিক এবং উপযুক্ত প্রতিপন্ন হবে।'[১]

[১]. আত তাবারী। ৬: ২৪। ইবনে আছীর। ৪: ১৬, ১৭।

হযরত ইমাম হোসাইন স্বীয় পরিবার-পরিজন সহ পবিত্র মদীনা থেকে বেরিয়ে পড়লেন। তখন তিনি এই আয়াতটি তিলাওয়াত করছিলেন:

فَخَرَجَ مِنْهَا خَآئِفًا يَتَرَقَّبُ ۖ قَالَ رَبِّ نَجِّنِي مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّٰلِمِينَ

–অতঃপর তিনি সেই শহর থেকে বেরিয়ে পড়লেন, ভীত অবস্থায়, এই অপেক্ষায় যে, এখন কী হতে চলেছে। তিনি বললেন, হে আমার প্রতিপালক, তুমি আমাকে জালিম সম্প্রদায় থেকে রক্ষা কর।[১]

তিনি যখন পবিত্র মক্কা মুকাররামায় প্রবেশ করলেন, তখন এই আয়াতটি তিলাওয়াত করলেন:

فَخَرَجَ مِنْهَا خَآئِفًا يَتَرَقَّبُ ۖ قَالَ رَبِّ نَجِّنِي مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّٰلِمِينَ

–অতঃপর তিনি সেই শহর থেকে বেরিয়ে পড়লেন, ভীত অবস্থায়, এই অপেক্ষায় যে, এখন কী হতে চলেছে। তিনি বললেন, হে আমার প্রতিপালক, তুমি আমাকে জালিম সম্প্রদায় থেকে রক্ষা কর।[২]

وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَآءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسَىٰ رَبِّيٓ أَن يَهْدِيَنِي سَوَآءَ ٱلسَّبِيلِ ﴿٢٢﴾

–আর তিনি যখন মদ্‌য়ানের দিকে মনোনিবেশ করলেন, বললেন, আমি আশা করি, আমার প্রতিপালক আমাকে সোজা পথেই পরিচালিত করবেন।[৩]

হযরত হোসাইনের পবিত্র মক্কা নগরীতে আসার সময়কাল পর্যন্ত হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে যোবাইর মক্কায় নিজের পক্ষ থেকে কিছু সাহায্যকারী তৈরি করে রেখেছিলেন। ষাট হিজরীর রমজানে এজিদ ওয়ালিদ বনি ওকবাকে অপসারণ করে দিল। তদস্থলে আমর বিন সাআদকে মদীনার গভর্নর নিয়োগ দিল। আমর বিন সাআদ অন্য বর্ণনা মতে স্বয়ং এজিদই পবিত্র মক্কা নগরী অবরুদ্ধ করে ফেলল। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে যোবাইরকে গ্রেপ্তার করার জন্য দুই হাজার সেনা সম্বলিত একটি বাহিনী মক্কার দিকে পাঠিয়ে দিল। বাহিনী

[১]. আল কাসাস। ২৮: ২১।
[২]. আল কাসাস। ২৮: ২১।
[৩]. আল কাসাস। ২৮: ২১, ২২।

মক্কা নগরী অবরোধ করে ফেলে। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যোবাইর সফল প্রতিরোধ গড়ে তুললেন। সেই ঘটনায় এজিদ-বাহিনীর সেনাপ্রধান মৃত্যু বরণ করে। এবং হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে যোবাইর জয়লাভ করেন। হযরত ইমাম হোসাইন কাবা শরীফের সম্মানের খাতিরে সেই যুদ্ধে শরিক হলেন না। তিনি বিরত থাকেন।

কুফাবাসীদের পরামর্শ ও ইমাম আলী মকামের প্রতি আহ্বান :

শেরে খোদা হযরত আলীর শিয়া ও ভক্তদের কেন্দ্র ও ঘাটি ছিল কুফাতেই। কেননা, তিনি তাঁর রাজধানী মদীনা থেকে সরিয়ে এনে কুফাতেই স্থাপন করেছিলেন, তাই তাঁর অনুসারী ও ভক্তরা সেখানে গিয়েই বসবাস করতে আরম্ভ করেন। এরা হযরত আমীরে মুয়াবিয়ার সময়কালেও ইমাম আলী মকামের খেদমতে কুফায় আগমন করার জন্য আবেদন করেছিলেন। এখন যেহেতু তারা এই কথা জানতে পেরেছেন যে, হযরত ইমাম হোসাইন, হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে যোবাইর এবং হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর এজিদের শাসন মেনে নিতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেছেন, আরো জানতে পেরেছেন যে, মক্কার প্রথম যুদ্ধে হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে যোবাইরই জয়ী হয়েছেন, এজিদের বাহিনীকে পরাজিত হওয়ার গ্লানি বইতে হয়েছে, এতে করে তো কুফায় 'শীয়ানে আলীদের জয়গান এমনিতেই হয়ে যায়। তারা জনৈক সোলায়মান বিন সর্দ আল খাযামীকে নিজেদের নেতা মেনে নিলেন। এবং তাঁরই ঘরে একটি পরামর্শ সভার আহ্বান করলেন।

শিয়াদের সকলেই সোলায়মান বিন সর্দ-এর ঘরে জমায়েত হলেন। এবং মুয়াবিয়ার মৃত্যুর কথায় সবাই আল্লাহ্র শুকরিয়া আদায় করলেন। অতঃপর সকলের উদ্দেশ্যে সোলায়মান বিন সর্দ বললেন, 'মুয়াবিয়া মারা গেছেন। ইমাম হোসাইনও এজিদের বশ্যতা অস্বীকার করেছেন। আর মক্কা চলে গেছেন। আপনারা সবাই তাঁর এবং তাঁর পিতারই দল। তাই আপনারা ভালভাবে জেনে রাখুন যে, আপনারা যদি তাঁদের সাহায্যকারী হতে পারেন, দুশমনদের বিরুদ্ধে জেহাদ করতে পারেন, তাহলে তাঁর কাছে পত্র পাঠিয়ে দিন। আর যদি আপনারা নিজেদের দুর্বলতা দেখতে পান এবং অপারগতার সন্দেহ থাকে, তাহলে অন্তত তাঁর সাথে প্রতারণা করবেন না।' সবাই সমস্বরে বললেন, 'আমরা তাঁর সাথে প্রতারণা করব না। আমরা সবাই তাঁর দুশমনদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ব। তাঁর জন্য আমরা প্রাণ দিয়ে দেব।' সোলায়মান বললেন, 'তা হলে আপনারা তাঁর কাছে পত্র লিখুন।' এই কথার উপর তাঁরা ইমাম

হোসাইনের প্রতি এত বেশি হারে পত্র পাঠাতে আরম্ভ করে দিলেন যে, চিঠির পর চিঠি যেতে লাগল। পরবর্তীতে চিঠি নিয়ে দলের পেছনে দলের সারি পড়ে গিয়েছিল।[১]

চিঠিগুলোর বিষয়বস্তু প্রায় এ রকমই ছিল: 'অনতি বিলম্বে আপনি কুফায় চলে আসুন। খেলাফতের মসনদ আপনার জন্য খালি পড়ে আছে। ঈমানদার শিয়াদের সমস্ত ধন-সম্পদ আর শিরগুলো আপনার জন্য নিবেদিত। সবাই আপনার আগমনের অধীর প্রতীক্ষায় আপনাকে দেখার আগ্রহ নিয়ে প্রহর গুণছে। আপনি ব্যতীত আমাদের অন্য কোন ইমাম ও নেতা নাই। আপনার সাহায্যের জন্য বাহিনী প্রস্তুত রয়েছে। কুফার হাকিম নোমান বিন বশীর প্রাশাসনিক ভবনে বসে আছে। আমরা জুমা ও ঈদের নামাজ পড়তে যাই না। আপনি আগমন করলে আমরা তাকে কুফা থেকে বহিষ্কার করে দেব।'[২]

ইমাম হোসাইনের সিদ্ধান্ত :

হযরত ইমাম হোসাইনের কাছে যখন এসব চিঠি এসে ভীড় জমাতে থাকে, তখন তাঁর সাহস ও আত্মসম্মানবোধ দীনি জযবায় রূপ নেয়। তিনি আবশ্যক মনে করলেন, সৎকাজে আদেশ ও অসৎকাজে বারণ করার মানসে জেহাদের পতাকা উড্ডীন করার। কিন্তু বাধা এল। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস, অপরাপর আত্মীয় ও প্রিয়জনসহ কতিপয় উচ্চমানের সাহাবা ও তাবেঈ তাঁর নিকট আবেদন জানালেন, 'হুজুর! আপনি কুফায় যাবেন না। কুফার মানুষ-জন বিশ্বাসঘাতক। তারা আপনার আব্বাজানের সাথেও বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল। নিঃস্ব অবস্থায়, বিদেশেরে মাটিতে তারা তাঁকে নির্যাতনের মুখে শাহাদাতের সুধা ঢেলে দিয়েছিল। এরা তারাই, যারা নিজেদের অত্যাচারী আমীরকে সিংহাসন থেকে না হটিয়েই আপনাকে দাওয়াত দিচ্ছে। তার আনুগত্যের তোক যথারীতি তাদের গলায় এখনো ঝুলে আছে। অথচ তারা আপনাকেও আহবান জানাচ্ছে। এমন যেন না হয় যে, পূর্বের ন্যায় তারা আপনার সাথেও বিশ্বাসঘাতকতা করে বসে।'

ইমাম আলী মকাম তাঁদের কথাগুলো শুনে বললেন, এখন আমার উপর সৎকাজে আদেশ ও অসৎকাজে বারণ সহ সত্যের প্রতি আহবান করার স্বার্থে জেহাদ করা ফরজ হয়ে গেছে। তারা কি বিশ্বাসঘাতক না কি বিশ্বস্ত তা জেনে

১. আত তাবারী, ৬: ২৫।
২. জালাউল হায়ওয়ান, অনুদিত- ২০: ১৩৯।

আমার কাজ নাই। কেয়ামত দিবসে আল্লাহ্‌র দরবারে যখন আমাকে পেশ করা হবে তখনকার সেই প্রশ্নকেই আমার ভয় হচ্ছে যে, তোমাকে তো এমন এক যুগসন্ধিক্ষণেই সত্যের প্রতি আহ্বান করা হয়েছিল, যখন জুলুম, অত্যাচার, নির্যাতন আর বর্বরতার বাজার গরম ছিল। নবীর সুন্নাতের বিপরীতে বিরুদ্ধবাদের ছড়াছড়ি চলছিল। দীন ইসলামে বেদআত ও বাচালতার প্রচলন ঘটাচ্ছিল। মানুষ-জনের অধিকার লঙ্ঘিত হচ্ছিল। স্বাধীনতা ছিনিয়ে নেওয়া হচ্ছিল। ইসলামের রীতি-নীতিগুলো হাসি-তামাশায় পর্যবসিত হচ্ছিল। ইসলামী শাসন ও আইনের ধারণা পরিহাসে রূপ নিয়েছিল। হোসাইন! কেন তুমি সেই সময়ে সেই বিদ্রোহের বিরুদ্ধে জেহাদের ঝাণ্ডা উঁচিয়ে ধর নি?' আপনারা বলুন, আমি সেই সময়ে কী জবাব দেব, কুফাবাসীরা যখন কেয়ামতের দিন আল্লাহ্‌র মহান দরবারে এই কথা বলবে, 'আমরা তো অনেক চেষ্টাই করেছিলাম, কিন্তু ইনি আমাদের কথায় কান দেন নি। তাই এজিদের জুলুম-দমনের মুখে তার বশ্যতা মেনে নিতে আমরা বাধ্য ছিলাম। ইমাম হোসাইন যদি আমাদের দিকে একটু দয়া করতেন, আমরা তাঁর জন্য প্রাণ সঁপে দিতেও রাজি ছিলাম।'

মোটকথা, ব্যাপারটি এমনই ছিল যে, ইমাম হোসাইনের পক্ষে একটি পথই খোলা ছিল, কুফাবাসীদের আহ্বানে সাড়া দেওয়া। যদিও উচ্চ পর্যায়ের সাহাবায়ে কেরামগণ তাঁর এই সিদ্ধান্তে মতামত দেন নি। তাঁদের সকলের মনের মুকুরে ইমাম হোসাইনের অকৃত্রিম ভালবাসাসহ তাঁর শাহাদাতের প্রসিদ্ধির কথা তাঁদের হৃদয়ের স্পন্দনকে আরো বাড়িয়ে তুলছিল। এদিকে ইমাম হোসাইনও উচ্চ পর্যায়ের সাহাবাদের কঠোর বাধাকে উপেক্ষা করার লোক ছিলেন না। কিন্তু কুফাবাসীদের আহ্বানের আবেদনকে পাশ কেটে চলারও শরীয়তভিত্তিক কোন হেতু পান নি। অতএব, ইমাম আলী মকাম ভাবলেন, প্রথমে হযরত মুসলিম বিন আকীলকে দূত হিসাবে কুফায় পাঠাবেন। কুফাবাসীরা যদি তাঁর সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে কিংবা ওয়াদা-খেলাফী করে তাহলে শরীয়তভিত্তিক হেতু পাওয়া যাবে। পক্ষান্তরে তারা যদি নিজেদের অবস্থানে অনড় থাকে, বিশ্বাস ভঙ্গ না করে, তাহলে সাহাবাদেরকে শাত্মনা দেওয়া যাবে। অতএব, তিনি হযরত মুসলিম বিন আকীলকে দূত হিসাবে কুফায় পাঠিয়ে দিলেন। আর বললেন, 'ভাই মুসলিম! কুফায় গিয়ে সেখানকার অবস্থাদি পর্যবেক্ষণ করবেন। এরপর আমাকে পত্র লিখবেন। পরামর্শ দেবেন, সেখানে আমার যাওয়াটা ঠিক হবে কি না? সেখানকার মানুষ-জন এজিদের

বশ্যতা বাদ দিতে এবং আমার বশ্যতা স্বীকার করে নিতে রাজি আছে কি না? ..... তিনি হযরত মুসলিম বিন আকীলের মারফত কুফাবাসীদের চিঠিগুলোর জবাব লিখে পাঠালেন। তিনি লিখলেন, 'আপনারা যা যা আমার কাছে লিখে পাঠিয়েছেন, তার সবকিছু আমি পেয়েছি। আমি আপনাদের নিকট অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি আমার চাচাত ভাই মুসলিম বিন আকীলকে পাঠালাম। তাঁকে আমি বলে দিয়েছি আপনাদের অবস্থার কথা আমাকে লিখে জানাতে। তিনি যদি আমার নিকট এই কথা লিখেন যে, আপনারা আমার কাছে যা লিখেছিলে, তা জাতীয় পর্যায়ের নেতৃস্থানীয় ও গ্রহণযোগ্য লোকদের পরামর্শক্রমেই লিখেছিলেন, তাহলে ইনশা আল্লাহ্ আমি শীঘ্রই আপনাদের কাছে চলে আসব। আমি আমার জীবনের শপথ করে বলছি, সেই ব্যক্তিই ইমাম হবে, যে আল্লাহ্‌র কিতাব অনুযায়ী কাজ করে। ওয়াস্ সালাম।'[১]

ইমাম মুসলিমকে কুফাবাসীদের সাদর সম্ভাষণ :

হযরত মুসলিম বিন আকীল কয়েকজন সাথীসহ নিজের দুই পুত্র মোহাম্মদ ও ইবরাহীমকে সাথে নিয়ে কুফার দিকে রওয়ানা হলেন। কুফায় পৌঁছে তিনি মুখতার বিন ওবাইদের ঘরে অবস্থান করলেন। কুফার 'শীয়ানে আলী'রা তাঁকে শানদার অভ্যর্থনা জানান। আর হযরত ইমাম হোসাইনের প্রতিনিধি হিসাবে দলে দলে লোকজন হযরত মুসলিম বিন আকীলের বশ্যতা স্বীকার করে নিতে থাকেন। প্রথম দিনেই বার হাজারের মত লোক হযরত মুসলিম বিন আকীলের কাছে হযরত ইমাম হোসাইনের পক্ষে বশ্যতা স্বীকার করেন। পরে পরে সংখ্যা আরো বাড়তে থাকে। এক সময় বশ্যতা স্বীকার করা লোকের সংখ্যা আঠার হাজারে উন্নীত হয়। তিনি মানুষ-জনের ভক্তি, শ্রদ্ধা, ভালবাসা ও অকৃত্রিম আগ্রহের টান দেখে হযরত ইমাম হোসাইনের নিকট পত্র লিখে পাঠালেন, 'ভাই হোসাইন! হকের দাওয়াত ও সৎকাজে আদেশ দেওয়ার মত সুন্দর পরিবেশ এখানে বিরাজিত আছে। আপনি কোনরূপ উদ্বেগ উৎকণ্ঠা ছাড়াই নির্দ্বিধায় এখানে চলে আসুন।'[২]

এজিদকে অবহিত করণ :

তখন কুফার গভর্নর ছিলেন নোমান বিন বশীর। তিনি হযরত মুসলিম বিন আকীলের পথে কোন ধরনের প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেন নি। সবকিছু তিনি

১. ইবনে আছীর, ৪: ২১।
২. আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৮: ১৫২।

নীরবেই সয়ে নিয়েছিলেন। এজিদ প্রশাসনের পক্ষীয়রা যখন বুঝতে পারল যে, তক্তা উল্টে যাওয়ার উপক্রম, তখন তারা নোমান বিন বশীরের কাছে এসে বলল, 'এদিকে কুফা নগর থেকে এজিদের শাসনকে উচ্ছেদ করে দেওয়া হচ্ছে। ইমাম হোসাইনের পক্ষে মানুষ-জন দলে দলে মুসলিম বিন আকীলের বশ্যতা মেনে নিতে চলেছে। আর আপনি নীরবে তামাশা দেখছেন। আপনি এক্ষুণি মুসলিম বিন আকীলকে গ্রেপ্তার করে কতল করে ফেলুন। ফিতনা-ফাসাদের সব আশঙ্কা খতম করে দিন।'

নোমান বিন বশীর বললেন, 'কেউ যদি আমার সাথে যুদ্ধে না নামে, আমিও তার বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামব না। কেউ যদি আমাকে আক্রমণ না করে, আমিও তাকে আক্রমণ করব না। কেবল ধারণার বশবর্তী হয়ে আমি কাউকে গ্রেপ্তার করব না। তবে লা শরীক আল্লাহ্‌র শপথ, আপনারা যদি আপনাদের আমীর থেকে আলাদা হয়ে যান, তার বশ্যতা পরিহার করেন, তা হলে আমি আপনাদের সাথে সেই পর্যন্ত লড়তে থাকব, যতক্ষণ আমার হাতে এই তরবারির হাতল ধরা থাকবে।' এ কথা শুনে জনৈক আবদুল্লাহ্ ইবনে মুসলিম বলল, 'হে আমীর! অন্ধ লাঠি না হলে এর মীমাংসা হবে না। আপনি যে পথ নিয়েছেন, তা দুর্বলদেরই।' এতদশ্রবনে নোমান বললেন, 'আল্লাহ্ তা'আলার আনুগত্যে দুর্বলচিত্ত থাকা, তাঁর বিরোধিতায় শক্তিধর থাকার চেয়ে আমার কাছে অত্যধিক পছন্দনীয়।'

এজিদের বাহিনীরা যখন দেখতে পেল যে, নোমান বিন বশীর হযরত ইমাম মুসলিম বিন আকীলের বিরুদ্ধে কোনরূপ উদ্যোগ নিতে রাজি নন, এদিকে হাজার হাজার লোক তাঁর বশ্যতা মেনে নিচ্ছে, তারা তখন এজিদের কাছে একটি দল পাঠাল। তারা বলল, নোমান বিন বশীর সত্যিকার অর্থে আপনার রাজত্বের উপাকর সাধনে অঙ্গীকারাবদ্ধ নন। ইমাম হোসাইনের আগমনের অপেক্ষায় আছেন। এদিকে ইমাম মুসলিম বিন আকীলের পক্ষে দলে দলে লোক বশ হয়ে যাচ্ছে। কুফা আর বসরা আপনার নেতৃত্ব ও কর্তৃত্বের বাইরে চলে যেতে বসেছে। এর একটা তড়িৎ ব্যবস্থা নিতে হবে।'

নোমান বিন বশীরকে বরখাস্ত, ইবনে যিয়াদকে পদায়ন :

কুফার সুরতহাল সম্পর্কে অবহিত হয়ে এজিদ তার বংশীয় গোলাম সারজুনকে ডেকে পাঠাল। সারজুন ছিলেন হযরত আমীরে মুয়াবিয়ার নির্ভরযোগ্য ভৃত্য এবং তাঁর বংশের রহস্যজানা লোক। এজিদ তার কোলেই লালিত-পালিত

হয়েছিল। এজিদ এই রহস্যজানা গোলামটির কাছে সব কথা খুলে বলল। তার পর জিজ্ঞসা করল, 'এখন আমাকে কী করতে হবে?' সারজুন বললেন, 'আজ যদি আমীরে মুয়াবিয়া জীবিত থাকতেন, তা হলে আপনি কি তাঁর পরামর্শকে মেনে নিতেন?' এজিদ বলল, 'অবশ্যই'। সারজুন বললেন, 'তা হলে আমার এই পরামর্শটিও গ্রহণ করে নিন যে, কুফার শাসনের জন্য ওবাইদুল্লাহ বিন যিয়াদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ কোন ব্যক্তি নাই। তাই কুফার শাসনও তাঁর হাতেই ন্যস্ত করে দিন।'[১]

ইবনে যিয়াদ বসরার গভর্নর ছিলেন। কুফায় 'শীয়ানে আলী' ও হোসাইনের দলের প্রতাপ ভেঙ্গে দেওয়ার জন্য এজিদ তাকে কুফারও গভর্নর বানিয়ে দেয়। তার নিকট নির্দেশনামা পাঠিয়ে দেয়, 'আপনি কুফায় গিয়ে মুসলিম বিন আকীলকে খুঁজে বের করুন। তাঁকে যখন ধরতে পারবেন, হত্যা করে ফেলবেন অথবা দেশান্তর করে দেবেন।'[২]

বসরায় যেদিন ইবনে যিয়াদের হাতে এজিদের নির্দেশনামাটি এসে পৌঁছাল, সেই দিন ইমাম হোসাইনের দূতও বসরাবাসীদের প্রতি তাঁর একটি চিঠি নিয়ে আসেন। কেননা, বসরাবাসীও তাঁর প্রতি আকৃষ্ট ছিলেন। চিঠিতে তিনি বসরাবাসীদের প্রতি লিখেছিলেন, 'আমি আপনাদের কাছে আমার এই দূতটি মারফত এই চিঠিখানি পাঠালাম। আমি আপানাদেরকে আল্লাহ্‌র কিতাব ও তাঁর নবীর দিকে আহ্বান করছি। কেননা, সুন্নাত মিটিয়ে দেওয়া হয়েছে, বেদআত চালু করে দেওয়া হয়েছে। আপনারা যদি আমার কথা শুনুন আর আমার পতাকার তলে এসে সমবেত হোন, তাহলে আমি আপনাদেরকে হেদায়তের পথে পরিচালিত করব।'

বসরা নগরীর নেতৃস্থানীয় যে লোকটি ইমাম হোসাইনের চিঠিখানি পড়লেন, তিনি সেটি গোপন রাখলেন। কিন্তু মনজর বিন জারূদের সন্দেহ হল, দূত ওবাইদুল্লাহ্ ইবনে যিয়াদের গুপ্তচর হয়ে থাকবে। আর পরীক্ষামূলকভাবে সে তাকে বসরার উচ্চস্থানীয় লোকদের কাছে পাঠিয়েছে। যেদিন রাতে ইবনে যিয়াদের কুফায় রওয়ানা হওয়ার কথা সেই রাতে মনজর বিন জারূদ দূতটিকে ইবনে যিয়াদের কাছে নিয়ে এল। এবং চিঠিটি তাকে পড়তে দিল। ইবনে যিয়াদ তখন হযরত ইমাম হোসাইনের দূতটিকে কতল করিয়ে দেয়। এবং

১. আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া। ৮: ১৫৬।
২. আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া। ৮: ১৫৬। ইবনে আছীর। ৪: ২৩।

বসরার জামে মসজিদে লোকদের সামনে কঠোর ধমকি দিয়ে বক্তব্য দেয়। সে বলে:

'আল্লাহ্‌র কসম, আমাকে কোন বিপদ-আপদ দিয়ে ভয় দেখানো যাবে না। কঠোর কিছুতেও আমি ভয় পাই না। নৃশনের অস্ত্রের ঝনঝনাতিও আমি ডরাই না। আমার সাথে যে শত্রুতা পোষণ করে আমি তার জন্য ভীম। যে আমার সাথে যুদ্ধ করে আমি তার জন্য যুদ্ধানল। আমাকে আমীরুল মুমিনীন (এজিদ) কুফার অভিভাবকত্ব সমর্পন করেছেন। আগামীকাল আমি সেখানে গমন করব। আমার পরবর্তীতে ওসমান বিন যিয়াদ বিন আবু সুফিয়ানকে তোমাদের জন্য আমার প্রতিনিধি রেখে গেলাম। তোমরা পরস্পর বিরোধ মনোভাব পরিহার কর, বিদ্রোহ ভুলে যাও। অন্যথায় সেই মহান সত্তার শপথ, যিনি ব্যতীত আর কোন খোদা নাই, আমার নিকট যদি তোমাদের কারো বিরোধিতার সংবাদ আসে, তা হলে আমি তাকে, তার কোন মদদদাতা ও বন্ধুদেরকেও রেহাই দেব না। কোন সুরাহা না হওয়া পর্যন্ত এবং তোমাদের কেউ বিরোধিতাকারী কিংবা অভিসন্ধিকারী না থাকা পর্যন্ত আমি দূরেরগুলো বাদ দিয়ে কাছেরগুলোকে পাকড়াও করব (অর্থাৎ ঘটনাস্থলে উপস্থিত অপরাধীদের ওয়ারিশ ও মদদদাতাদের পাকড়াও করব)। মনে রাখবে, আমি আমার বাবারই মত। সেই বাবার সন্তান আমি যেই বাবা কঙ্কর আর পাথর পদদলিত করেছিলেন।[১]'

ইবনে যিয়াদের কুফায় প্রবেশ :

ওবাইদুল্লাহ্ ইবনে যিয়াদ পরিবার-পরিজন সহ পাঁচ শত আরোহী সাথে নিয়ে বসরা থেকে কুফার প্রতি রওয়ানা দিল। তাদের কেউ কেউ মাঝপথ থেকেই ফিরে আসে। কোন পরোয়া না করে সে বরাবরই চলতে থাকে। 'কাদসিয়া' নামক স্থানে এসে সে কেবল সতেরজন ব্যক্তিকে নিজের সাথে রাখল। বাকিদেরকে সেখানেই ছেড়ে দিল। এবং মাথায় কালো পাগড়ীর গ্যাটার বেঁধে নগরীতে প্রবেশ করল (যাতে করে লোকেরা ভুল করে এই কথা বুঝে যে, ইমাম হোসাইন এসে গেছেন)। সে কোন জমায়েত দেখলেই 'আস সালামু আলাইকুম' বলতে থাকে। এদিকে যেসব লোক ভুল করে তাকে ইমাম হোসাইন বলে মনে করেছিল, তারা জবাবে বলতে লাগলেন 'ওয়া আলাইকুমুস

[১]. আত তাবারী। ২: ২৫। আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া। ৮: ১৫৮। ইবনে আছীর। ৪: ২৩।

সালাম। মারহাবা এয়া ইবনা রসুলিল্লাহ্!!' (ওয়া আলাইকুমুস সালাম! খোশ আমদেদ! হে আল্লাহ্‌র রাসূলের পুত্র!!)। কেননা, তাঁরা ইমাম হোসাইনেরই অপেক্ষায় ছিলেন। ইবনে যিয়াদ সতেরজন আরোহীকে সাথে নিয়ে নগরীতে প্রবেশ করে। কিন্তু তাদের চারপাশে অসংখ্য লোক জমায়েত হয়ে যায়। এতে মুসলিম বিন আমর লোকদের উদ্দেশ্যে বললেন, 'পরে আসিও; এ তো দেখছি আমীর ওবাইদুল্লাহ্ ইবনে যিয়াদই।' এ কথা শুনে লোকজন মনে ব্যথা পেলেন। তাঁদের মন ভেঙে গেল। সঙ্গে সঙ্গে ওবাইদুল্লাহ্‌র কাছেও সেই সংবাদের সত্যায়ন হয়ে গেল, এজিদ যা মুসলিম বিন আকীলের আগমন ও ইমাম হোসাইনের বশ্যতা সম্পর্কে পেয়েছিল।

যখন ইবনে যিয়াদ কুফার প্রাশাসনিক ভবনের তোরণ দ্বারে মাথায় গ্যাটার বাঁধা অবস্থায় এসে পৌঁছাল, তখন হযরত নোমান বিন বশীর মনে করলেন যে, হযরত ইমাম হোসাইনই আগমন করেছেন। তিনি ভবনের দ্বার বন্ধ করে দিলেন। আর বললেন, 'আমি আমার প্রশাসনকে আপনার হাতে তুলে দেব না। আর আপানর বিরুদ্ধে যুদ্ধও করব না।' ইবনে যিয়াদ বলল, 'দরজা খুলে দাও, অন্যথায় আমি নিজেই খুলে ফেলব।' নোমান দরজা খুলে দিলেন। তখনও তিনি মনে করছিলেন যে, ইনি হযরত হোসাইনই। কিন্তু তিনি যখন সত্য সত্য বুঝতে পারেন যে, এ ওবাইদুল্লাহ্, তখন খুবই লজ্জিত হয়েছিলেন।[১]

প্রশাসনিক ভবনে প্রবেশের পর ইবনে যিয়াদ সবাইকে আহ্বান করার নির্দেশ দিল। আহ্বান করা হল। লোকজনও জমায়েত হল। ইবনে যিয়াদ প্রশাসনিক ভবন থেকে বের হয়ে লোকদের সামনে এল। আল্লাহ্ তা'আলার হামদ ও সনার পর সে বলল:

'আমীরুল মু'মিনীন (এজিদ) আমাকে তোমাদের বিষয়-আশয়, তোমাদের বিচার-আচার এবং তোমাদের সম্পদ-সম্পত্তির উপর শাসক বানিয়ে পাঠিয়েছেন। তিনি আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন তোমাদের মাঝে যারা অত্যাচারিত তাদের পক্ষে দাঁড়াতে, অভাবীদের দান-দক্ষিণা করতে, বাধ্য ও অনুগতদের প্রতি উদারতা প্রদর্শন করতে, আর তোমাদের মধ্যে যারা সন্দেহবাদী ও অবাধ্য তাদের উপর কঠোর হতে। তোমাদের উপর আমি তাঁর নির্দেশ কার্যকর করব। এবং তোমাদেরকে তাঁর বিধি-বিধানের অনুগত করিয়ে নেব।[২]'

[১]. আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া। ৮: ১৫৩।
[২]. আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া। ৮। ইবনে আছীর। ৪: ২৪।

ভাষণটির পর ইবনে যিয়াদ কুফার নেতৃস্থানীয় লোকজনদের গ্রেপ্তার করে ফেলল। তাদের সকলের নিকট সে মুসলেকা তলব করল যে, তাদের গোত্রের লোকজন প্রশাসনের বিরুদ্ধ শক্তির কোন ব্যক্তিকে নিজেদের কাছে আশ্রয় ও প্রশ্রয় দেবে না। প্রশাসনের বিরুদ্ধে কোন ধরনের বিরোধিতায় অংশ গ্রহণ করবে না। কেউ যদি প্রশাসনের বিরুদ্ধ শক্তির কাউকে আশ্রয় দিয়ে থাকে, তাহলে তাকে এনে হাজির করবে। যে ব্যক্তি নিজের দেওয়া মুসলেকা ভঙ্গ করবে না, সে নিপরাধ সাব্যস্ত হবে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি এর ব্যত্যয় করবে, তার জীবন ও সম্পদ উভয় নিরাপত্তাহীন হয়ে যাবে। তাকে কতল করে তারই দরজায় ঝুলিয়ে দেব। তার সাথে সংশ্লিষ্ট কেহই রেহাই পাবে না।'

ইবনে যিয়াদের আগমনে, ভীতি প্রদর্শনে এবং তার হুমকি-ধমকিতে কুফাবাসী ভীত হয়ে পড়েন। তাদের মনে পরিবর্তন আসে। সেই অবস্থার প্রেক্ষিতে হযরত মুসলিম বিন আকীল মুখতার বিন ওবাইদার গৃহে অবস্থান করা ভাল মনে করলেন না। রাতের বেলায় সেখান থেকে বেরিয়ে গিয়ে তিনি হানী বিন ওরওয়ার নিকট চলে আসেন। হানী ছিলেন কুফার শীর্ষস্থানীয় একজন নেতা। আর তিনি ছিলেন আহলে-বাইতের প্রতি সদয়। হানীর কাছে তাঁর আগমন ভাল লাগল না। তিনি বললেন, 'আপনি এখানে না এলেই তো পারতেন।' তিনি বললেন, 'আমি নবী-বংশেরই একজন ভিনদেশী মুসাফির। আপনি আমাকে আশ্রয় দিন।' হানী বললেন, 'আপনি যদি আমার গৃহে প্রবেশ না করে ফেলতেন, তাহলে বলতাম, আপনি চলে যান। কিন্তু এখন তা আমার আত্মসম্মানে বাধছে।' এই বলে হানী তাঁকে মহিলাদের অন্দরমহলে একটি সংরক্ষিত কক্ষে গোপন করে রাখলেন।[১]

শুরাইক বিন আওয়র ছিলেন একজন নেতা গোছের লোক। তিনি ছিলেন তখন অসুস্থ। তিনি জানতে পেরেছিলেন যে, ওবাইদুল্লাহ্ তাঁকে দেখতে আসছেন। তিনি হানীকে সংবাদ পাঠালেন, 'হযরত মুসলিম বিন আকীসকে আমার নিকট পাঠিয়ে দিন। তাহলে ইবনে যিয়াদ আমাকে রোগী দেখতে আসলে মুসলিম বিন আকীলের হাতে তাকে কতল করিয়ে দেব।' হানী তাঁকে শুরাইক বিন আওয়রের নিকট পাঠিয়ে দিলেন। শুরাইক হযরত মুসলিম বনি আকীলকে বললেন, 'আপনি গোপনে বসে থাকুন। ওবাইদুল্লাহ্ যখন আমাকে দেখতে আসবে আর বসবে, তখন আমি পানি খুঁজব। এ কথাটি আপনার জন্য ইঙ্গিতের

১. ইবনে আছীর। ৪: ২৫।

কাজ করবে। ঠিক সেই মুহূর্তে বিলম্ব না করেই আপনি আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে তাকে কতল করে দেবেন।'

ওবাইদুল্লাহ্ এসেই শুরাইকের বিছানায় বসে গেলেন। তখন শুরাইকের কাছে পানিও ছিল। ওবাইদুল্লাহ বিন যিয়াদের সামনে তার ভৃত্যটিও দাঁড়িয়ে ছিল। কিছুক্ষণ ধরে তাঁরা কথাবার্তা বললেন। এরপর শুরাইক বললেন, 'আমাকে পানি দাও'। কিন্তু হযরত মুসলিম বিন আকীল যিয়াদকে কতল করার জন্য বের হলেন না। বাঁদী পানির মশক নিয়ে হাজির হল। কিন্তু হযরত মুসলিম বিন আকীলকে গোপনে বসে থাকতে দেখে লজ্জা পেয়ে গেল। সে পানির মশক হাতে তিনবার করে পেছন দিকে ফিরে গেল। শুরাইক আবারা আওয়াজ দিলেন, 'আমাকে পানি দাও, হায়, তেষ্টায় আমার প্রাণ গেল রে, তোমরা কি আমাকে পানি পান করতে না দিয়ে মারবে?' মেহরান তার ষড়যন্ত্র বুঝে নিল। সাথে সাথে মুনিবকে ইশারা করেই দাঁড়িয়ে গেল। ইবনে যিয়াদ ভৃত্যের ইঙ্গিতে তৎক্ষণাৎ দাঁড়িয়ে গেল। যেই সে বেরিয়ে যেতে চাচ্ছিল, এমন সময় তাকে দাঁড়ানোর জন্য বললেন, 'হে আমীর! আমি আপনাকে কিছু অছিয়ত করতে চাই।' ইবনে যিয়াদ বলল, 'আমি পরে আবার আসব'। এই বলে সে বেরিয়ে গেল। ভৃত্যটি তাকে বাহনে বসিয়ে খুবই দ্রুত তাকে সেখানে থেকে সরিয়ে নিয়ে গেল। অতঃপর সে মালিককে বলল, 'হে আমীর! ওরা তো আপনাকে হত্যাই করতে চেয়েছিল।' সে বলল, 'হায়, হায়! আমি গেলাম তাদের ভালর জন্য, তারা কি না এ রূপ করত পারল?'

ইবনে যিয়াদের চলে যাওয়ার পর হযরত মুসলিম বিন আকীল আড়াল থেকে বের হয়ে এলেন। শুরাইক জিজ্ঞাসা করলেন, 'আড়াল থেকে এসে তাকে হত্যা করাতে আপানাকে কিসে বাধা দিয়েছিল?' হযরত মুসলিম জবাবে বললেন, 'রাসূলুল্লাহ্র একটি হাদিস, যা আমি শুনেছি, তিনি বলেছেন, 'ঈমান শঠতামূলক হত্যা করার বিপরীত বিষয়।' মুমিনরা কখনো শঠতামূলক হত্যা করে না। এ বিষয়টিও আমার ভাল লাগে নি যে, আমি তাকে আপনারই গৃহে হত্যা করব। শুরাইক বললেন, 'আপনি যদি তাকে হত্যা করে ফেলতেন, তাহলে কুফার এই প্রশাসনিক ভবনটি দখল করার ক্ষেত্রে কেউ আপনার বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারত না। বরং বসরাও আপনার হাতের মুঠোয় এসে যেত। তাছাড়া তাকে হত্যা করার মাধ্যমে দুনিয়া হতে একজন জালিম ও ফাজির লোক বিদায় হয়ে যেত।'[১]

১. আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া। ৮: ১৫৩।

তিন দিন পর শুরাইকের মৃত্যু হয়। তাঁর জানাযার নামাজ পড়ায় ইবনে যিয়াদ। পরে যখন সে জানতে পারে যে, শুরাইকই হযরত মুসলিম বিন আকীলকে তাকে হত্যা করার জন্য উদ্বুদ্ধ করেছিলেন, তখন সে বলেছিল, 'আল্লাহ্‌র কসম, আমি কোন ইরাকবাসীর জানাযা পড়ব না। আমার পিতার কবর যদি এখানে না হত, তাহলে আল্লাহ্‌র কসম, আমি অবশ্যই শুরাইকের কবর খুঁড়াতাম।'[১]

হযরত মুসলিম বিন আকীলকে খোঁজ :

হযরত মুসলিম বিন আকীল হানীর গৃহে আত্মগোপন ছিলেন। তাঁর ভক্তবৃন্দ গোপনে তাঁর কাছে আসা-যাওয়া করতেন। বাইয়াতের ধারাবাহিকতাও এভাবে চালু ছিল। এদিকে ইবনে যিয়াদ বরাবরই চর নিয়োগ করে গোপন ভিত্তিতে খবর সংগ্রহ করছিল যে, হযরত মুসলিম বিন আকীলকে কে আশ্রয় দিয়েছে। তাঁকে কীভাবে খুঁজে বের করা যা। অবশেষে সে তার এক ভৃত্যকে ডেকে আনল। তিন হাজার দিরহাম তার হাতে তুলে দিয়ে বলল, 'তোমার কাজ হল মুসলিম বিন আকীল সহ তাঁর সাথীদের খুঁজে বের করা। তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করা এবং তাঁকে এই মুদ্রাগুলো দিয়ে বলা যে, তুমিও একজন আহ্‌লে-বাইতদের ভালবাস।' অতএব, ভৃত্যটি জামে মসজিদে হযরত মুসলিম বিন আওসাজার কাছে এল। তিনি তখন নামাজ পড়ছিলেন। ভৃত্যটি লোকজনের মুখে শুনল যে, এই লোকটিই ইমাম হোসাইন রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হুর প্রতিনিধি রূপে লোকজন থেকে সম্মতি নিচ্ছেন। তিনি যখন নামাজ থেকে ফারেগ হলেন, ভৃত্যটি সেই মুসলিম বিন আওসাজাকে উদ্দেশ্য করে বলল, 'হে আল্লাহ্‌র বান্দা! আমি একজন সিরিয় লোক। আল্লাহ্‌র এক বিশেষ করুণা যে, আমি আহলে বাইতদের ভালবাসি। আমার হাতে এই তিন হাজারটি দিরহাম রয়েছে। আহ্‌লে-বাইতের সদস্যটির হাতে এই দিরহামগুলো হাদিয়া স্বরূপ তুলে দিয়ে তাঁর হাতে বাইয়াত হতে চাই। আমি যা জানি, তিনি মক্কা থেকেই এই কুফা নগরীতে এসেছেন। আর রাসূলের দৌহিত্র ইমাম হোসাইন রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হুর পক্ষে বাইয়াত নিচ্ছেন। আমি আরো শুনেছি, আপনি জানেন যে, তিনি এখন কোথায় এবং কোন ঘরে আছেন। আপনার কাছে আমার আবেদন যে, আপনি আমার এই বাসনা পূরণে সহযোগিতা করুন। আপনি দয়া করে আমাকে তাঁর কাছে নিয়ে চলুন।'

১. ইবনে আছীর ৪: ২৭।

হযরত মুসলিম বিন আওসাজা ভৃত্যের ভক্তি দেখে আনন্দিত হলেন। বললেন, 'আপনি যাঁকে ভালবাসেন, তাঁকে অবশ্যই পেয়ে যাবেন। আপনার মাধ্যমে নবীর আহ্‌লে-বাইতকে আল্লাহ্ তা'আলা সাহায্য করবেন।'

মুসলিম বিন আওসাজা নিশ্চিন্তে প্রতারক ভৃত্যটিকে হযরত মুসলিম বিন আকীলের নিকট নিয়ে যান। সে সেখানে একটানা পনের দিন অবস্থান করে হযরত মুসলিম বিন আকীলের উঠা-বসাসহ তাঁর প্রতি লোকজনের বাইয়াতের সরগরম অবস্থাদি সম্পর্কে ভালভাবে জেনে নিতে লাগল। ভৃত্যটি মুসলিম বিন আকীলের নির্দেশে ইবনে যিয়াদের দেওয়া সবগুলো দিরহাম আরবের প্রসিদ্ধ শাহসওয়ার ছামামা আমেরীর হাতে তুলে দিলেন। তিনি ছিলেন ইমামের পক্ষে কালেক্টার ও অস্ত্র-শস্ত্র ক্রয়ের কাজে দায়িত্বপ্রাপ্ত। ভৃত্যটি চলে এসে হযরত মুসলিম বিন আকীলের অবস্থান ও তাঁর আশ্রয়দাতার ঠিকানা ইত্যাদি সহ লোকজন কর্তৃক তাঁর হাতে বাইয়াত গ্রহণের সব কথা খুলে বলল।[১]

হানীকে গ্রেপ্তার :

হানী বিন ওরওয়া ছিলেন কুফার একজন নামজাদা নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিত্ব। প্রথম থেকেই ইবনে যিয়াদের সাথে তাঁর সম্পর্ক ছিল। হযরত মুসলিম বিন আকীলের আগমনের পূর্বে ইবনে যিয়াদের কাছে তাঁর আনাগোনা ছিল। হযরত মসলিম বিন আকীল তাঁর গৃহে অবস্থান নেওয়ার পর থেকে তিনি অসুস্থতার অজুহাতে ইবনে যিয়াদের সাথে মেলামেশা পরিহার করে দিয়েছিলেন। ইবনে যিয়াদ যেহেতু সব বিষয় সম্পর্কে ভালভাবেই অবহিত হয়েছিল, তাই একদা সে হানীর কথা তুলে বলল, 'অন্যান্য নেতা-নেতৃদের সাথে হানী এখন আমার কাছে আসে না কেন?' সবাই বলল, 'তিনি বর্তমানে অসুস্থ।' ইবনে যিয়াদ বলল, 'আমি জানতে পেরেছি যে, তিনি এখন গৃহের দরজায় বসে থাকেন।'

এরপর নেতৃগোছের কিছু লোক হানীর গৃহে গেলেন। তাঁকে বললেন, 'আপনার ব্যাপারে ইবনে যিয়াদের কিছু কুধারণা সৃষ্টি হয়েছে। তাই আপনি আমাদের সাথে আসুন। ভুল-বুঝাবুঝির নিরসন হয়ে যাক।' এই কথা শুনে হানী গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করলেন। হযরত মুসলিমের সাথে কথাবার্তা বললেন। এরপর প্রস্তুত হয়ে তিনি নেতাদের সাথে ইবনে যিয়াদের নিকট গেলেন। প্রশাসনিক ভবনে পৌঁছতেই হানী যখন ইবনে যিয়াদকে সালাম দিলেন, তখন সে তাঁর সালামের জবাব দিল না। হানী এই অনিয়ম দেখে হতবাক হলেন,

১. আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া। ৮: ১৫৩।

তাঁর মনের ভেতর খটকা পয়দা হল। কিছুক্ষণ পর ইবনে যিয়াদ বলল, 'হানী! মুসলিম বিন আকীল লোকটি এখন কোথায়?' হানী বললেন, 'আমি জানি না।' সাথে সাথে সেই ইয়ামানী ভৃত্যটি উঠে দাঁড়াল, যে হামসের (সিরিয়ার) মুসাফিরের ছদ্মবেশে হানীর গৃহে অবস্থান করেছিল, যে হানীর চোখের সামনেই মুসলিম বিন আকীলের হাতে বাইয়াত হয়েছিল, তিন হাজার দিরহামের নজরানাও পেশ করেছিল। ইবনে যিয়াদ জিজ্ঞাসা করল, 'আপনি কি একে চিনতে পাচ্ছেন?' হানী বললেন, 'হাঁ।' ভৃত্যটিকে দেখে তিনি লজ্জিত হয়ে বললেন, 'হে আমীর! আল্লাহ্! আপনার মঙ্গল করুন। আল্লাহ্র কসম, আমি তাঁকে আমার গৃহে দাওয়াত দিয়ে আনি নি। তিনি বরং নিজ থেকেই আমার গৃহে এসেছিলেন। ইবনে যিয়াদ বলল, 'আপনি এখন তাঁকে এখানে নিয়ে আসুন।' হানী বললেন, 'আল্লাহ্র কসম, তিনি যদি বর্তমানে আমার পায়ের নিচেও অবস্থান করতেন, তবু আমি তাঁর উপর থেকে আমার পা উঠিয়ে নিতাম না।' এ কথা শুনে ইবনে যিয়াদ বলল, 'একে আমার কাছে নিয়ে আস।' হানীকে যখন ইবনে যিয়াদের নিকটে নিয়ে যাওয়া হল, সে তখন হানীর চেহারায় বর্শার খোঁচা মারল। তিনি নাকে ও মুখে আঘাত পেলেন। একজন সেপাহীর হাত থেকে তরবারি ছিনিয়ে নিয়ে ইবনে যিয়াদের উপর হামলার উদ্যত হতেই লোকজন হানীকে ধরে ফেলল। ইবনে যিয়াদ বলল, 'এখন আপনি নিজের জীবনকে আমার জন্য হালাল করে দিলেন। কেননা, আপনি একজন হারূরী লোক (খারেজী)।' অতঃপর ইবনে যিয়াদের নির্দেশে তাঁকে একটি কক্ষে বন্দী করে রাখা হল।

হানীর স্বগোত্রীয় বনী মাযাজ্জাহ্গণ তাঁকে হত্যা করে ফেলা হয়েছে জেনে প্রশাসনিক ভবনের তোরণদ্বারের সামনে এসে জড়ো হয়ে গেলেন। ইবনে যিয়াদ তাঁদের হৈ-হট্টগোল শুনে তার কাছে বিদ্যমান কাজী শুরাইহকে বলল, 'আপনি তাঁদের কাছে গিয়ে বলুন যে, মুসলিম বিন আকীল সম্বন্ধে জিজ্ঞাসাবাদ করার জন্য আমীর তাঁকে কেবল বন্দীই করে রেখেছেন।' কাজী শুরাইহ্ তাঁদের নিকট গিয়ে বললেন, 'আপনাদের নেতা জীবিত আছেন। আমীর তাঁকে সামান্যই আঘাত করেছেন। আপনারা চলে যান। নিজেদের এবং নেতার ধ্বংস ডেকে আনবেন না।' এ কথা শুনে সবাই ফিরে গেলেন।

হযরত মুসলিম বিন আকীল এ কথা শোনার সাথে সাথে আরোহী বেশে বেরিয়ে এলেন। ভক্ত-অনুরক্তদের সাহায্যের জন্য আহ্বান জানালেন। মুহূর্ত মধ্যেই চার হাজার কুফাবাসী তাঁর চতুর্দিকে জড়ো হয়ে গেলেন। তিনি তাঁদের সাথে

নিয়ে ইবনে যিয়াদের দিকে ছুটে চললেন। পথে পথে তিনি হানীর ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করেত থাকেন। সবাইকে তিনি এর প্রতিবাদে সোচ্চার হবার উদ্বুদ্ধ করতে থাকেন। এমন সময় প্রশাসনিক ভবনের রক্ষকেরা তাঁকে দেখে ফেলে। তারা চিৎকার দিয়ে ওঠে, 'মুসলিম বিন আকীল এসে গেছেন।' ইবনে যিয়াদ ও তার সাঙ্গ-পাঙ্গরা পালিয়ে গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করল। দরজা বন্ধ করে দিল। হযরত মুসলিম বিন আকীল তাঁর সৈন্য-সামন্ত সহ ভবনের তোরণদ্বারের সম্মুখে এসে দাঁড়িয়ে গেলেন।

বিভিন্ন গোত্রের যেসব সর্দার সেই সময়ে ইবনে যিয়াদের নিকট বিদ্যমান ছিল, তারা সবাই ইবনে যিয়াদের নির্দেশে ভবনের দেওয়ালগুলোতে উঠে মুসলিম বিন আকীলের সাথে থাকা নিজ নিজ গোত্রের লোকদেরকে চলে যাওয়ার জন্য ইঙ্গিত করল। আর ইঙ্গিতের মাধ্যমে কিছু ওয়াদাও নিল এবং ভয়ও দেখাল, হুমকিও দিল। তাছাড়া অন্যান্যদেরকে মুসলিম বিন আকীলের সহায়তা থেকে সরিয়ে রাখার জন্য এবং সাঙ্গ-পাঙ্গদের সাহস যোগানোর জন্য কিছু সর্দারদেরকে ইবনে যিয়াদ ভবন থেকে বেরও করে দিল। যাতে তারা সফল হয়। তারা স্ব-পক্ষীয়দের সাহস যোগানোর জন্য কিছু কৌশলও গ্রহণ করল। যেমন, কোন মহিলাকে তার পুত্র বা ভাইদের কাছে পাঠিয়ে তাদেরকে ইমামের সঙ্গ ত্যাগ করে ফিরে যাওয়ার জন্য উদ্বুদ্ধ করাল, বলাল, 'তোমরা ছাড়াও আকীলের পক্ষে অনেক লোকজন আছে। তোমরা ফিরে আসাতে তাঁর তেমন কোন অসুবিধা হবে না।' কিছু কিছু লোকজন তাদের প্রিয়জনদের কাছে এসেছিল। তারা তাদেরকে সিরিয় বাহিনীর শক্তির ভয় দেখাল। সিরিয়া থকে বাহিনী রওয়ানা হওয়ার কথা বলল। ফিরে না এলে সিরিয় বাহিনীর সাথে মোকাবেলার শিকার হবার কথা বলল এবং ভয়াবহ পরিণতিরও ভয় দেখাল। ফলে ক্রমে লোকজন মুসলিম বিন আকীলের সঙ্গ ত্যাগ করা আরম্ভ করে দিল। আর মাগরিবের নামাজের সময়ে দেখা গেল মুষ্টিমেয় ত্রিশজন ব্যক্তি ছাড়া সবাই চলে গিয়েছিলেন। তিনি সেই ত্রিশজনকে নিয়েই মাগরিবের নামাজ আদায় করে ফিরে যাওয়ার ইচ্ছা করলেন। ফিরে যাওয়ার সময় তাঁর সাথে বরাবরই কেবল ত্রিশ জন ব্যক্তিই ছিলেন। ফিরে যাওয়ার পর দেখা গেল শুধু দশজন। কিছু দূর যাওয়ার পর তিনি একাই হয়ে গেলেন। ব্যাপার প্রায় এরূপই ছিল যে, তাঁকে পথ দেখানোর জন্যও কেউ ছিল না, একটু সহানুভূতি দেখানোর জন্যও কেউ ছিল না। অবশেষে অন্ধকার নেমে আসে। দুশ্চিন্তাগ্রস্ত অবস্থায় পথ চলতে চলতে তিনি 'তূয়া' নামের এক মহিলার দ্বারপ্রান্তে এসে উপস্থিত হলেন।

মহিলাটি ঘরের দরজায় বসে বসে পুত্র বেলালের জন্য অপেক্ষা করছিলেন। হযরত মুসলিম বিন আকীল মহিলাটিকে দেখে বললেন, 'আমাকে পানি দিন।' মহিলাটি তাঁকে পানি দিলেন। কিছুক্ষণের জন্য মহিলাটি ভেতরে গেলেন। পুনরায় দরজায় এসে মুসলিম বিন আকীলকে বাইরে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে বললেন, 'আপনি পানি পান করেন নি?' তিনি বললেন, 'পান করেছি।' মহিলাটি বললেন, 'এবার আপনি ভাল মত ঘরে চলে যান। আমার ঘরের দরজায় আপনার এভাবে দাঁড়িয়ে থাকা ঠিক হবে না।' এ কথায় তিনি চলে যাওয়ার সময় বললেন, 'হে আল্লাহ্‌র বান্দা! এই শহরের কোথাও আমার কোন ঘরও নাই, আত্মীয়-স্বজনও নাই। আপনি কি আমার জন্য সামান্য উপকার করবেন। বিপরীতে আমি আপনাকে উপযুক্ত বিনিময়ও দেব!' মহিলাটি বললেন, 'হে আল্লাহ্‌র বান্দা! আমি আপনার কী উপকার করতে পারি?' তিনি বললেন, 'আমি হলাম মুসলিম বিন আকীল। এই জাতি আমার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে এবং আমার সাথে প্রতারণা করেছে।' মহিলাটি বললেন, 'আপনি মুসলিম?' তিনি বললেন, 'হাঁ, আমি মুসলিম।' মহিলাটি বললেন, 'আপনি ভেতরে আসুন।' অতঃপর মহিলাটি তাঁর জন্য আলাদা এক কক্ষে বিছানার ব্যবস্থা করলেন। রাতের খাবারও দিলেন। তিনি কিন্তু আহার করলেন না। কিছুক্ষণ পর মহিলাটির পুত্রও এসে পড়ল। পুত্রটি যখন তার মাতাকে বার বার সেই কক্ষের দিকে আনাগোনা করতে দেখল, জিজ্ঞাসা করল, 'কী ব্যাপার?' মহিলাটি বললেন, 'বাবা! সেই কথা বাদ দাও।' কিন্তু পুত্র যখন বার বারই জোর করল, তখন মা গোপনীয়তা রক্ষা করার অঙ্গীকার নিয়ে তার কাছে মুসলিম বিন আকীলের কথাটি বলে দিলেন। এই কথা শুনে পুত্র সারাটি রাত নীরবে কাটাল। কোন উচ্চবাচ্য করল না।

এদিকে ইবনে যিয়াদ তার আমীর-ওমরা ও নেতৃস্থানীয় সাঙ্গ-পাঙ্গ নিয়ে ভবন থেকে নেমে জামে মসজিদে নামাজ আদায় করল। নামাজের পরে আমীর-ওমরাদের কাছে মুসলিম বিন আকীলের খোঁজ নিল। এলান করে দিল, 'যার কাছেই থাকুক, সে যদি আমাকে না জানায়, তাহলে তার রক্ত আমার জন্য বৈধ হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি তাঁকে আমার কাছে নিয়ে আসবে, তাকে পুরস্কৃত করা হবে।' তাছাড়া ইবনে যিয়াদ মুসলিম বিন আকীলকে খুঁজে বের করার দায়িত্ব পুলিশ বাহিনীর উপর তুলে দিল। তাদের কঠোরভাবে সাঁড়াশি অভিযান চালানোর তাগাদা দিল।

সকাল হতে না হতেই ওই মহিলাটির পুত্র আবদুর রহমান বিন মোহাম্মদ বিন আশ্‌য়াসের নিকট এসে মুসলিম বিন আকীল তার ঘরে বিদ্যমান থাকার কথা জানিয়ে দিল। সে তার পিতার মাধ্যমে কথাটি ইবনে যিয়াদের কানে তোলে। আবদুর রহমানের পিতা তখন ইবনে যিয়াদের কাছেই ছিল। ইবনে যিয়াদ তাকে জিজ্ঞাসা করল, 'তোমাকে কী বলা হয়েছে?' সে মুসলিম বিন আকীলের সন্ধান পাওয়া গেছে বলে জানাল। ইবনে যিয়াদ হাতের ছোরাটি দিয়ে তার পিঠে হালকা খোঁচা দিয়ে বলল, 'যাও, তাঁকে এক্ষুণি আমার এখানে নিয়ে আস।' ইবনে যিয়াদ পুলিশ অফিসার আমর বিন হারীছ মাখযূমীকে সত্তর-আশি জন আরোহীর সমভিব্যাহারে আবদুর রহমান ও মোহাম্মদ বিন আশ্‌য়াসের সাথে হযরত মুসলিম বিন আকীলকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে আসার জন্য পাঠিয়ে দিল।

হযরত মুসলিম বিন আকীল বিদ্যমান থাকা ঘরটি চতুর্দিক হতে যখন ঘেরাও করে ফেলল, তখনই তিনি টের পেয়েছিলেন। তারা যখন ঘরে প্রবেশ করল, তিনি তখন তরবারি হাতে দাঁড়িয়ে গেলেন। তাদেরকে তিনি তিন বার করে ঘর থেকে বের করে দিলেন। কিন্তু তাঁর উপরের ও নিচের দুইটি ঠোঁটই জখম হয়ে গিয়েছিল। পরে তারা পাথর নিক্ষেপ করতে লাগল। ভেতরে আগুনের গোলাও মারতে লাগল। এতে করে ঘরে দমবন্ধকর পরিবেশের সৃষ্টি হল। তিনি তরবারি হাতে বাইরে চলে এসে তাদের সাথে মোকাবেলায় ঝাঁপিয়ে পড়লেন। এমন সময় আবদুর রহমান তাঁকে আশ্রয়ে নিয়ে নিল। এভাবে তাঁকে গ্রেপ্তার করা সহজ হয়ে গেল।

ইবনে যিয়াদের সিপাহীরা তাঁর কাছ থেকে তরবারি ছিনিয়ে নিল। বাহন স্বরূপ নিয়ে এল একটি খচ্চর। মুহূর্তটিতে তাঁর নিজস্ব বলতে তিনি একজন ছাড়া আর কিছুই ছিল না। তিনি মনে করছিলেন যে, তাঁকে এখন হত্যা করা হবে। কিছুক্ষণ চিন্তা-ভাবনার পর তাঁর দুইটি চোখ দিয়ে অশ্রু বেরিয়ে এল। তখন জনৈক আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস রামালী বলল, 'আপনি যে বস্তুটির জন্য মুগ্ধ রয়েছেন, সেই বস্তুর বাসনাকারীরা যখন এমন অবস্থার শিকার হয়, তখন কান্না করে না।' জবাবে তিনি বললেন, 'আল্লাহ্‌র কসম, আমি নিজের জন্য কান্না করছি না। মৃত্যুর ভয়েও এ কান্না আমার নয়। আমি বরং হযরত ইমাম হোসাইন ও তাঁর পরিবার-পরিজনের জন্যই কান্না করছি।' এর পর তিনি মোহাম্মদ বিন আশ্‌য়াসের দিকে ফিরলেন। বললেন, 'হে আল্লাহ্‌র বান্দা! আমার ধারণা যে, আপনি আমাকে আশ্রয় দেওয়ার অঙ্গীকারটি পূরণ করতে

পারবেন না। আপনি যদি কোন উপকার করতে চান, তা হলে আমার পক্ষ থেকে কোন লোককে ইমাম হোসাইনের নিকট দ্রুত পাঠিয়ে দিন। কারণ, আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, তিনি কাল না হয় আজ সপরিবারে আপনাদের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়ে গেছেন। তাঁকে নিয়ে আমার চিন্তা হয়। দূত যেন তাঁকে গিয়ে এ কথা বলে, 'আমাকে ইবনে আকীল পাঠিয়েছেন। তিনি এখন জাতির হাতে বন্দী। সকাল-সন্ধ্যা যে-কোন সময় তাঁকে কতল করা যেতে পারে। আপনি সপরিবারে স্বদেশের উদ্দেশ্যে ফিরে চলে যান। পাছে আপনিও পরিবারসহ কুফাবাসীদের প্রতারণায় পড়ে না যান। স্বাভাবিক মৃত্যুর রূপে হোক কিংবা হত্যা করে হোক এরা আপনার পরম শ্রদ্ধেয় পিতার শৃঙ্খল থেকে বিচ্ছিন্ন হতে চাওয়া সহচর। কুফাবসীরা আপনার আর আমার সাথে মিথ্যা অঙ্গীকার করেছিল। মিথ্যাচারীদের কথা বলে লাভ নাই।' ইবনে আশ্য়াস বললেন, 'আল্লাহ্‌র কসম, এ কাজটি আমি অবশ্যই করব।'

ইবনে আকীলের কথাগুলো একটি পত্রে লিখে ইবনে আশ্য়াস জনৈক ব্যক্তিকে বাহনের জন্ত ও পরিবার-পরিজনের খরচ-পাতি দিয়ে মক্কা পাঠিয়ে দিলেন। ব্যক্তিটি কুফা থেকে চার রাতের সফরের মাথায় হযরত ইমাম হোসাইনের সাক্ষাৎ পেলেন। হযরত মুসলিম বিন আকীলের লিখিত চিঠিখানি তাঁর হাতে তুলে দিলেন। আর সমস্ত ব্যাপার খুলে বললেন। ইমাম হোসাইন সব কিছুর পর বললেন, 'ললাটের লিখন, যায় না খণ্ডন। আমি আর আমার সহচররা আল্লাহ্‌র ফায়সালাতেই বিশ্বাসী।'

মুসলিম বনি আকীল যখন রক্তাক্ত আননে, খুনে মাখা পোষাকে, পিপাসায় কাতর হয়ে প্রশাসনিক ভবনের তোরণদ্বারের সম্মুখে এলেন, দেখতে পাচ্ছিলেন সেখানে তাঁর পরিচিত নেতৃস্থানীয় লোকজন সহ কিছু সাধারণ মানুষ ইবনে যিয়াদের সাক্ষাতের অনুমতির জন্য অপেক্ষা করছেন। তথায় ছিল শীতল পানির একটি মটকা। হযরত মুসলিম বিন আকীল পানি পান করতে চাইলে জনৈক ব্যক্তি দৌড়ে এসে বলল, 'আমি আল্লাহ্‌র নামে কিরে খেয়ে বলছি, জাহান্নামের ফুটন্ত পানি পান করার পূর্বে এই মটকার পানি তুমি পান করতে পারবে না।' তিনিও বললেন, 'ফুটন্ত পানি পান করার এবং জ্বলন্ত আগুনে প্রবেশ করার সর্বাধিক যোগ্য তো তুমিই।'

ক্লান্ত, শ্রান্ত, আহত ইমাম প্রচণ্ড পিপাসায় কাতর হয়ে দেওয়ালের গায়ে ঠেক দিয়ে বসে পড়লেন। এই অবস্থা দেখে আম্মারা বিন ওকবা বিন আবু মুঈত

ভৃত্য পাঠিয়ে আপন গৃহ হতে শীতল পানির একটি সুরাহী আর একটি বাটি নিয়ে আসতে বললেন। আম্মারার ভৃত্যটি পানি নিয়ে নিয়ে তাঁকে বার বার পান করতে দিচ্ছিলেন। কিন্তু তিন তিন বার চেষ্টা করেও এক বিন্দু পানি তিনি কণ্ঠের নিচে নিতে পারলেন না। কারণ, চেহারার রক্ত এসে মিশছিল পানির সাথে। এভাবে বার বার চেষ্টা করার পর অবশেষে যখন পানি পান করলেন, পানির বাটি সরিয়ে আনতেই তাঁর সম্মুখের দুইটি দাঁত মাটিতে পড়ে গেল। তখন তিনি বললেন, 'আলহামদু লিল্লাহ্, আমার জন্য বরাদ্দ করা রিজিকের শেষ পানিটুকুই পান করলাম।'

এর পর হযরত মুসলিম বিন আকীলকে ইবনে যিয়াদের কাছে নিয়ে যাওয়া হল। তিনি ইবনে যিয়াদকে সালাম দিলেন না। দারোয়ান বলল, 'আপনি কি আমীরকে সালাম দিলেন না?' তিনি বললেন, 'না, তার ইচ্ছা যদি এই হয় যে, সে আমাকে কতল করবে, তাহলে আমার কাছে তার কোনই প্রয়োজন নাই। সে যদি আমাকে কতল করবার ইচ্ছা না রাখে, তা হলে তো সালাম দেবার সুযোগ সামনে অনেক আসবে।' এবার ইবনে যিয়াদ তাঁকে লক্ষ্য করে বলল, 'হে ইবনে আকীল! এই রাজ্যে সকলের মাঝে ছিল ঐক্য ও সাম্য। সবাই এক কথার লোক ছিল। আপনি এসে তাদের মাঝে বিভেদ সৃষ্টি করে দিয়েছেন। পরস্পরের মাঝে খুনের পিপসা ঢুকিয়ে দিয়েছেন।' তিনি বললেন, 'কখনো না। আমি সেই জন্য আসি নি। আমি তো এসেছি বরং ন্যায়-নীতি ও সৎ শাসন প্রতিষ্ঠা করতে আর দুনিয়ার বুকে আল্লাহর কিতাবের হুকুমের প্রচলন করতে।'[১]

হযরত মুসলিম বিন আকীলের শাহাদাত :

হযরত মুসলিম বিন আকীল ও ইবনে যিয়াদের মাঝে অনেক কথাবার্তা হল। কথায় কথায় ইবনে যিয়াদ একের পর এক কেবল দোষারোপই করতে থাকে। তিনিও ওসব অভিযোগের যথাযথ জবাব দিতে থাকেন। অবশেষে তিনি যখন বুঝে নেন যে, সে তাঁকে হত্য করারই পরিকল্পনা চূড়ান্ত করে রেখেছে, তখন তিনি তাকে উদ্দেশ্য করে বললেন, 'তুমি আমাকে কিছু কথা অছিয়ত করার সুযোগ দাও।' ইবনে যিয়াদ বলল, 'আপনি অছিয়ত করতে পারেন।' তিনি তখন উপস্থিত সকলের দিকে চোখ তুলে দেখলেন। তিনি দেখতে পেলেন সেখানে ওমর বিন সাআদ বিন আবু ওয়াক্কাসও রয়েছেন। তাঁকে তিনি বললেন, 'হে ওমর! তুমি তো আমার নিকট-আত্মীয় হও। চল ঘরের এক কোণায় যাই।

১. আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া। ৮: ১৫৪, ১৫৬।

তোমার সাথে কিছু একান্ত কথা আছে।' ওমর বিন সাআদ তাঁর কথায় রাজি হলেন না। অবশেষে ইবনে যিয়াদ অনুমতি দিল। তিনি ইবনে যিয়াদের নিকটেই তাঁর সাথে আলাদায় দাঁড়ালেন। হযরত মুসলিম তাঁকে বললেন, কুফায় আমার সাতশত দিরহামের দেনা আছে। আমার পক্ষ থেকে তুমি তা পরিশোধ করে দিও। ইবনে যিয়াদের কাছ থেকে আমার লাশটি নিয়ে দাফনের ব্যবস্থা করিও। আর হযরত ইমাম হোসাইনের কাছে এই সংবাদটি পাঠিয়ে দিও যে, তিনি যেন কুফায় আগমনের ইচ্ছা না করেন। আমি তাঁকে লিখে পাঠিয়েছিলাম, এখানকার মানুষ আপনার পক্ষে রয়েছে। মনে হয় এত দিনে তিনি রওয়ানা হয়ে গেছেন।'

ওমর বিন সাআদ হযরত মুসলিম বিন আকীলের সব কটি অছিয়তই ইবনে যিয়াদের কাছে ব্যক্ত করলেন। সেও অছিয়তগুলো পালনের অনুমতি প্রদান করল। অতঃপর ইবনে যিয়াদের নির্দেশে হযরত মুসলিম বিন আকীলকে প্রশাসনিক ভবনের উপরে নিয়ে যাওয়া হল। তকবীর, তাহলীল, তসবীহ, ইস্তিগফার ও দরূদ শরীফ পাঠ করতে করতে তিনি উপরে উঠে পৌঁছালেন। দোয়া করলেন, 'হে আল্লাহ্! তুমি এই জাতির বিচার করিও, যারা আমাদের সাথে প্রতারণা করল, যারা আমাদের পক্ষ ত্যাগ করল।' জল্লাদ মুসলিম বিন আকীলের পবিত্র ধড় থেকে মস্তক মোবারকটি আলাদা করে দিল। এর পর ইবনে যিয়াদ হানী বিন ওরওয়াকে কতলের নির্দেশ দিল। হানীকে কতল করা হল 'সুকুল গনমে' (ছাগলের বাজারে)। তার লাশটি ঝুলিয়ে দেওয়া হল কুফার 'কানাসা' নামক স্থানে। ইবনে যিয়াদ পরে আরো কিছু লোককেও হত্যা করল। এসব ঘটনা সে সিরিয়া এজিদের কাছে লিখে পাঠিয়ে দিল।[১]

হযরত মুসলিম বিন আকীলের দুই শাহজাদা :

কুফার এই বিরোধ ও বিগড়ে যাওয়া পরিস্থিতি দেখে হযরত মুসলিম বিন আকীল হেফাজতের উদ্দেশ্যে আপন দুই শাহজাদা হযরত মোহাম্মদ ও হযরত ইবরাহীমকে কাজী শুরাইহের কাছে পূর্ব থেকেই পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। ইতিহাসের বিভিন্ন গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে, হযরত মুসলিম বিন আকীলের দুই স্বল্প-বয়স্ক মাসুম শাহজাদা হযরত মোহাম্মদ ও হযরত ইবরাহীমকেও তাঁর শাহাদাতের পরে শহীদ করা হয়েছিল। 'রাওজাতুশ শুহাদা' গ্রন্থে মোল্লা হোসাইন কাশেফী ঘটনার বিবরণ দিচ্ছেন, হযরত মুসলিম বিন আকীল আপন

১. আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া। ৮: ১৫৭।

দুই শাহজাদাকে হযরত শুরাইহের নিকট প্রেরণকালে বলেছিলেন, 'বাবারা! তোমরা এখানেই থাক। আমি তোমাদের পিতৃব্য হানীকে উদ্ধারের জন্য যুদ্ধ করতে যাচ্ছি। এক্ষুণি ফিরে আসব।' সেই থেকে শাহজাদা দুইজন তাঁদের পিতার ফিরে আসার অপেক্ষায় ছিলেন। দিন গেল। রাতও গড়াল। এদিকে মুসলিম বিন আকীলের ফিরে আসার কোন লক্ষণ দেখা যাচ্ছিল না, আসার কথাও না। মাসুম দুই বালক শাহজাদা চরম নৈরাশ্য ও হাতাশায় খাওয়া-দাওয়াও ছেড়ে দিলেন। তাঁদের শান্ত্বনা দেওয়ার কোন ভাষাই ছিল না শুরাইহের। 'হায়' বলে মাথাটি হেঁট করে রেখেছিলেন তিনি। বাস্তব ব্যাপারটি দুই নিস্পাপ বালককে অবহিত করতে তাঁর মন সায় দিচ্ছিল না। দুই শাহজাদা দুই দিন ধরে পানাহার করলেন না। তাঁরা দুইজন বরাবরই পিতার ফিরে আসার পথের দিকে চেয়ে থাকলেন। অপেক্ষার সময় যতই দীর্ঘ হতে লাগল, কনিষ্ঠ ভ্রাতা ইবরাহীম জৈষ্ঠ্য ভ্রাতা মোহাম্মদকে বললেন, 'ভাইজান! আল্লাহ্ই জানেন আব্বাজান কখন ফিরবেন। মদীনার সব কিছুর জন্য আমার মন জ্বলছে। আমার এক্ষুণি মদীনায় উড়ে যেতে ইচ্ছে করছে। সেখানকার সাথীদের কথা মনে পড়ছে। তারা হয়ত বলছে, কুফায় গিয়ে ইবরাহীম আমাদের কথা ভুলে গেছে।' এমন ধরনের আরো অনেক নিস্পাপ কথাবার্তা চলত দুই ভাইয়ের মাঝে। এসব কথা শুনে কলিজা চুরমার হয়ে যেত কাজী শুরাইহ্ ও তাঁর পরিবার-পরিজনদের।

এমন সময়ে কুফার অলিতে-গলিতে ঘোষণা হচ্ছিল, যে ব্যক্তি মুসলিম বিন আকীলের দুই পুত্রকে পাকড়াও করে নিয়ে আসতে পারবে, তাকে সরকারের পক্ষ থেকে পুরস্কার প্রদান করা হবে এবং বিশেষ সম্মানে ভূষিত করা হবে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি তাদেরকে নিজ ঘরে আশ্রয় দেবে তাকে কঠোর শাস্তি প্রদান করা হবে। এই ঘোষণার প্রেক্ষিতে চর চতুর্দিকে এই দুই নিস্পাপ বালককে খোঁজ করা আরম্ভ করে দেয়। এখন দেখা যায় কাজী শুরাইহকে দিয়েও শেষ রক্ষা হল না। তিনি মনে পাথর বেঁধে অত্যন্ত শোকার্ত হৃদয়ে দুই শাহজাদাকে উদ্দেশ্য করে বললেন, 'একেবারেই অনিচ্ছাকৃতভাবে অত্যন্ত দুঃখ ভারাক্রান্ত হৃদয়ে আমি আপনাদেরকে একটি কথা বলতে বাধ্য হচ্ছি যে, আপনাদের পরম শ্রদ্ধাভাজন আব্বাজান হযরত মুসলিম বিন আকীলকে শহীদ করে দেওয়া হয়েছে। আর হাজার হাজার কুফাবাসী গতকালও আপনাদের হাতে যারা চুমু খেয়েছিল, আপনাদের কাপড়ের আস্তিন ছুঁয়ে ছুঁয়ে নিজেদের চোখে-মুখে বুলিয়েছিল, আপনাদের আব্বাজানের হাতে বাইয়াত হয়ে তাঁর জন্য জীবন

সঁপে দিতেও উদগ্রীব ছিল, তারা সবাই আপনাদের সঙ্গ ত্যাগ করেছে। এখন আপনাদের জন্য একটি পথই খোলা আছে, তা হলো গোপনে মদীনার পথে পাড়ি জমানো। আমি যদি আপনাদেরকে আর একটি মুহূর্তকালও আমার ঘরে আশ্রয়ে রাখি, তাহলে যে-কোন মুহূর্তেই আপনারা গ্রেপ্তার হতে পারেন।'

অতঃপর তিনি আপন পুত্র আসাদকে ডেকে বললেন, 'আমি জানতে পেরেছি যে, বাবুল ইরাকীন থেকে একটি বণিক-দল মদীনার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হবে। এই বালক দুইজনকে তুমি সেখানে নিয়ে যাও। আহলে বাইতের প্রতি সুহৃদ কোন ব্যক্তি কিংবা সহমর্মী কারো হাতে এদেরে তুলে দিও। আর তাঁদের অবস্থার কথা খুলে বলিও। তাগাদা দিও তাঁদেরকে যেন সুন্দর মত নিরুদ্রপে মদীনা পৌঁছিয়ে দেয়।'

হযরত মুসলিম বিন আকীলের দুই শাহজাদার শাহাদাত :

ভোরে কাজী তরাইহের পুত্র আসাদ দুই শাহজাদাকে সাথে নিয়ে বাবুল ইরাকীনে গিয়ে জানতে পারল যে, কিছুক্ষণ পূর্বেই কাফেলা রওয়ানা হয়ে গেছে। সে তখন বালক দুইজনকে সাথে করে সেই রাস্তার দিকে দৌড়াল। কিছু দূর যেতেই বণিক দলটি নজরে এল। আসাদ বিন তরাইহ বলল, 'ভাইজানেরা! ঐ যে ধূলি-বালি উড়তে দেখা যাচ্ছে এগুলো বণিক দলটিরই বাহনের পদাঘাত। তাহলে আমি আর আপনাদের সাথে যাচ্ছি না। যাওয়া ঠিকও হবে না। আপনারা দৌড়ে গিয়ে কাফেলার সাথে মিলিত হোন।' মাসুম বালক দুইটি তাকে কৃতজ্ঞতা জানালেন। তারপর একজন অপরজনের হাত ধরাধরি করে কাফেলার দিকে দৌড়াতে আরম্ভ করলেন। শাহজাদা দুইজন তো এমনিতেই স্বল্প বয়সের বালক। দ্রুত দৌড়াতেও পারছিলেন না। কিছু দূর যেতেই ছোট ভাই ইবরাহীমের পায়ে কাঁটা বিদ্ধ হল। কষ্ট সহ্য করতে না পেরে তিনি বসে পড়তে চাইলেন। এদিকে বড় ভাই তাঁকে গ্রেপ্তারির ভয় দেখিয়ে কোন রকম দৌড়াতে উদ্বুদ্ধ করছিলেন। অনেকক্ষণ পর্যন্ত এই অবস্থা চলতে থাকে। কিন্তু বড় ভাই হয়ে ছোট ভাইকে আর কত বিরক্ত করতে পারেন! তিনি যাত্রায় বিরতি দিলেন। ছোট ভাইয়ের পা থেকে কাঁটাটি বের করে নিলেন। এবার তাঁরা যখন পুনরায় কাফেলাটির দিকে যাত্রা আরম্ভ করলেন, তখন দলটির ধূলো-বালিও আর দৃষ্টিগোচর হচ্ছিল না, কাফেলার কোন লক্ষণও দেখা যাচ্ছিল না। নিষ্পাপ ফুলের মত এতিম দুই বালক অচেনা মরু প্রান্তরের একাকীত্বে অনিশ্চয়তার অজানা ভয়ে একে-অপরের গলায় গলা লাগিয়ে কান্না জুড়ে দিলেন।

শাহজাদা দুইজন যেখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে একে অপরকে জড়িয়ে ধরে কান্না করছিলেন, দিনের আলো উজ্জ্বল হয়ে উঠতেই ইবনে যিয়াদের সিপাহীরা তাদের সন্ধানে সেখানেই এসে পৌঁছাল। গভরের অভাবনীয় আভিজাত্য ও সৌন্দর্য দেখেই তাদের বুঝে নিতে বিলম্ব হল না যে, এঁরাই নবী-বংশের সেই উৎস-প্রদীপ। অতএব, তারা তাঁদেরকে গ্রেপ্তার করে ইবনে যিয়াদের নিকট নিয়ে গেল। ইবনে যিয়াদ নির্দেশ দিল, 'এদের ব্যাপারে এজিদের পক্ষ থেকে কোন নির্দেশ না আসা পর্যন্ত এদেরকে জেলে বন্দী করে রাখ।'

বালক দুইজনকে অন্ধকার একটি কক্ষে বন্দী করে রাখা হল। দুই মাসুম শাহজাদা কালো, অন্ধকার, সরু, ভয়ানক এই কক্ষটি দেখে হতবাক হয়ে গেলেন। একে অপরকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'এ কী ধরনের কক্ষ ভাই? মদীনায় তো আমরা এ রকম কক্ষ কোথাও দেখি নি!' হয়ত মাসুম বালকদ্বয় জেল নামের কিছুই চিনতেন না। হতভম্ব দুই শাহজাদা অত্যন্ত চিন্তাবিষ্ট হৃদয়ে একে অপরকে জড়িয়ে ধরে অগত্যা সেই অন্ধকার কক্ষে বসে পড়লেন। তিনদিন ধরে তাঁরা কিছুই পানাহার করেন নি। অবসন্নতা, দুর্বলতায় তাঁদের দেহে ক্লান্তি নেমে এসেছিল। অজানা আতঙ্ক আর দুশ্চিন্তার বিরাট অস্তাচল তো সর্বোপরি রয়েছেই। জেলের দারোগাটি ছিলেন অত্যন্ত পরহেজগার ব্যক্তি। নবী-বংশের প্রতি তাঁর ছিল অগাধ ভালবাসা। নাম মশকুর। তিনি যখন নবী-বংশের এই মাসুম দুই বালকের উপর জুলুম-নির্যাতনের উৎপীড়ন সহ্য করতে পারছিলেন না, গোপনে শাহজাদা দুইজনের বাঁধন মুক্ত করে দিলেন। নিজের হাতের আংটিখানি তাঁদের হাতে তুলে দিয়ে বললেন, 'হে নবী-বংশীয় শাহজাদারা! আমি আপনাদের বংশের ভালবাসা বুকে নিয়েই এখানে আছি। ভাগ্য রে আমার! পরিস্থিতি আমাকে এই জুলুম নিপীড়নে বাধ্য করেছে। আপনারা আমার এই আংটিখানি নিয়ে গোপনে কাদেসিয়া চলে যান। সেখানকার কোতোয়ালটি আমারই ভাই। তার সাথে সাক্ষাৎ করে আমার এই আংটিখানি দেখিয়ে আমার কথা বলবেন। আর আপনাদেরকে মদীনা পৌঁছিয়ে দিতে বলবেন। সে আপনাদেরকে নির্বিঘ্নে মদীনা পৌঁছিয়ে দেবে।'

মাসুম দুই শাহজাদা কী জানেন, কাদেসিয়া কোথায়? সারা রাতই পথ চলতে থাকলেন। তারপরও কাদেসিয়া এসে পৌঁছালেন না। ভোর হলে দেখতে পেলেন তাঁরা কুফা নগরীর আশে-পাশেই ঘুরছেন। পরস্পর গলা লাগিয়ে বালকদ্বয় কান্না জুড়ে দিলেন। একটু পর তাঁরা দেখতে পেলেন, কিছু দূরে বৃক্ষের একটি শুকনো কাণ্ড। মাঝখানে খোল। দেরী না করে তাঁরা সেই

খোলের মধ্যে আশ্রয় নিলেন। দিনটি এখানে কোন রকম কাটিয়ে দেওয়া যাবে। রাতের বেলায় দেখা যাবে। কিছুক্ষণ পর বৃক্ষটির পাশ দিয়ে প্রবাহিত ঝর্ণাটি থেকে পানি নেবার জন্য এক বাঁদী এল। তার দৃষ্টি পড়ল বালকদ্বয়ের উপর। বলল, 'তোমরা কারা?' বালকদ্বয় সর্বদা সত্য বলায় অভ্যস্থ ছিলেন। বললেন, 'এজিদের হাতে শহীদ হওয়া মুসলিম বিন আকীল ছিলেন আমাদেরই আব্বাজান।' বালকদ্বয় এ কথা বলে হিক দিয়ে উঠলেন। বাঁদীটি বলল, 'শাহজাদারা! আপনারা চিন্তা করবেন না। আমি এমন এক মহিলার বাঁদী, যিনি নবী-বংশের অতিশয় ভক্ত, অনুরক্ত ও ভালবাসা পোষণকারী। আপনাদের কোনই চিন্তা নাই। আমার সাথে চলুন।' দুই শাহজাদা বাঁদীটির সাথে তার মুনিবের ঘরের দিকে রওয়ানা হলেন। বাঁদী দুই শাহজাদাকে তার মহিলা মুনিবের নিকট নিয়ে গেল। সমস্ত ঘটনা খুলে বলল। মহিলাটি অত্যন্ত আনন্দিত হলেন। আনন্দের আতিশয্যে তিনি বাঁদীটিকে আজাদ করে দিলেন। শাহজাদা দুইজনকে প্রাণভরে ভালাবাসা দেখালেন। তিনি তাঁদের গোসল করিয়ে দিলেন। আহারের ব্যবস্থা করলেন। তাঁদের করুণ কাহিনী শুনে অশ্রু বিসর্জন দিলেন। তিনি তাঁদের সব ধরনের সেবা দিলেন। চিকিৎসার ব্যবস্থা করলেন।

এদিকে ইবনে যিয়াদ জানতে পারল যে, মশকুর বালক দুইটিকে ছেড়ে দিয়েছেন। সে মশকুরকে ডাকা পাঠাল। জিজ্ঞাসা করল, 'মুসলিম বিন আকীলের পুত্রদ্বয়কে তুমি কী করেছ?' মশকুর বললেন, 'আল্লাহ্‌র রেজামন্দি ও সন্তুষ্টির খাতিরে আমি তাঁদের মুক্ত করে দিয়েছি।' ইবনে যিয়াদ বলল, 'তুমি আমাকেও ভয় করলে না?' মশকুর বললেন, 'আল্লাহকে ভয় করে এমন ব্যক্তি অন্য কাউকে মোটেই ভয় করে না।' ইবনে যিয়াদ বলল, 'তাদের মুক্ত করে দেওয়াতে তুমি কী পেয়েছ?' মশকুর জবাবে বললেন, 'বালকদ্বয়কে শহীদ করিয়ে দেওয়াতে কী পেতাম? কিন্তু আমার এই কাজের বিনিময়ে কেয়ামত দিবসে তাঁদের নানাজানের শাফায়াতের আশা হলেও করতে পারি। তিনি যখন আমার শাফায়াত করবেন, তুমি তখন মাহরূম যাবে।' ইবনে যিয়াদ রাগান্বিত হয়ে গেল। বলল, 'তার মজা তুমি এক্ষুণি টের পাবে।' মশকুর বললেন, 'আমার যদি হাজারো জীবন হত, সবগুলো আমি নবী-বংশের খাতিরে কুরবান করে দিতাম।' ইবনে যিয়াদ জল্লাদকে নির্দেশ দিল, 'মৃত্যু নিশ্চিত হওয়া পর্যন্ত একে বেত্রাঘাত কর। পরে এর দেহ থেকে মস্তক বিচ্ছিন্ন করে দাও।' জল্লাদ তা-ই করল। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন!!

এদিকে সৎ-মনের মহিলাটি সারাটি দিন কায়মনোবাক্যে শাহজাদাদ্বয়ের খেদমতে নিয়োজিত থাকলেন। রাতের বেলায় তাঁদেরকে আলাদা একটি কক্ষে ঘুমোতে দিলেন। এমন সময় তাঁর স্বামী হারেছ ঘরে এল। চোখে মুখে ছিল ক্লান্তির ছাপ। মহিলাটি জিজ্ঞাসা করলেন, 'আজ সারা দিন কোথায় ছিলেন? আসতে এত দেরি হল যে!' সে বলল, 'সকালে আমি গিয়েছিলাম কুফার আমীর ইবনে যিয়াদের দরবারে। জানতে পারলাম, জেলার মশকুর মুসলিমের দুই পুত্রকে ছেড়ে দিয়েছে। আমীর ঘোষণা দিয়েছেন, তাদের যে ধরে আনবে বা সংবাদ দেবে তাকে পুরস্কৃত করা হবে ঘোড়া, দামী পোষাক, আরো অনেক কিছু। সেই সঙ্গে সম্মাননাও দেওয়া হবে। অনেক অনেক লোক বেরিয়ে পড়েছে তাদের সন্ধানে। আমিও তাদের খোঁজে ঘুরে বেড়াতে থাকি এদিক-সেদিক। ঘোড়াকে এতই দৌড়িয়েছি যে, অক্কাই পেয়ে গেছে। অবশেষে পায়ে হেটেই খুঁজে ফিরেছি স্থানে স্থানে। তাই শরীরটার এই বেহাল দশা হয়েছে।' স্ত্রী বললেন, 'ওহে খোদার বান্দা! আপনি আল্লাহ্‌কে ভয় করুন! নবীর বংশ নিয়ে আপানার কী কাজ?' হারেছ বলল, 'চুপ কর। তুমি সেসবের কী জান যে, ইবনে যিয়াদ ঘোড়া, দামী পোষাক আরো অনেক অনেক পুরস্কার তো দেবেনই; রাষ্ট্রীয় সম্মাননা দেবেন বলেও ওয়াদা করেছেন, যে ব্যক্তি বালকদ্বয়কে তার কাছে নিয়ে যাবে অথবা খোঁজ দেবে।' স্ত্রী বললেন, 'তারা কী রূপ হতভাগা! যারা পার্থিব ধনের লালসায় পড়ে সেই এতিমদেরকে দুশমনদের হাতে তুলে দেবার জন্য ঘুরে ফিরছে! দীন বিকিয়ে দিচ্ছে দুনিয়ার খাতিরে!!' হারেছ বলল, 'ওসব কথার তুমি কী? খাবার নাও।' স্ত্রী খাবার নিয়ে এলেন। সে খেয়ে ঘুমিয়ে পড়ল।

সেই রাতেই জৈষ্ঠ্যভ্রাতা মোহাম্মদ একটি স্বপ্ন দেখলেন। ছোট ভাই ইবরাহীমকে ঘুম থেকে জাগিয়ে বললেন, 'ওঠ ভাই। ঘুমাবার সময় আর নাই। এক্ষুণি প্রস্তুত হও। আমরা এখন খুবই কাছাকাছি সময়ে এসে পৌঁছে গেছি। আমি এই মুহূর্তেই স্বপ্নে দেখলাম যে, আমাদের আব্বাজান বেহেশতের উঁচু স্থানে পায়চারী করছেন। সাথে রয়েছেন নবীকুল সর্দার, হযরত আলী, বিবি ফাতিমা ও হাসান মুজতবা। প্রিয় নবী অকস্মাৎ আমাদের দুইজনের দিকে দৃষ্টি দিয়ে আব্বাজানকে লক্ষ্য করে বললেন, 'মুসলিম! তুমি তো চলে এলে। বালক দুইটিকে যে জালিমদের হাতে তুলে দিয়ে এলে!' আব্বাজান আমাদের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমার এই পুত্রদ্বয়ও চলে আসবে।' এই কথা শুনে বড় ভাইয়ের চেহারায় মুখখানি রেখে ছোট ভাই ভেউ ভেউ করে

কেঁদে উঠলেন। বড় ভাইয়ের ধৈর্যের বাঁধও ভেঙে গেল। দুই ভাই করুণ বেদনা বুকে চেপে ধরে কাঁদতে লাগলেন।

বালকদ্বয়ের কান্নার শব্দে জালিম হারেছের ঘুম ভেঙে গেল। সে স্ত্রীকে জাগিয়ে বলল, 'এ কাদের কান্নার শব্দ শোনা যায় আমার ঘরে?' স্ত্রী বেচারী কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে গেলেন। কোন জবাব দিলেন না। হারেছ উঠে পিদিম জ্বালিয়ে যে কক্ষটি থেকে কান্নার শব্দ আসছিল সেই কক্ষের দিকে গেল। ঢুকতেই দেখতে পেল দুই বালক! একে অন্যকে জড়িয়ে ধরে অঝোরে নয়নে কাঁদছেন। হারেছ বলল, 'তোমরা কারা?' বালকদ্বয় হিক্ সামলাতে সামলাতে বললেন, 'আমরা মুসলিম বিন আকীলের সন্তান।' হারেছ বলল, 'আশ্চর্য! আমি কি না সারাদিন যাদের খোঁজে ঘুরে ফিরছি, যাদের সন্ধানে দৌড়াতে গিয়ে আমার ঘোড়ার দম পর্যন্ত গেল, সেই তোমরা কি আমারই ঘরে!!' এ কথা শুনে বালকদ্বয় নিশ্চুপ হয়ে গেলেন। হারেছের স্ত্রী স্বামীর এই ধরনের পৈশাচিকতা ও হৃদয়হীনতা দেখে তার পায়ে নিজের মাথাখানি নুইয়ে দিল। বলল, 'এই দুই অনাথ এতিমের প্রতি আপনার এতটুকু মায়াও হয় না!' হারেছ বলল, 'তোমার জানের মায়া থাকে ত চুপ হও, সরে পড়!' এই বলে সে দরজায় তালা লাগিয়ে দিল, পাছে তার স্ত্রী বালকদ্বয়কে অন্যত্র কোথাও সরিয়ে ফেলে!

ভোর হতে না হতেই হারেছ তরবারি হাতে বালকদ্বয়কে সাথে নিয়ে চলতে আরম্ভ করল। এই হৃদয়-বিদারক করুণ দৃশ্য মহিলাটি সহ্য করতে পারলেন না। নাঙ্গা পায়ে তিনি পেছনে দৌড়ে গিয়ে স্বামীকে অনুরোধ করলেন, 'আল্লাহ্র দোহাই! এই দুই এতিমের প্রতি আপনার মায়া হয়!' স্ত্রীর এত ব্যাকুলতা, এত আরাধনা কর্ণকুহরেও প্রবেশ করল না তার। দস্তুর মত সে তাকে বরং মারতেই দৌড়াল। ইত্যবসরে হারেছের এক ভৃত্য যে কি না তার পুত্রের দুধ-ভাইও ছিল, জানতে পারলে সেও পেছনে ছুটল। তাকে দেখে হারেছ বলল, 'হয়ত এই দুই বালককে আমাদের হাত থেকে কেউ ছিনিয়ে নিতে পারে। আর পুরস্কার আর সম্মাননা সব কুঁড়িয়ে নিয়ে যাবে। নাও এই তরবারি। তাদের ধড় থেকে মস্তক বিচ্ছিন্ন করে দাও।' ভৃত্যটি বলল, 'এই বালকদ্বয়ের কেশাগ্রে অস্ত্র ধারণের সেই দুঃসাহস আমার নাই! পাক নবীর পবিত্র রূহের কথা স্মরণে আমার লজ্জা হয়। তাঁর পবিত্র বংশের উৎস-প্রদীপের গায়ে হাত তুলে কাল কেয়ামতের দিন তাঁর সামনে কীভাবে মুখ দেখাব!' হারেছ বলল, 'হয় তুমি এদের কতল কর, না হয় আমি তোমাকে কতল করে দিচ্ছি।' ভৃত্য বলল, 'তুমি আমাকে কতল করার পূর্বে আমি তোমাকে কতল করে দেব।' তাদের

মধ্যে হাতাহাতি মল্লযুদ্ধের রূপ নিল। হারেছ ভৃত্যটিকে প্রচণ্ডভাবে জখম করে দিল। ইতোমধ্যে হারেছের স্ত্রী ও পুত্র সামনে এসে দাঁড়ালেন। হারেছের পুত্র বললেন, 'বাবা! এ কী করলেন! এ না আমার দুধ-ভাই! তার গায়ে হাত তুলতে আপনার এতটুকুও লাগল না!!' পিতা পুত্রকে কোন জবাব দিল না। কিন্তু ভৃত্যটিকে তরবারি দিয়ে এমন এক আঘাত করল যে, সে শাহাদাতে সুধা পান করে ফেলল। এরপর হারেছ পুত্রকে লক্ষ্য করে বলল, 'বাবা! এই নাও তরবারি। এই দুইটি বালকের মস্তক বিচ্ছিন্ন করে দাও।' পুত্র বললেন, 'আব্বাজান! আমি আজ অবধি আপনার মত অত্যাচারী ও পাষাণ-হৃদয় লোক আর দেখি নি। আল্লাহ্র নামে কসম খেয়ে বলছি, এ কাজ আমি কখনো করব না, আপনাকেও করতে দেব না।' হারেছের স্ত্রী আবারো অত্যন্ত অনুনয়ের স্বরে বললেন, 'আপনি এই বালকদেরকে কতল করবেন না। যদি এদের রেহাই না দিতে পারেন, তাহলে জীবিতই ইবনে যিয়াদের কাছে নিয়ে চলুন। তাতেও তো আপনার উদ্দেশ্য সাধন হবে।' হতভাগ্য দুরাচারটি বলল, 'আমার সন্দেহ তো সেখানে, কুফাবাসীরা যখন এদের দেখতে পাবে, হৈ-হট্টগোল পাকিয়ে আমার হাত থেকে ছিনিয়ে নেবে। আমার সব মেহনত ভেস্তে যাবে।'

অবশেষে লোভী হারেছ শাহজাদাদ্বয়কে কতল করার ঘৃন্য মতলব মাথায় চেপে তরবারি হাতে উদ্যত হল। অবস্থা দেখে স্ত্রী মাঝখানে বাধার প্রাচীর হয়ে দাঁড়িয়ে গেলেন। স্ত্রীর উপর সে তরবারির আঘাত করল। স্ত্রী আহত হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন। জখমের আঘাতে তিনি তড়পাতে লাগলেন। মায়ের তড়প দেখে পুত্রও এগিয়ে এলেন। পিতার সামনে পুত্র দেওয়াল হয়ে দাঁড়ালেন। ইবনে যিয়াদের পুরস্কারের লোভে মত্ত পিতা দিকবিদিকজ্ঞানশূণ্য হয়ে পুত্রের গায়ে তরবারির ঘা বসিয়ে দিল। ঘটনাস্থলেই তিনি মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লেন। পরম আদরিনী মা চোখের সামনে পুত্রের অন্তিমযাত্রা দেখে তার কলিজা চুরমার হয়ে গেল। তিনিও চির শয়নে শায়িত হলেন। এরপর জালিম হারেছ বালকদ্বয়ের দিকে অগ্রসর হল। প্রথমে বড় ভাইকে এবং পরে ছোট ভাইকে শহীদ করে দিল। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন!

পিশাচ হারেছ নিষ্পাপ বালকদ্বয়কে শহীদ করার পর বিচ্ছিন্ন দেহদ্বয় কোথাও ফেলে দিয়ে মস্তক দুইটি থলেতে ভরল। রওয়ানা দিল ইবনে যিয়াদের ঘাঁটির দিকে। মধ্যাহ্নের সময় সে গিয়ে পৌঁছাল প্রশাসনিক ভবনের তোরণদ্বারে। থলেটি ইবনে যিয়াদের সামনে রাখতেই সে জিজ্ঞাসা করল, 'তোমার থলেতে কী?' হারেছ সদর্পে বলল, 'আপনার দুশমনের মস্তক!' ইবনে যিয়াদ জিজ্ঞাসা

করল, 'কোন্ সে দুশমন?' পিশাচ বলল, 'মুসলিমের দুই পুত্র!' 'ইবনে আকীলের পুত্রদ্বয়!'– বলে ইবনে যিয়াদ ক্রোধে গর্জে উঠল, 'তুমি কার হুকুমে এদের কতল করেছ? আমি তো এজিদকে লিখে পাঠিয়েছি, হুকুম হলে তাদের জীবিত পাঠিয়ে দেব। তিনিও সেইরূপই নির্দেশ দিয়েছেন। এখন আমি কী করতে পারি? তুমি এদের জীবিত নিয়ে এলে না কেন?' হারেছ বলল, 'আমি আশঙ্কা করেছিলাম যে, কুফাবাসীরা হৈ-হট্টগোল পাকিয়ে এই বালকদ্বয়কে আমার হাত থেকে ছিনিয়ে নেবে।' ইবনে যিয়াদ বলল, 'তুমি যদি এমন আশঙ্কাই করে থাকতে, নিরাপদ কোথাও এদের আটকে রেখে আমাকে খবর দিলেও তো পারতে। পরে আমি আনার ব্যবস্থা করতাম। তুমি আমার বিনা অনুমতিতে কতল করলে কেন? রাজ-নির্দেশের অন্যথা করার কারণে এখন তোমার সাজা হবে।' জল্লাদ মুকাতিলকে নির্দেশ দিল, একে কতল করে দাও।' মুকাতিল হারেছের দেহ থেকে মস্তকটি আলাদা করে দিল।[১]

হযরত হোসাইনের কুফায় গমনের দৃঢ় সংকল্প :

গাদায় গাদায় চিঠি-পত্র এবং দলে দলে লোকজনের আগমনের প্রেক্ষিতে পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণের জন্য হযরত ইমাম হোসাইন মুসলিম বিন আকীলকে কুফায় পাঠিয়েছিলেন। তিনিও কুফার মানুষদের অগাধ ভক্তি, ভালবাসা ও আগ্রহ দেখে ইমাম আলী মকামকে লিখে জানিয়েছিলেন, 'আপনি কুফায় চলে আসুন। এখানকার হাজার হাজার মানুষ আপনার পক্ষে আমার হাতে বাইয়াত গ্রহণ করেছেন।' কাজেই ইমাম আলী মকামও কুফায় গমনের উদ্দেশ্যে দৃঢ় সংকল্প করে ফেললেন। এদিকে কুফায় যে আন্দোলন সৃষ্টি হয়ে গিয়েছিল সে সম্বন্ধে তিনি কিছুই জানতেন না।

তিনি যখন রাসূল-পরিবারের নারী, শিশু, বন্ধু-বান্ধব ও শুভানুধ্যায়ীদের সাথে কুফায় যাওয়ার জন্য সংকল্পবদ্ধ হলেন, তখন হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হু তাঁকে বারণ করলেন। বললেন, 'কুফাবাসীরা বড়ই নিমকহারাম। বর্তমান গভর্নরকে যদি কতল করে দেওয়া হত, আপনার দুশমনদের যদি কুফা থেকে বের করে দেওয়া হত, পরিস্থিতি যদি তাদের নিয়ন্ত্রণে থাকত, তা হলে আপনার যাওয়া সমীচীন হত। কিন্তু তারা যখন এমন এক পরিস্থিতিতে আপনাকে আহ্বান করেছে যে, তাদের স্বয়ং আমীরই রয়েছে, তার শাসনও বলবৎ রয়েছে, তার আমলারা সরকারি টেক্স ইত্যাদিও যথারীতি

[১]. রাওজাতুশ শুহাদা। ১৫০।

উসুল করে যাচ্ছে, তাহলে আপনি কি বুঝে নেবেন না যে, তারা আপনাকে যুদ্ধ করার জন্যই আহ্বান করেছে। আমার তো ভয় হয় যে, আহ্বান যারা করেছে তারা আপনার সাথে প্রতারণাই করবে। আপনাকে তারা অসহায় বানিয়ে ছাড়বে। বরং আমি তো ভাবছি যে, তারা বর্তমান সরকারের সাথে যোগ দিয়ে আপনার বিরুদ্ধে লড়বে; আজকের দোস্তবেশীরাই আপনার বড় দুশমন হয়ে দেখা দেবে।'

অনুরূপ হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে যোবাইর, হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে জাফর সহ আরো অনেকেই তাঁকে নিষেধ করলেন। ইমাম আলী মকামের বরাবরই এক কথা, 'এখনকার বিষয়টি বিশ্বাসী ও বিশ্বাসঘাতকের নয়। বিষয়টি হচ্ছে সেই আহ্বানের, যাতে আমাকে হক কলেমা বুলন্দ করার, অন্যায়-অবিচারের বিরুদ্ধে যুদ্ধে মেতে ওঠার, নবীর দীনের পুনর্জাগরণের এবং দীন ইসলামের মর্যাদাকে ভূলুণ্ঠিত হওয়া থেকে রেহাই দানের নিরবিচ্ছিন্ন কাজ চালিয়ে যাওয়ার কথা বলা হয়েছে। তাই আমি সেই লক্ষ্যকে সামনে রেখে আমার সংকল্প থেকে পিছপা হব না; এই পদক্ষেপ পরিহার করব না।' কেউ কেউ অবশ্য মূর্খতা বশত পবিত্র আহ্লে বাইতের বিদ্বেষজনিত কারণে বলে থাকে যে, এজিদের মোকাবেলায় হযরত ইমাম হোসাইন রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হুর কাছে যথেষ্ট সেনাশক্তি ও রাজনৈতিক সহায়তা ছিল না, তাই এই পরিস্থিতিতে মক্কা ত্যাগ করে কুফার দিকে রওয়ানা হওয়ার সংকল্প (বিদ্রোহ) করা ছাড়া উপায় ছিল না (নাউযু বিল্লাহ্)।

মূলত এই ধরনের কথা আহলে বাইতের সাথে বিদ্বেষ মনোভাবের বহিঃপ্রকাশ ছাড়া আর কিছুই নয়।

রুখসত ও আযিমত (সুযোগ ও ইচ্ছা) :

পবিত্র শরীয়তে সংকটময় পরিস্থিতিতে দুইটি পথ বেছে নেওয়ার সুযোগ রাখা হয়েছে। দুইটি রাস্তাই আল্লাহ্ ও তদীয় রাসূল-নির্দেশিত। একটিকে বলা হয় রুখসত বা সুযোগ; অপরটিকে বলা হয় আযিমত বা ইচ্ছা।

পরিস্থিতি যদি স্থিতিশীল থাকে; অন্যায়-অনিয়ম, জুলুম-দুর্নীতি ও কুফরের অপশক্তি সহজতর উপায়ে দমন করা যদি সম্ভব হয়, তা হলে সেই অন্যায়-অনিয়মের বিরুদ্ধে ময়দানে নেমে আসা সকল ঈমানদার লোকের উপর ফরজ ও ওয়াজিব হয়ে যায়। এমন পরিস্থিতিতে শরীয়তভিত্তিক বিশেষ কোন অপারগতা ছাড়া কারো পক্ষে কোন ওজরই গ্রহণযোগ্য নয়। পক্ষান্তরে

পরিস্থিতি যদি অস্থিতিশীল থাকে, যুদ্ধাস্ত্র ও সেনাশক্তির অপ্রতুলতা থাকে, বাতিল প্রতিপক্ষ মজবুত হয়, সুসংগঠিত ও শক্তিশালী হয়, তাহলে এই ধরনের পরিস্থিতিতে মুসলিম উম্মাহ্‌র জন্য শরীয়ত দুইটি সুযোগ রেখেছে। এক, তারা রুখসতের উপর আমল করবে; পাশ কেটে যাবে, গোপনে অভিশাপ দেবে, নিন্দাবাদ করবে এবং মনে মনে মন্দ জানবে। সশস্ত্র সংঘাত ও সংঘর্ষে লিপ্ত হওয়ার জন্য ময়দানে আসবে না। প্রত্যেক যুগেই অধিকাংশ উম্মাহ্ এই রুখসতের উপরই আমল করে আসছেন। এই রুখসতের উপর আমল করা শরীয়ত মতে না-জায়েযও নয়, হারামও নয়, আল্লাহ্ ও তদীয় রাসূলের অসন্তুষ্টির কারণও নয়। তাই যে-কোন অস্থিতিশীল পরিস্থিতির জন্য মহান আল্লাহ্ রুখসতের অনুমতি দিয়ে রেখেছেন।

এখন কথা হল, এরূপ পরিস্থিতিতে সকলে যদি কেবল রুখসতের উপরই আমল করে, তাহলে তো অনিয়ম-দুর্নীতি ও কুফরের তাণ্ডতী অপশক্তিকে স্তব্ধ করে দেওয়া সম্ভবই হবে না। তাই শরীয়তে রুখসতের অনুমোদন থাকা সত্ত্বেও কিছু মানুষ আযিমতের পথও অবলম্বন করেন। পরিস্থিতি কি স্থিতিশীল না কি অস্থিতিশীল সেদিকে তারা ভ্রূক্ষেপ করেন না। তারা সেনাশক্তি, অস্ত্রশক্তি কিংবা রাজনৈতিক শক্তির বালাই দেখেন না। সশস্ত্র সংঘর্ষে সফলতা বিফলতার প্রতিও তোয়াক্কা করেন না। বরং তাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকে আল্লাহ্‌র দীনকে কেবলই বুলন্দ করার জন্য কীভাবে নিজেদের অস্তিত্বকে কোন রকম উৎসর্গ করা যায়, সেদিকে। তাদের ক্ষীণ আশা থাকে যে, তাদের দেহে লেগে যাওয়া আগুনই হয়ত একদিন ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে অন্ধকারে আলো দেখাবে। ইসের ভিত্তিতে তারা পরিস্থিতির অস্থিতিশীলতা উপেক্ষা করেও আযিমতের পথেই পা বাড়ান। জীবন বাজি রেখেও ঝাঁপিয়ে পড়েন। আপন আপন মকাম ও স্তরের অনুকূলে এই ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করাকে তারা ফরজ বলে মনে করেন।

প্রত্যেকেই যেমন রুখসতের উপর আমল করতে পারে না, তেমনি আযিমতের পন্থা অবলম্বন করাও সকলের পক্ষে সম্ভব নয়। হযরত ইমাম হোসাইন এই উদ্যোগ এই কারণেই গ্রহণ করেছিলেন যে, তাঁর রগ-রেশায় প্রবাহমান ছিল হযরত আলী বিন আবি তালিবেরই শোণিত-কণিকা। তিনি লালিত-পালিত হয়েছিলেন হযরত ফাতিমা যাহরারই কোলে। আল্লাহ্‌র পেয়ারা নবীর মোবারক কাঁধই ছিল তাঁর বাহন। হুজুর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র জিহ্বা চুষেই খেয়েছেন তিনি। তিনি হলেন নবী-বংশেরই উৎস-প্রদীপ। তিনি ছিলেন 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্'র ভিত্তিফলক। অতএব, সেই সময়ে আযিমতের

পথ অবলম্বন করা তাঁকে দিয়েই মানিয়েছিল। তবে এও মনে রাখতে হবে যে, রুখসতের পথ অবলম্বন করাও বৈধ। যারা সেই পন্থা অবলম্বন করেছে তাদেরও সমালোচনা করা যাবে না। কেননা, এই অধিকার তাদেরকে শরীয়তই দিয়েছে। তবে, এমন ধরনের লোকদের পন্থাকে কেউ নিজেদের জন্য নিদর্শন কিংবা আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করে না। খোদা-প্রেমে মত্ত আশেকে-এলাহীগণ তাঁদের পথেই চলেন, সত্যের পথে যারা আপন মস্তক উৎসর্গ করেছেন। তাঁরা কেয়ামত তকের জন্য অনুপম এক জীবনাদর্শই যেন উপহার দিয়ে যান। তারা দীনের নবজাগরণের কাফেলার সফরকে এমন এক রাজপথ উপহার দিয়ে যান, যে পথে গিয়ে পৌঁছানো যায় নির্জঞ্ঝাট মঞ্জিলে।

যারা হযরত ইমাম হোসাইনের উদ্যোগের বিরুদ্ধে বাহ্যিক পরিস্থিতির অস্থিতিশীলতা বিবেচনায় নাউযু বিল্লাহ্ বিরোধিতা ও বিদ্রোহের অভিযোগ এনেছে তারা যেমন দীনের রূহ্ সম্বন্ধেও বুঝে না, তেমনি শরীয়তে-ইসলামীর পুনর্জাগরণের দাবী সম্বন্ধেও বুঝে না। তারা এও বুঝে না যে, দীনের বিলুপ্তপ্রায় গৌরব ও সম্মানকে পুনরায় ছিনিয়ে আনার জন্য কীভাবে জান কুরবান করতে হয়। মনে হয় তারা এও জানে না যে, সেই সময়ে এজিদের সিংহাসনে আরোহন ইসলামের ইতিহাসকে কোন্ দিকে ধাবিত করে রেখেছিল। এহেন পরিস্থিতিতে ইমাম হোসাইনও যদি সত্যজ্ঞানকে বুলন্দ করার সুদূরপ্রসারী উদ্যোগকে সম্মুখে রেখে যুদ্ধের ময়দানে ঝাঁপিয়ে না পড়তেন, এই বাহাত্তর জন্য প্রাণোৎসর্গকারী সদস্যও যদি নিজেদের জান কুরবান না দিতেন, তাহলে আজকের ইসলামের এই পসরা, যা তার চির অম্লান গৌরব, গৌরবোজ্জ্বল স্বাধীনতা, প্রভাব-প্রতিপত্তি, রাজকীয় জাঁকজমকসহ ইসলামী শরীয়তের ধারাবাহিক প্রচলনের রূপে প্রতিভাত হয়ে রয়েছে, তা পৃথিবীর কোথাও পরিলক্ষিত হত না। ইসলামের সর্বময় ইতিহাস ও নবী মোস্তফার উম্মতগণ সেই ইমাম হোসাইনের রক্তবিন্দু আর সেই নবী-বংশের মহান কুরবানীর কাছেই চিরঋণী, যিনি রুখসতের পথ পরিহার করে আযিমতের পথকেই বেছে নিয়েছিলেন আর নিজের সর্বস্ব উৎসর্গ করে দিয়েছিলেন। তখনকার যুগের তমসা ও অন্ধকারাচ্ছন্নতাকে এমন উজ্জ্বলতায় বদলিয়ে দিয়েছেন, যা সুদীর্ঘ চৌদ্দ শতাব্দী অবধি বিশ্বমানবতার চলার পথকে আলোকোজ্জ্বল করে রেখেছে। রুখসতের পথ অবলম্বন করার মত হাজার হাজার মানুষ বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও আজ অবধি সারা দুনিয়া যাঁর নাম উপমা স্বরূপ স্মরণ করে তিনি হলেন হযরত ইমাম হোসাইন ইবনে আলী।

পবিত্র মক্কা থেকে কারবালা পর্যন্ত :

হযরত ইমাম হোসাইন রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হু জিলহজ্ব মাসের অষ্টম তারিখে পবিত্র মক্কা থেকে কুফার দিকে রওয়ানা হন। তিনি যখন খামাখা যাবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন, তখন সকলে তাঁকে বললেন, 'মক্কায় না হয় আরো কিছুদিন থেকেই যান'। কিন্তু ইমাম হোসাইনের আব্বাজানের একটি ভবিষ্যদ্বাণী বার বার তাঁকে নাড়া দিয়ে তুলছিল। ভবিষ্যদ্বাণীটি ছিল, পবিত্র মক্কা মুকাররামার হারাম শরীফের শাশ্বত পবিত্রতা কোরাইশ বংশেরই জনৈক ব্যক্তির কারণে পদদলিত হবে। আর সেই একটি ব্যক্তিরই কারণে পবিত্র মক্কা নগরীতে রক্তপাত ঘটবে। তাই তিনি বলেছিলেন, 'যথাসম্ভব মক্কায় এজিদের বাহিনীরা আমাকে গ্রেপ্তার করার উদ্যোগ নেবে। এদিকে আমার সহযোগীরা আমাকে রক্ষা করার জন্য তাদের বিরুদ্ধে তরবারি হাতে নেবে। ফলে পবিত্র মক্কা নগরীতে আমাকে কেন্দ্র করে রক্তপাত ঘটবে। আমি চাই না, আমার পরম শ্রদ্ধাস্পদ আব্বাজানের ভবিষ্যদ্বাণীটি আমাকে দিয়ে বাস্তবায়িত হোক।'

অতএব, ইমাম আলী মকাম আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করে কুফার দিকে যাত্রা আরম্ভ করলেন। পথিমধ্যে 'সিফাহ্' নামক স্থানে আরবের বিখ্যাত কবি ফারাযদাকের সাথে তাঁর সাক্ষাৎ হল। তিনি আসছিলেন কুফা থেকে। ফারাযদাক তাঁকে সালাম দিলেন। বললেন, 'আল্লাহ্ আপনার উদ্দেশ্য সফল করুন। যে মহান ব্রতের অন্বেষায় গমন করছেন, আল্লাহ্ আপনাকে তা দান করুন।' হযরত ইমাম হোসাইন রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হু জিজ্ঞাসা করলেন, 'পেছনে ফেলে আসা লোকদের মনোভাব কী রকম বুঝলেন?' তিনি বললেন,

قُلُوْبُ النَّاسِ مَعَكَ وَسُيُوْفُهُمْ مَعَ بَنِىْ أُمَيَّةَ.

—মানুষজনের মন তো আপনার পক্ষে, কিন্তু তাদের তরবারি বনু উমাইয়াদেরই পক্ষে।

তবু ভাগ্যের লিপিকার তো আল্লাহ্ই। তিনিই তো যা ইচ্ছা করেন।' ইমাম বললেন, 'আপনি ঠিকই বলেছেন। আমার প্রথমও তাঁরই হাতে ন্যস্ত, পরবর্তীও তাঁরই এক্তিয়ারে সোপর্দ। তাঁর যা ইচ্ছা তা-ই করুন। রবের কাজ মুহূর্তে মুহূর্তে নতুন নতুন। আল্লাহ্‌র ইচ্ছা যদি সেটিই হয়, যা আমারও ইচ্ছা, তা হলে আমি আল্লাহ্‌র নেয়ামতের উপর শুকরিয়া আদায় করি। শুকরিয়া আদায়ের সুযোগও তিনিই দেন। আর আল্লাহ্‌র ইচ্ছা যদি আমার ইচ্ছার বিপরীতে হয়, তাঁর কোন সৎ ও পরহেজগার বান্দা কি তাঁর কোন অভিযোগ বা অনুযোগ করতে পারে!'

এর পর ইমাম হোসাইন রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হু সওয়ারীকে মৃদু পদাঘাত করলেন। 'আস্ সালামু আলাইকুম' বলে পরস্পর ভিন্ন পথের দিকে যাত্রা আরম্ভ করলেন।[১]

কবি ফারাযদাকের সাথে সাক্ষাতের পর হোসাইনী কাফেলা সামনের দিকে অগ্রসর হতে না হতেই তাঁর ভাতুষ্পুত্র হযরত 'আওন' ও হযরত 'মোহাম্মদ' তাঁদের পিতা হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে জাফরের চিঠি নিয়ে উপস্থিত হলেন। চিঠিতে লেখা ছিল : 'আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে আমি আপনার নিকট আবেদন করছি যে, আমার এই চিঠি পাওয়া মাত্র কাল বিলম্ব না করেই মক্কার দিকে ফিরে আসুন। আপনি বর্তমানে যে সফরে রয়েছেন সেটিতে আমি আপনার ও আহ্‌লে-বাইতের সমূহ বিপদ দেখতে পাচ্ছি। আজ যদি আপনার কিছু হয়ে যায়, তাহলে তো ইসলামের সর্বশেষ পিদিমটিও চিরকালের জন্য নিস্প্রভ হয়ে যাবে। আপনি হচ্ছেন মুসলমানদের পথ প্রদর্শক, ঈমানদারদের আশার আলো। আপনি সফরে অগ্রসর হবেন না। এই চিঠির পিছনে আমি নিজেই আসছি। ওয়াস্ সালাম!'

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে জাফর আপন সন্তানদের মাধ্যমে চিঠিটি পাঠিয়ে দেওয়ার পর মক্কার আমীর আমর বিন সাঈদের সাথে সাক্ষাৎ করে তাঁকে বললেন, 'আপনি হযরত হোসাইনের নিকট একখানি চিঠি পাঠিয়ে দিন। চিঠিতে তাঁকে কঠোর নিরাপত্তা দেবার ওয়াদা করবেন আর তাঁর প্রতি সদাচার ও সদ্ভাব পোষণের ওয়াদা করবেন। তাছাড়া আমি নিজেও চিঠির মাধ্যমে তাঁকে সফর থেকে ফিরে আসার আবেদন করেছি। আমার মনে হয়, তা হলে তিনি কিছু একটা বুঝে ফিরে আসবেন।' আমর বিন সাঈদ বললেন, 'যা লিখে পাঠাতে চান, তা আপনি নিজেই আমার পক্ষ থেকে লিখে দিন। আমি তাতে মোহর মেরে দেব।' এ কথায় হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে জাফর যা যা লিখতে চেয়েছিলেন, তা তা আমর বিন সাঈদের পক্ষ থেকে লিখলেন। তিনি তাতে মোহর মেরে দিলেন। ইবনে জাফর তাঁকে আরো বললেন, 'নিরাপত্তার জন্য অন্য কাউকে সাথে দিন।' আমর বিন সাঈদ আপন ভ্রাতা ইয়াহিয়াকে তাঁর সাথে দিলেন। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে জাফর ও ইয়াহিয়া চিঠি নিয়ে রওয়ানা

[১]. আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া। ৮: ১৬৬। আত তাবারানী। ৬: ২৮। ইবনে আছীর। ৪: ৪০।

হয়ে দ্রুত হযরত ইমাম হোসাইনের সাথে মিলিত হন। তাঁরা তাঁকে চিঠিখানি পড়ে শোনান। হযরত ইমাম হোসাইন রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু ফিরে আসার ব্যাপারে অস্বীকৃতি জানিয়ে বললেন :

إِنِّي رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَنَامِ وَقَدْ أَمَرَنِي فِيهَا بِأَمْرٍ وَأَنَا مَاضٍ لَهُ،

–আমি আল্লাহ্‌র রাসূলকে স্বপ্নে দেখেছি। তিনি আমাকে একটি কাজ আঞ্জাম দেবার জন্য আদেশ করেছেন। তা আমি যে-কোন কিছুর বিনিময়ে আঞ্জাম দেব।

فَقَالَا: وَمَا تِلْكَ الرُّؤْيَا؟

–তাঁরা জিজ্ঞাসা করলেন, 'স্বপ্নটি কী রকম?

فَقَالَ: لَا أُحَدِّثُ بِهَا أَحَداً حَتَّى أَلْقَى رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ.

–তিনি বললেন, মহান প্রতিপালকের সাক্ষাতে মিলিত হওয়ার আগ পর্যন্ত স্বপ্নটি আমি কাউকে বলব না।[১]

কুফাবাসীদের নিকট পত্র :

হযরত মুসলিম বিন আকীলের শাহাদাতের সংবাদ হযরত ইমাম হোসাইনের নিকট তখনো এসে পৌঁছায় নি। তাই তিনি 'যী রামাহ্' মরু উপত্যকার 'আল হাজের' নামক স্থান থেকে কায়স্ বিন সাইদাবী অথবা আপন দুধ-ভাই আবদুল্লাহ্ বিন ইয়াকতারকে একটি চিঠি দিয়ে কুফাবাসীদের প্রতি পাঠিয়ে দিলেন। চিঠিটি ছিল :

–মুসলিম বিন আকীলের পত্র আমার হস্তগত হয়েছে। পত্রে তিনি আপনাদের ব্যাপারে আমাকে ভাল ধারণাই দিয়েছেন। আমার সহায়তা ও সত্য অন্বেষায় আমার পক্ষে আপনাদের সংঘবদ্ধ হবার কথাও ব্যক্ত করেছেন। আল্লাহ্ আমাদের উদ্দেশ্যকে সফল করুন। আমাকে সহায়তা করার জন্য আপনাদেরকেও মহান প্রতিদান দিন। আমি জিলহজ্ব মাসের অষ্টম তারিখ মঙ্গলবার তারবিয়ার দিন পবিত্র মক্কা নগরী ত্যাগ করেছি। আপনাদের কাছে আমার এই দূত পৌঁছা মাত্র গোপনে গোপনে আপানাদের কাজ তরান্বিত করুন। ইনশা আল্লাহ্

[১]. আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া। ৮: ১৬৭। ইবনে আছীর। ৪: ৪০। আত তাবারানী। ৬: ২৫।

যত শীঘ্র সম্ভব আমি আপনাদের নিকট চলে আসছি। ওয়াস্ সালামু আলাইকুম ওয়া রাহ্‌মাতুল্লাহ্!!

দূত চিঠি নিয়ে কুফার দিকে অগ্রসর হলেন। কিন্তু কাদেসিয়া নামক স্থানে এসে গ্রেপ্তার হয়ে গেলেন। তাঁকে নিয়ে যাওয়া হল ইবনে যিয়াদের নিকট। ইবনে যিয়াদ তাঁকে বলল, 'তুমি ভবনের ছাদে উঠে উপস্থিত সকলের সম্মুখে আলী ও হোসাইনকে গালমন্দ কর'। দূত ছাদে উঠে সকলের সম্মুখে হযরত আলী কাররামাল্লাহু ওয়াজহাহু ও হযরত ইমাম হোসাইন রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুকে গালমন্দ করার স্থলে তাঁদের ভূয়সী প্রশংসা করলেন। তাঁদের জন্য আল্লাহ্‌র দরবারে দোয়া করলেন। তদুপরি ইবনে যিয়াদ ও তার জন্মদাতার উপর অভিশাপও দিলেন। আর দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে উচ্চারণ করলেন, 'ইমাম আলী মকাম রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু পবিত্র মক্কা নগরী থেকে রওয়ানা হয়ে গেছেন। আমি তাঁরই প্রেরিত দূত। তোমরা সবাই হযরত ইমাম হোসাইনের পক্ষ অবলম্বন কর, তাঁর অনুগত হয়ে যাও।'

এই কথায় ইবনে যিয়াদের নির্দেশে তাঁকে ভবন থেকে নিচে নিক্ষেপ করা হল। ফলে তাঁর হাঁড়গোড় চুরমার হয়ে যায়। তিনি শহীদ হয়ে যান।[১]

মুসলিম বিন আকীলের শাহাদাতের সংবাদ :

কুফার পরিস্থিতি সম্পর্কে না-জানা হোসাইনী কাফেলা বরাবরই কুফার দিকে অগ্রসরমান ছিল। পথিমধ্যে যেসব লোকালয় দিয়ে কাফেলা অগ্রসর হতে লাগল সেসব লোকলয়ের কিছু না কিছু মানুষ কাফেলায় যোগ দিতে লাগলেন। হোসাইনী কাফেলাটি যখন 'ছালাবাহ্' নামক স্থানে এসে উপস্থিত হল, তখনই হযরত ইমাম হোসাইন রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু জানতে পারলেন যে, হযরত মুসলিম বিন আকীল ও হানী বিন ওরওয়াহ্‌কে শহীদ করে ফেলা হয়েছে।

আবদুল্লাহ্ ইবনে সুলাইম আল আসাদী ও মুনযির বিন মাশ্‌আল আল আসাদী বর্ণনা করছেন, 'হজ্ব কার্য সমাপন করার পর হযরত হোসাইনের সাথে সাক্ষাৎ করা ছাড়া আমাদের আর কিছুতে মন বসছিল না। তাই আমরা গিয়ে তাঁর সাথে পথেই মিলিত হই। সেই সময়ে তিনি বনী আসাদের এক ব্যক্তির পাশ দিয়ে গমন করছিলেন। তখন তিনি তার কাছে পরিস্থিতি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা

[১]. আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া। ৮: ১৬৮।

করতে চাইলেন। কিন্তু কিছু একটা ভেবে জিজ্ঞাসা করা বাদ দিলেন। আমরা যখন ব্যক্তিটির নিকট দিয়ে গমন করছিলাম, আর কুফার লোকদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম, তখন সে বলল, 'আল্লাহ্‌র কসম, আমি যখন কুফা থেকে বের হই, তখন মুসলিম বিন আকীল এবং হানী বিন ওরওয়াহ্‌কে হত্যা করা হয়েছিল। তাদেরকে পায়ে রশি বেঁধে বাজারে বাজারে হেঁচড়ানো হচ্ছিল।' আবদুল্লাহ্ ও মুনযিরের কথা অনুযায়ী তারা সমস্ত ঘটনা হযরত ইমাম হোসাইনের কানে দিয়েছিলেন। শুনে তিনি কয়েক বার 'ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিঊন' পাঠ করলেন।[১]

আবদুল্লাহ্ ও মুনযির বলছেন, 'অতঃপর আমরা বললাম, আপনাকে আল্লাহ্‌র দোহাই দিচ্ছি, আপনি নিজের ও পরিবারের কথা ভাবুন। এখান থেকে ওয়াপেস ফিরে যান। কেননা, কুফা নগরীতে আপনার কোনই সহযোগী ও সাহায্যকারী নাই। আমরা বরং সন্দেহ করছি যে, যেসব মানুষ আপনাকে দাওয়াত দিয়ে নিয়ে যাচ্ছে, তারাই আপনার দুশমনে পরিণত হবে।' এ কথায় আকীল জোশে উঠে বললেন, 'আল্লাহ্‌র কসম, আমরা সেই পর্যন্ত কুফার সরজমিন ছেড়ে যাব না, যেই পর্যন্ত আমার ভাই মুসলিমের খুনের বদলা না নিয়েছি। কিংবা নিজেও তারই মত খুন না হয়েছি।' তাঁর কথা শুনে হযরত ইমাম হোসাইন বললেন, 'তাঁরা তো চিরবিদায় হয়ে গেলেন, আমাদের বেঁচে থেকে আর কী লাভ?' সাথীদের কেউ বললেন, 'আল্লাহ্‌র কসম, আপনি তো আর মুসলিম বিন আকীল নন। আপনি যখনই কুফা যাবেন আর কুফার লোকজন যখনই আপনাকে দেখবে, তখন সবাই আপনার পক্ষে চলে আসবেই।'[২]

হযরত ইমাম হোসাইন যখন কাফেলার সাথে 'যারূদ' নামক স্থানে এসে পৌঁছালেন, তখন জানতে পারলেন যে, মক্কা থেকে রওয়ানা হওয়ার পর হাজির নামক স্থান থেকে চিঠি দিয়ে যে দূতটিকে তিনি প্রেরণ করেছিলেন, তাকেও হত্যা করা হয়েছে। দুঃখজনক এই সংবাদটি শোনার পর তিনি সকল সফরসঙ্গীদের একত্র করে বললেন, আমাদের শিয়ারা আমাদের ছেড়ে দিয়েছে। অতএব, তোমাদের কেউ ইচ্ছা করলে যেতে পার। আমার পক্ষ থেকে কারো উপর কোন দাবী নাই, বাধ্যবাধকতাও নাই।

[১] আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া। ৮: ১৬৮। আত তাবারী। ৬: ৯।
[২] আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া। ৮: ১৬৯। আত তাবারী। ৬: ২৯।

তাঁর এমনরূপ ঘোষণা দেওয়ার কারণ এই যে, চলার পথে গ্রামের অনেক লোকজন এই মনোভাব নিয়ে তাঁর সাথে পাড়ি জমিয়েছিল যে, হয়ত তিনি এমন কোন নগরের দিকে যাত্রা করছেন, যেখানকার বাসিন্দারা তাঁর আনুগত্য মেনে নিয়ে তাঁকে সাদর সম্ভাষণ জানিয়েছে। অথচ তাদেরকে সঠিক পরিস্থিতি সম্পর্কে অবহিত না করে সাথে নিয়ে যাওয়া সমীচীন ছিল না। তাছাড়া তিনি জানতেন যে, বাস্তব পরিস্থিতি সম্পর্কে জানার পর তাঁর সাথে কেবল সেসব লোকজনই থাকবে, যারা আপন জীবনবাজি রেখে হলেও তাঁর সঙ্গ ছাড়বেন না। তাঁর এই ঘোষণার পর পথিমধ্যে তাঁর সাথে মিলিত হওয়া লোকজনের অনেকেই বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ল। শেষ পর্যন্ত তাঁর সাথে তাঁরাই থেকে গেলেন, যাঁরা মক্কা থেকেই তাঁর সাথে রওয়ানা হয়েছিলেন।

হুর্‌ বিন এজিদের আগমন :

ইমাম হোসাইন সফর অব্যাহত রাখলেন। তিনি যখন 'যী হাশম' পর্বতে গিয়ে পৌঁছালেন, তখন হুর্‌ বিন এজিদ যাকে এজিদ সরকারের পক্ষ থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করার জন্য পাঠানো হয়েছিল, এক হাজার সশস্ত্র বাহিনীর সমবিভ্যাহারে তথায় এসে উপস্থিত হল। এসেই তাঁর সামনাসামনি অবস্থান নিয়ে নিল। হুর্‌ এবং তার বাহিনীর লোকজনেরা হযরত ইমাম হোসাইনের ইমামতিতে জোহর ও আসরের নামাজ আদায় করে। আসরের নামাজের পর তিনি তাদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য দিলেন। তাদেরকে বশ্যতা ও আনুগত্যের আহ্বান করলেন। খেলাফতের অত্যাচারী প্রতিপক্ষ দাবীদারের বশ্যতা পরিহার করারও আহ্বান জানালেন।

তিনি কুফাবসীদের চিঠিপত্রের কথা এবং অসংখ্য দূতের কথা উল্লেখ করে বললেন, 'তোমাদের চিঠিপত্র ও দূতগণ মারফত আমার নিকট যা প্রকাশ করেছিলে, আজ যদি তোমাদের মতামত সেটির ভিন্ন হয়, তাহলে আমি পুনরায় ফিরে যাচ্ছি।' হুর্‌ বলল, 'ওসব চিঠির কথা আমরা জানি না। কারা লিখেছিল তাও জানি না।' তৎক্ষণাৎ হযরত হোসাইন রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হু চিঠিপত্রে ভর্তি দুইটি থলে চেয়ে নিয়ে হুরের সম্মুখে ঢেলে দিলেন। এবং কয়েকটি চিঠি পাঠও করলেন। তখন হুর্‌ বলল, 'আপনার কাছে যারা এসব চিঠি লিখেছে, আমরা তাদের মধ্যে নাই।'

আমাদেরকে তো নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, আপনাকে পাওয়ার পর ইবনে যিয়াদের নিকট নিয়ে না যাওয়া পর্যন্ত আমরা যেন আপনাকে ছেড়ে না দিই।

তিনি বললেন, 'তার চেয়ে মেরে ফেলাই ছিল সোজা পথ।' তিনি বলতে চেয়েছিলেন যে, তাঁকে জীবিত গ্রেপ্তার করে ইবনে যিয়াদের নিকট নিয়ে যাওয়া কখনো সম্ভব না। অতঃপর ইমাম হোসাইন রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু সফরসঙ্গীদের উদ্দেশ্য করে বললেন, 'তোমরা সবাই বাহনে উঠে পড়।' নারী-পুরুষ সকলে যখন বাহনে উঠে গেলেন, আর তিনি যখন ফিরে যাওয়ার ইচ্ছা করলেন, তখন হুরের বাহিনী তাঁর পথ রোধ করল। এ অবস্থা দেখে ইমাম হোসাইন রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হুরকে লক্ষ্য করে বললেন, 'তোমার মা তোমার জন্য কান্না করুক, তুমি কী চাও?' হুর তখন বলল, 'আল্লাহ্‌র কসম, আপনি না হয়ে অন্য কোন আরব যদি এই কথাটি বলত, আর সে যদি আপনার এই অবস্থায় হত, তাহলে আমি অবশ্যই তার বদলা নিতাম। আমি তার মাকেও ছেড়ে কথা বলতাম না। কিন্তু জীবনের সর্বাবস্থায় আমি আপনার মায়ের নাম সম্মান ও ইজ্জতের সাথেই নিয়ে থাকব।'

এরপর দুইপক্ষে কিছু তর্কাতর্কি চলল। শেষে হুর বলল, 'আপনার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার নির্দেশ নাই। আমি কেবল এই হুকুম নিয়েই এসেছি যে, আপনাকে ছাড়তে পারব না। আপনাকে কুফায় ইবনে যিয়াদের কাছেই নিয়ে যাব। আপনি যদি তাতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করুন, তাহলে এমন কোন পথ বেছে নিন, যা কুফারও হবে না, মদীনারও হবে না। এই মুহূর্তে আপনি যদি ইচ্ছা করেন, তাহলে এজিদের কাছে লিখতে পারেন। আমি ইবনে যিয়াদকে লিখছি। তাহলে আল্লাহ্‌ এমন কোন পন্থা দেখিয়ে দেবেন, যা দ্বারা আমি আপনার বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ থেকে পরিত্রাণ পেতে পারব।'

হযরত ইমাম হোসাইন কাফেলাকে যাত্রার নির্দেশ দিলেন। কাফেলাটি 'গদীব' ও 'কাদেসিয়া' যাওয়ার রাস্তার বাম দিকে যাত্রা আরম্ভ করল। হুর বিন এজিদও তাঁর সাথে সাথে চলতে লাগল।[১]

যাত্রার এক পর্যায়ে তিনি 'নিনুয়া' নামক স্থানে এসে পৌঁছলেন। সেখানে তিনি কুফা থেকে আসা এক আরোহীকে দেখতে পেলেন। সবাই যাত্রা বিরতি দিয়ে আরোহীটির জন্য অপেক্ষা করতে থাকলেন। সে এসে ইমাম হোসাইন ও তাঁর সফরসঙ্গীদের সালাম করার স্থলে হুরকেই সালাম করল। আর ইবনে যিয়াদের পক্ষ থেকে হুরকে একটি চিঠি দিল। চিঠিতে লেখা ছিল 'আমার এই দূতটি চিঠিখানি নিয়ে তোমার নিকট পৌঁছার পর থেকে হোসাইনের উপর কঠোরতা

[১]. আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া। ৮: ১৭২-১৭৩। ইবনে আছীর। ৪: ৪৭-৪৮।

অবলম্বন করবে। তুমি তাকে কোথাও কোন আশ্রয়স্থল নাই, এমন পানিশূন্য বিরাণ ভূমি ছাড়া অন্যত্র অবতরণ করতে দেবে না। আমি দূতকে নির্দেশ দিয়ে রেখেছি, সে তোমাকে চোখে চোখে রাখবে। সেই পর্যন্ত সে তোমার আলাদা হবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত আমার কাছে এই সংবাদ আসবে না যে, তুমি আমার নির্দেশের অন্যথা কর নি।'

এই চিঠি পড়ার পর হুর হযরত ইমাম হোসাইন এবং তাঁর সফরসঙ্গীদের বলল, 'এটি হচ্ছে আমীর ইবনে যিয়াদের চিঠি। এই চিঠিতে তিনি আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন যে, আমি যেন আপনার সাথে কঠোরতা অবলম্বন করি। আর যেসব স্থানে কোন বসতি নাই, পানি নাই এবং আশ্রয়ের জায়গা নাই, এমন স্থান ছাড়া অন্য কোথাও আপনাকে যেন অবতরণ করতে না দিই।' তখন তাঁর সফরসঙ্গীরা বললেন, 'আমরা 'নিনুয়া', 'গাজেরিয়া' কিংবা 'শাফিয়া'য় অবতরণ করব।' সে বলল, 'তা আমি করতে পারি না। কেননা, লোকটিকে (দূতটিকে) আমার উপর নজরদারির দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।'[১]

হোসাইনী কাফেলা ঃ কারবালার জমিনে ঃ

হযরত ইমাম হোসাইন রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু চলতে চলতে নিনুয়া প্রান্তরে গিয়ে ৬১ হিজরীর ২রা মুহররম জুমাবার দিন সঙ্গী-সাথী, পরিবার-পরিজনদের নিয়ে তাঁবু খাটিয়ে ফেললেন। ওদিকে হুরও তাঁর বিপরীতে তাঁবু গেঁড়ে নিল। হুরের অন্তরে আহ্‌লে-বাইতের প্রতি সম্মানবোধ থকালেও, এবং তার নামাজগুলোও ইমাম হোসাইনের পেছনেই আদায় করে থাকলেও, ইবনে যিয়াদের হুকুমের অন্যথা করার কোন সুযোগ তার ছিল না। সে ইবনে যিয়াদের পৈশাচিক মনোভাব ও নৃশংস চরিত্র সম্বন্ধে ভালভাবেই জানত। আরো জানত যে, সে যদি ইমাম হোসাইন ও তাঁর সাথীদের সাথে কোন ধরনের শৈথিল্য প্রদর্শন করে কিংবা ইবনে যিয়াদের সরকারি নির্দেশের অন্যথা করে, তাহলে সেই বিষয়টি বাহিনীর এক হাজার লোকের কারো কাছে কোনভাবেই গোপন থাকবে না। আর ইবনে যিয়াদ যখন জানতে পারবে, সে কস্মিনকালেও তা ক্ষমা করবে না। কঠোর শাস্তি দেবে। এই ভয়কে সামনে রেখে হুর বিন এজিদ বরাবরই ইবনে যিয়াদের নির্দেশ পালন করতে থাকে।

যেই স্থানে এসে ইমাম হোসাইন রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু পরিবার-পরিজন নিয়ে তাঁর সাথীদের সহ তাঁবু খাটিয়েছিলেন সেই বিরাণ মরু প্রান্তরের খাঁ খাঁ

[১] ইবনে আছীর। ৪: ৫১, ৫২।

করা বিদঘুটে পরিবেশ দেখে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, এই স্থানটির নাম কী? সবাই বললেন, 'এটিকে 'কারবালা' বলা হয়।' তিনি বললেন, 'ঠিক আছে, এখানেই স্থায়ী তাঁবুর ব্যবস্থা করা হোক। এটিই আমাদের সফরের শেষ মঞ্জিল।'

কারবালা এসে পৌঁছাতেই হযরত ইমাম হোসাইন রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর থেকে থেকে মনে পড়তে লাগল তাঁর নানাজানের প্রদত্ত বাণীগুলোর কথা, শৈশবের স্মৃতিগুলো আর নানাজানের প্রদত্ত আগাম সুসংবাদগুলোর কথা। উম্মে সালেমার বর্ণনা মতে তাঁর গৃহে আপন বড়ভাই হাসান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর সাথে নানাজানের চোখের সামনে তিনি খেলা-ধূলা করছিলেন, শিশুকালের সেই মুহূর্তের কথাও তাঁর মনের পর্দায় উঁকি মারছিল। তাঁর মনে পড়ে গেল জিবরাঈল আমীন অবতরণ করে বলেছিলেন, 'হে মুহাম্মদ! নিশ্চয় আপনার উম্মতদের মধ্য হতে একটি দল আপনার পরবর্তীতে আপনার এই সন্তান হোসাইনকে কতল করবে।' আর নানাজানকে দিয়েছিলেন শাহাদাতগাহের কিছু মাটি– সেকথাও তাঁর চোখের সামনে দিব্যি জ্বলছে। নানাজান সেই মাটিকে নাক দিয়ে শুঁকেছিলেন। আর বলেছিলেন, 'আমি এই মাটি থেকে গন্ধ পাচ্ছি বিষাদ আর মহা আপদের!' এই বলে নানাজান শিশু হোসাইনকে আপন বক্ষে জড়িয়ে নিয়েছিলেন। আর কান্না করেছিলেন। এর পর তিনি বলেছিলেন,

يَا أُمَّ سَلَمَةَ إِذَا تَحَوَّلَتْ هَذِهِ التُّرْبَةُ دَمًا فَاعْلَمِي أَنَّ ابْنِي قَدْ قُتِلَ.

–উম্মে সালেমা! এই মাটি যেদিন রক্তে রূপায়িত হবে, সেদিন জেনে নেবে, আমার এই সন্তানকে হত্যা করা হয়েছে।[১] এসব দৃশ্য তাঁর স্মৃতির পর্দায় ভেসে ভেসে উঠছিল!

হযরত উম্মে সালেমা সেই মাটিগুলো একটি বোতলে করে নিয়ে রেখেছিলেন। তিনি প্রতিদিন মাটিগুলো দেখতেন। আর বলতেন, 'যেদিন এই মাটি রক্তের রূপ নেবে, সেই দিনটি হবে অত্যন্ত বিষাদময়, মহান!'

এই কারবালা ছিল সেই জায়গা যা সম্পর্কে হযরত ইমাম আলী মকামের পিতা হযরত আলী কাররামাল্লাহু ওয়াজহাহু বলেছিলেন,

[১]. আল খাসায়িসুল কুবরা। ২: ১২৫। সিররুশ শাহাদাতাইন। ২৮। আল মুজামুল কবীর লিত তাবারানী। ৩: ১০৮।

هَهُنَا مَنَاخُ رِكَابِهِمْ وَمَوْضَعُ رِحَالِهِمْ وَمِهْرَاقُ دِمَائِهِمْ فِئَةٌ مِنْ آلِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقْتَلُوْنَ بِهٰذِهِ الْعَرْصَةِ تَبْكِي السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ،

–এই স্থানটিই তাঁদের (হোসাইন ও তাঁর কাফেলার) উটগুলোর বসার স্থান। তাঁদের সরঞ্জামাদি রাখার স্থান। আর এটি হল তাঁদের খুন হওয়ার স্থান। হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরিবারের একটি কাফেলা এই ময়দানে শহীদ হবেন। যাঁদের জন্য সমগ্র আসমান-জমিন কান্নায় মুহ্যমান হবে।[১]

যেহেতু কারবালা প্রান্তর এবং ইমাম আলী মকামের শাহাদাতের আগাম বার্তা অনেক আগে থেকেই আলোচিত হয়ে আসছিল, তাই তিনি সফরের আখেরী মঞ্জিল বুঝে নিয়ে ময়দানটিতেই তাঁবু খাটিয়েছিলেন।

ওমর বিন সাআদের আগমন :

একদিকে হোসাইনী কাফেলা বিদেশ-বিভূঁইয়ে কারবালার মরুপ্রান্তরে তাঁবুবন্দী। ওদিকে পলিদ এজিদ সরকার সেই পূতাত্মাগণের উপর কেয়ামত সৃষ্টি করার সকল প্রকারের প্রস্তুতি গ্রহণে ব্যস্ত। অতঃপর মুহররম মাসের ৬ তারিখে ওমর বিন সাআদ মোকাবেলার জন্য চার হাজার সৈন্যের সমবিভ্যাহারে কুফা ছেড়ে কারবালা এসে উপস্থিত হয়। ইবনে যিয়াদ এই বাহিনীটিকে 'দাইলামের' জন্য তৈরি করেছিল। কিন্তু যখন ইমাম হোসাইনের বিষয়টি সৃষ্টি হল, সে ওমর বিন সাআদকে নির্দেশ দিল, প্রথমে হোসাইনের দিকেই যাও। সেটি শেষ করার পর দাইলামে যাবে। ওমর বিন সাআদ হযরত ইমাম হোসাইনের উপর হামলা করতে অস্বীকৃতি জানাল। সেই সাথে সে ইস্তফাও দিল। ইবনে যিয়াদ বলল, তুমি যদি তা-ই ভাল মনে কর, তবে তোমার ইস্তফাপত্র মঞ্জুর করছি, কিন্তু সেই সাথে আমি যে তোমাকে আমার প্রতিনিধির দায়িত্ব দিয়েছি সেই পদ থেকেও অপসারণ করব। ওমর বিন সাআদ বিষয়টি ভেবে দেখার জন্য সময় নিল। বিষয়টি নিয়ে সে যার কাছেই পরামর্শ চাইল, প্রত্যেকেই তাকে ইমাম হোসাইনের উপর আক্রমণ না করারই পরামর্শ দিল। এমনকি তার ভাতিজা হামজা বিন মুগীরা বিন শু'বা বললেন, 'আল্লাহর দোহাই, হযরত ইমাম হোসাইনের উপর কখনো সেনা হামলা করতে যাবে না। এটি সরাসরি আল্লাহর নাফরমানি হবে এবং আত্মীয়তার অস্বীকৃতি হবে। আল্লাহর

[১]. আল খাসায়িসুল কুবরা। ২: ১৬২। সিররুশ শাহাদাতাইন : ৩১।

কসম, সারা দুনিয়ার রাজত্ব থেকেও যদি তোমাকে হাত গুটিয়ে নিতে হয়, সেটি তোমার জন্য ইমাম হোসাইনের রক্তপাত ঘটানো এবং তাঁকে আক্রমণ করার মত ইতিহাস সৃষ্টি করার চাইতে উত্তম হবে।' ইবনে সাআদ বলল, 'ইনশা আল্লাহ্ আমি তা-ই করব।' কিন্তু ইবনে যিয়াদ যখন তাকে পদচ্যুত করা ছাড়াও হত্যা করার হুমকি দিল, তখন সে সৈন্যদের সাথে নিয়ে ইমাম হোসাইনের দিকে অগ্রসর হল।[১]

পানি বন্ধ করে দেওয়ার নির্দেশ :

ওমর বিন সাআদ হযরত ইমাম হোসাইন রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হুর কাছে দূত পাঠিয়ে জিজ্ঞাসা করাল, তিনি কেন এখানে আগমন করেছেন? তিনি বললেন, 'কুফাবাসীরা আমাকে চিঠির মাধ্যমে দাওয়াত করেছিল, আমি যেন তাদের নিকট চলে আসি। এখন তারা যদি আমার আগমনে অসন্তুষ্ট হয়, তা হলে আমি পুনরায় মক্কা চলে যাই।' ইবনে সাআদ এই জবাব পাওয়ার পর মন্তব্য করল, 'আমার কামনা যে, কোন ভাবেই ইমাম হোসাইনের সাথে যুদ্ধ করা থেকে আমি যেন বেঁচে যেতে পারি।'

তাই সে ইবনে যিয়াদের কাছে লিখে পাঠাল যে, 'ইমাম হোসাইন তাঁর উপর কুফাবাসীদের অসন্তুষ্টি দেখে পুনরায় মক্কা চলে যেতে চান।' কিন্তু ইবনে যিয়াদ উত্তর দিল, 'তুমি ইমাম হোসাইন ও তার সাথীদের জন্য পানি বন্ধ করে দাও। আর হোসাইনকে বলে দাও, তিনি এবং তাঁর সাথীরা যেন আমীরুল মুমিনীন এজিদ বিন মুয়াবিয়ার হাতে বাইয়াত গ্রহণ করেন। বাইয়াত গ্রহণ করার পরই আমরা ভেবে দেখব কী করা যায়।' এই নির্দেশের প্রেক্ষিতে ওমর বিন হাজ্জাজের নেতৃত্বে ইবনে সাআদের লোকেরা হযরত ইমাম হোসাইনের কাফেলার জন্য পানি বন্ধ করে দিল।[২]

হযরত ইমাম হোসাইন নিজ ভ্রাতা হযরত ইবনে আব্বাসের সাথে ত্রিশজন আরোহী সহ বিশজন পদাতিককে পানির জন্য পাঠালেন। ওমর বিন হাজ্জাজ তার সাথীদের নিয়ে গড়িমসি শুরু করে দিল। কিন্তু হযরত আব্বাস ও তাঁর সাথীরা মোকাবেলার পর পানি উদ্ধার করতে সক্ষম হলেন।[৩]

১. আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া। ৮: ১৮৪।
২. আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৮: ১৭৫।
৩. ইবনে আছীর, ৪: ৫৪। তাবারী, ৬: ৩০।

হযরত ইমাম হোসাইন ইবনে সাআদের সাথে সাক্ষাৎ করার ইচ্ছা পোষণ করলেন। এই প্রস্তাবে উভয় দল বিশ বিশজন করে আরোহী নিয়ে আগমন করলেন। ইমাম হোসাইন তাঁর কাফেলার লোকজনকে এবং ইবনে সাআদ তার সাথীদেরকে আলাদা করে দিলেন। এরপর তারা দুইজনের মাঝে অনেকক্ষণ যাবৎ একান্তে কথাবার্তা হল। তাদের কথাগুলো কেউ শুনতে পায় নি। অতঃপর দুইজনই আপন আপন লোকজন নিয়ে আলাদা হয়ে গেলেন। তাদের মাঝে কী কথাবার্তা হয়েছিল, সে সম্পর্কে দুইটি বর্ণনা পাওয়া যায়।

১. কেউ কেউ মনে করেন, হযরত ইমাম হোসাইন ইবনে সাআদকে বলেছিলেন যে, 'আমাদের সাথীদের এখানে রেখে আমরা দুইজন এজিদের কাছে সিরিয়া যাই। গিয়ে সরাসরি তার সামনে বসে বিষয়টি নিষ্পত্তি করি।' ইবনে সাআদ বলেছিল, 'আমি যদি তা করি তাহলে ইবনে যিয়াদ আমার বসতবাটী ভেঙে দেবে।' ইমাম হোসাইন বলেছিলেন, 'আমি তোমাকে এর চেয়ে উন্নত বাসগৃহ তৈরি করে দেব।' ইবনে সাআদ বলেছিল, 'তিনি আমার সম্পত্তি ক্রোক করবেন।' হযরত হোসাইন বলেছিলেন, 'আমি তোমাকে আমার হেজাজের সম্পত্তি থেকে এর চাইতে অধিক সম্পদ দান করব।' কিন্তু ইবনে সাআদ তাঁর প্রস্তাবে রাজি হয় নি।

২. কেউ কেউ মনে করেন, তিনি নিচের দাবীগুলো পেশ করেছিলেন :
   ক. আমরা দুইজনই এজিদের কাছে যাই। অথবা,
   খ. তুমি আমার বিরুদ্ধাচরণ পরিহার কর। আমি হেজাজ চলে যাচ্ছি। অথবা,
   গ. তুর্কীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য আমি সীমান্তের দিকে রওয়ানা হচ্ছি।

ওমর বিন সাআদ এই কথাগুলো ইবনে যিয়াদের নিকট লিখে পাঠিয়ে দিল। চিঠিখানি ইবনে যিয়াদের নিকট যেই পৌঁছাল, সেও সিদ্ধান্ত নিল যে, এই তিনটি প্রস্তাবের যে-কোন একটি মেনে নেবে। সেই সময়ে ইবনে যিয়াদের কাছে শিমার বিন জিল জওশনও উপস্থিত ছিল। অস্পৃশ্যটি দাঁড়িয়ে গেল। বলল, 'আপনি কি হোসাইনের প্রস্তাবগুলো মেনে নিচ্ছেন? অথচ বর্তমানে সে আপনার অক্টোপাশেই বন্দী! আল্লাহ্র কসম, সে যদি আপনার বশ্যতা স্বীকার না করে এখান থেকে চলে যেতে পারে, তাতে হবে আপনার ভরাডুবি, পক্ষান্তরে তার জন্য হয়ে দাঁড়াবে সাফল্য আর বিজয়ের কারণ। তাকে এই সুযোগ কখনো দিবেন না। তাতে আপনার অপমান বয়ে আসবে। এমনই তো

হওয়া উচিত যে, হোসাইন ও তার সাথীরা আপনার হুকুমের তলে শির অবনত করে রাখবে। আপনি তাদের সাজা দিন, সেটি আপনার অধিকার। আর যদি ক্ষমা করে দিন, সেটিও আপনারই এখতিয়ারভুক্ত। আল্লাহ্‌র কসম, আমি তো এও জানি যে, হোসাইন ও ইবনে সাআদ তাদের সৈন্যদের নিয়ে বসে বসে রাতারাতি কথাবার্তা বলে থাকে।'

ইবনে যিয়াদ বলল, 'তুমি খুব সুন্দর কথাই বলেছ।' অতঃপর সে জিল জওশনের পুত্র শিমারকে এই নির্দেশ দিয়ে পাঠিয়ে দিল যে, হোসাইন ও তার সাথীরা যদি আমার হুকুম তামিল করে, তাহলে ভাল কথা, না হয় ওমর বিন সাআদকে নির্দেশ দাও, সে যেন হোসাইন ও তার সাথীদের উপর হামলা আরম্ভ করে দেয়। আর ইবনে সাআদ এই নির্দেশে গড়িমসি করলে তাকে হত্যা করে দিও। এবং সেনা বাহিনীর কর্ণধার তুমিই হয়ে যেও। হযরত হোসাইন রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুকে হত্যা করার ক্ষেত্রে গড়িমসি না করার জন্য ইবনে যিয়াদ ওমর বিন সাআদের নিকট একটি গরম চিঠি লিখল। সে লিখেছিল, 'হোসাইন ও তার সাথীরা যদি আমার বশ্যতায় রাজি না হয়, তাহলে তাদের বিরুদ্ধে তড়িৎ যুদ্ধ আরম্ভ করে দাও। কারণ, তারা বিদ্রোহী।'[১]

জিল জওশনের পুত্র শিমার যখন ইবনে যিয়াদের চিঠিখানি নিয়ে ওমর বিন সাআদের নিকট এল, তখন ওমর বলল, 'শিমার! আল্লাহ্ তোমার ধ্বংস করুন! তোমার বিনাশ হোক! আমার দৃঢ় বিশ্বাস, হযরত ইমাম হোসাইন যে তিনটি প্রস্তাবনা পেশ করেছেন, সেগুলো মেনে নেওয়ার ক্ষেত্রে ইবনে যিয়াদকে তুমিই বারণ করেছ!' শিমার বলল, 'তুমি এখন কী বলতে চাও, শুনি? তুমি কি তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে, না কি তার আর আমার মধ্যখান থেকে সরে যাবে?' ইবনে সাআদ বলল, 'তা হতে পারে না। আমি কখনো তোমার মত অস্পৃশ্যের হাতে নেতৃত্ব তুলে দেব না। আমি নিজেই থাকব সেনা পরিচালনার দায়িত্বে।'

এই বাহিনী ৬১ হিজরী সনের মুহররম মাসের নবম তারিখ বৃহস্পতিবার দিন হযরত হোসাইন ও তাঁর সাথীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে সম্মুখবর্তী হল।[২]

মাত্র এক রাতের অবকাশ :

৬১ হিজরীর মুহররম মাসের নবম তারিখ বৃহস্পতিবার দিন হযরত ইমাম হোসাইন নিজের তাঁবুর সামনে তরবারির উপর ভর দিয়ে মাথা নিচু করে বসে

১. আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৮: ১৭৫, ১৭৬।
২. আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৮: ১৭৫, ১৭৬।

ছিলেন। এমন সময় তাঁর তন্দ্রা এসে যায়। এদিকে ইবনে সাআদ তার বাহিনীদের ডাক দিয়ে একত্র করল। বলল, 'হে আল্লাহ্‌র সেপাহীরা! তোমরা সবাই বাহনে উঠে পড়। নিশ্চিত বিজয়ের উল্লাসে ফেটে পড়।' এই কথায় বাহিনীর সকলে আসর নামাজের পর হামলা চালানোর উদ্দেশ্যে ইমাম আলী মকামের তাম্বুর নিকটে পৌঁছে গেল। এজিদ-বাহিনীর হৈ-হট্টগোল শুনে তাঁর দুধবোন হযরত যায়নাব দৌড়ে এসে তাঁকে জাগিয়ে দিলেন। তিনি মাথা তুলতেই বললেন,

إِنِّيْ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَنَامِ فَقَالَ لِيْ أَنَّكَ تَرُوْحُ إِلَيْنَا،

–স্বপ্নে আমি আল্লাহ্‌র রাসূলকে দেখেছি। তিনি আমাকে বলেছেন, তুমি আমার কাছে চলে এস!

বোন যায়নাব বললেন, يَوَيْلَتَاهُ 'হায় রে মুসিবত!'

তিনি বললেন, 'বোন আমার! দুশ্চিন্তা করো না। ধৈর্যধারণ কর। আল্লাহ্ তোমার উপর রহমত করুন।'

হযরত ইমাম হোসাইনের ভ্রাতা হযরত আব্বাস বললেন, 'ভাই! তারা তো দেখছি তোমার দিকেই ধেয়ে আসে!' তিনি বললেন, 'তুমি গিয়ে তাদের জিজ্ঞাসা কর, তোমাদের কী চাই?' হযরত আব্বাস প্রায় বিশজন আরোহী সাথে নিয়ে এজিদ-বাহিনীর দিকে অগ্রসর হলেন। কাছে গিয়ে বললেন, 'তোমাদের উদ্দেশ্য কী?' তারা বলল, 'আমীর ইবনে যিয়াদের নির্দেশ, আপনারা তাঁর বশ্যতা স্বীকার করে নিন। অন্যথায় আমরা আপনাদের সাথে যুদ্ধ করতে বাধ্য হব।' হযরত আব্বাস বললেন, 'একটু দাঁড়াও। আমি এ কথা হযরত হোসাইনকে জানাচ্ছি!' এ কথা বলেই তিনি সাথীদের সেখানে রেখেই হযরত ইমাম হোসাইনের কাছে ফিরে গেলেন। গিয়েই তিনি ইমাম আলী মকামকে তাদের উদ্দেশ্যের কথা জানালেন। তিনি বললেন, 'তাদের কাছে গিয়ে বল, আমাকে একটি রাত সময় দিতে। আমি যেন জীবনের শেষ রাতটিতে ইচ্ছা মত নামাজ পড়তে পারি, ফরিয়াদ করতে পারি, তওবা ও ইস্তেগফার করতে পারি! আল্লাহ্ জানেন, নামাজ, তিলাওয়াত, ফরিয়াদ, তওবা ও ইস্তিগফার এগুলো আমার মনের খোরাক!'

হযরত আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু ইবনে সাআদের সেনাদলের কাছে গিয়ে বললেন, 'আমাদের আজ একটি রাত সময় দাও। আমরা কিছু এবাদত-বন্দেগী করে নেব। এই বিষয়টি নিয়েও আরো কিছু ভেবে দেখব। আমাদের মাঝে যা সিদ্ধান্ত হয় আগামীকাল সকালে তোমাদের জানিয়ে দেব।' ইবনে সাআদের সেনাদল তা মেনে নিল।

সাথীদের উদ্দেশ্যে ইমাম হোসাইনের বক্তব্য :

ইবনে সাআদের সেনাদল ফিরে যাওয়ার পর হযরত ইমাম হোসাইন রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু সাথীদের আহ্বান করলেন। তাঁরই পুত্র হযরত যাইনুল আবেদীন বলছেন, 'আমি অসুস্থ অবস্থাতেই আমার আব্বাজানের পাশে গিয়ে বসেছিলাম তিনি কী বলছেন তা শোনার জন্য।'

আল্লাহ্ তা'আলার হামদ ও সনা, রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর সালাত ও সালামের পর সাথীদের উদ্দেশ্যে তিনি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কিছু কথা বললেন। তিনি বললেন, 'আমি অন্য কারো সাথীকে আমার সাথীদের চাইতে বিশ্বস্ত ও সেরা মনে করি না। আমি অন্য কারো পরিবারের লোকজনকে আমার আহ্লে-বাইতের লোকজনদের চাইতে অধিক শিষ্ট, ভদ্র, ন্যায়নীতিবান ও আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষাকারী রূপে দেখি না। আল্লাহ্ তা'আলা আপনাদের সবাইকে আমার পক্ষ থেকে উত্তম প্রতিদান দিন। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আগামী দিনটি হবে আমাদের সাথে দুশমনদের যুদ্ধের দিন। আমি আপনাদের সবাইকে বিনা দ্বিধায় অনুমতি দিচ্ছি, যার ইচ্ছা রাতের অন্ধকারেই চলে যান। আমার পক্ষ থেকে কোন আপত্তি থাকবে না। আপনারা প্রত্যেকেই একটি করে উট নিন। আর আমার আহ্লে-বাইত থেকে একজন করে সাথী নিন। তারপর আপনারা স্বদেশ অভিমুখে রওয়ানা হয়ে যান। আল্লাহ্ এই মুসিবত থেকে আপনাদের সবাইকে রক্ষা করুন। এরা কেবল আমাকেই হত্যা করতে চায়। আমাকে হত্যা করতে পারলে অন্য কারো প্রতি এরা ভ্রূক্ষেপ করবে না।'

তাঁর ভ্রাতা, সন্তান ও ভাতুষ্পুত্রগণ আবেদন করলেন, 'আপনাকে ছাড়া আমাদের জীবনই তো বৃথা! আল্লাহ্ তা'আলা এমন দুর্দিন আমাদেরকে না দেখান যে, আমাদের মাঝে আপনি থাকবেন না, অথচ আমরা বেঁচে থাকব!'

তিনি হযরত আকীলের সন্তানদের উদ্দেশ্যে বললেন, 'হে আকীলের সন্তানেরা! তোমাদের পক্ষে তোমাদের ভ্রাতা মুসলিমের হত্যাই যথেষ্ট। তোমরা ওয়াপস

চলে যাও। তোমাদেরকে আমি চলে যেতে বলছি!' সহমর্মিতা ও সহযোগিতার মনোভাবে অটল ভাইগণ বললেন, 'লোকে কী বলবে, আমরা যদি দুনিয়ায় স্বাচ্ছন্দে বেঁচে থাকার লালসে আমাদের অস্তিত্বাদিত নেতা, আমাদেরই গুরুজন, আমাদেরই শ্রেষ্ঠ সন্তানকে ছেড়ে চলে যাই! একটি তীরও না মেরে, একটি বর্শাও নিক্ষেপ না করে, তরবারিও না চালিয়ে– কেবল এই দুনিয়ায় বেঁচে থাকার বাসনায়! কক্ষণো হতে পারে না! আল্লাহ্র কসম, এ হতেই পারে না, আমরা তা কখনো মেনে নিতে পারি না! বরং আমরা আমাদের জান-মাল ও পরিবার-পরিজন সব কিছু আপনার জন্য কুরবান করে দিতে চাই! আমরা আপনাকে কেন্দ্র করেই আপনার সাথী হয়ে থেকে দুশমনদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যাব! আপনার যা পরিণতি হবে, আমাদের ভাগ্যেও তাই হোক! আপনাকে হারিয়ে জীবিত থাকার কোন মানেই হয় না!!'

অপরাপর সাথীরাও এ ধরনের জযবা ও আগ্রহের কথা প্রকাশ করলেন। তাঁরা বললেন, 'আল্লাহ্র কসম, আমরা আপনাকে এখানে রেখে চলে যেতে পারি না। আপনার জন্য আমরা আমাদের জীবন উৎসর্গ করে দিতে চাই! আমরা জীবনের শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে হলেও আপনাকে শত্রুর আক্রমণ থেকে রক্ষা করব! আমাদের জীবন দিয়েই মনকে প্রবোধ দিতে পারব, আমরা ফরজ কাজটি আদায় করেছি![১]

সাথী ও আহ্লে-বাইতগণের এমন ধরনের জযবা ও আগ্রহ দেখে তিনি তাঁদের নির্দেশ দিলেন, 'তোমরা রাতারাতি তাম্বুগুলো কাছাকাছি করে নাও। তাঁবুর রশিগুলো একটির সাথে আরেকটি মিলিয়ে নাও। যাতে করে তাঁবুর দিকে অগ্রসর হওয়ার একটি পথ ছাড়া দুশমনদের জন্য আর কোন পথই না থাকে। আমাদের ডানে, বামে ও পশ্চাতে তাঁবু আর তাঁবুই থাকবে।'

হযরত ইমাম হোসাইনের নির্দেশে তাঁবুগুলো ঠাসাঠাসি করে সাজিয়ে নেওয়ার পর সাথীগণ তাঁর সাথে সারা রাত নফল নামাজে মগ্ন হয়ে গেলেন। সকলে আজেযী এনকেসারী ও অনুনয় বিনয় সহকারে গুনাহ্ মার্জনার ফরিয়াদে রত থাকলেন।[২]

[১] আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৮: ১৮৬, ১৮৭। তাবারী, ৬: ৩। ইবনে আছীর, ৪: ৫৭, ৫৮।
[২] আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৮: ১৭৭। ইবনে আছীর, ৪: ৫৯।

৬১-র ১০ই মুহররম ঃ ছোট কেয়ামত!

৬১ হিজরীর ১০ই মুহররম। পূবাকাশে উদিত হল রক্তিম সূর্য। সারা গায়ে তার রক্তের আভা! ওমর বিন সাআদ সাথীদের নিয়ে ফজরের নামাজ পড়ে নিয়েছে। এবার সে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হল। এদিকে হোসাইনী কাফেলার বাহাত্তরজন জীবনোৎসর্গকারী হোসাইনী সেনা হযরত ইমাম হোসাইনের ইমামতিতে ফজরের নামাজ আদায় করলেন। এবার তাঁরা এজিদী বাহিনীর মোকাবেলার জন্য কারবালার ময়দানে কাতারবন্দী হয়ে গেলেন। হোসাইনী কাফেলার জীবন বাজি রাখা বাহাত্তরজন শার্দুল শাবকের ৩২ জন ছিলেন অশ্বারোহী আর ৪০ জন ছিলেন পদাতিক। দক্ষিণ বাহুতে মোতায়েন করলেন হযরত যোহাইর বিন কায়সকে এবং বাম বাহুতে মোতায়েন করে দিলেন হযরত হাবীব বিন মুজাহিরকে। ইসলামের চির উড্ডীন শাশ্বত ধ্বজাটি ধরিয়ে দিলেন আপন ভ্রাতা হযরত আব্বাস বিন আলীর হাতে। তাঁবুতে অবস্থানরত নারীদের পেছনে রেখে সবাই দাঁড়িয়ে গেলেন।

হযরত ইমাম হোসাইনের নির্দেশে সাথীগণ রাতারাতি তাঁবুর পেছন দিকটিতে খন্দক খুঁড়ে নিলেন। সেটি ভরে দেওয়া হল শুকনো জ্বালানী, বাঁশ ও নারকেল ইত্যাদি কাঠ দিয়ে। তাঁরই নির্দেশে খন্দকে পুরে দেওয়া কাঠগুলোতে জ্বালিয়ে দেওয়া হল আগুন। যাতে করে কেউ পেছন থেকে তাঁবুর দিকে না আসতে পারে।[১]

এবার হযরত ইমাম হোসাইন অশ্বে আরোহন করলেন। সম্মুখে রাখলেন আল্লাহ্‌র কালাম কোরান শরীফ। হাত দুইখানি উপরের দিকে উঠিয়ে দিয়ে আল্লাহ্‌র দরবারে দোয়া করলেন!

'হে আল্লাহ্! তুমিই আমাদের একমাত্র ভরসা। তুমি আমাদের একমাত্র আশ্রয়। তুমিই আমাদের একমাত্র মদদগার। তুমিই আমাদের উৎসাহ উদ্দীপনা। এমন অনেক বেদনা আছে, মন বসে যায়। সেই বেদনা থেকে রেহাই পাওয়ার আশা ক্ষীণই হয়ে যায়। বন্ধু-বান্ধব, আপনজন সবাই ত্যাগ করে চলে যায়। দুশমন আনন্দিত হয়। কিন্তু এহেন অবস্থাতেও আমি এক মুহূর্তের জন্যও তোমাকে বাদ দিই নি। তোমার দিকেই চেয়ে রয়েছি। মনের বেদনা-বিষাদ সব তোমাকেই শুনিয়েছি। তুমি বিনে কাউকে বলার ইচ্ছা আমার হয় নি। হে আল্লাহ্! তুমি বারে বারে মুসিবতগুলো আমার উপর থেকে হটিয়ে দিয়েছ। তুমি

১. আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৮: ১৭৮।

বারে বারে আমাকে বাঁচিয়ে নিয়েছ। তুমিই সকল নেয়ামতের মালিক। সব ধরনের কল্যাণ তোমারই হাতে। তুমিই সকলের নিরাশার আশা!'

وہ صبر دے الٰہی! جس میں خلل نہ آئے
تیروں پہ تیر کھاؤں اور پہ بل نہ آئے

ধৈর্য এমন দাও হে খোদা! পাষাণ যেমন অটল রহে!
বক্ষ ভেদি' তীর চলে যাক, অক্ষি ভেদি' আঁশু নহে!!

চূড়ান্ত দলিল :

হযরত ইমাম হোসাইন রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু এজিদী বাহিনীর নিকটে এলেন। তারপর বুলন্দ আওয়াজে বললেন, 'হে লোকসকল! আমি তোমাদের কিছু উপদেশ দিতে চাই। তোমরা তা মনোযোগ দিয়ে শোন।' তাঁর এই কথায় সবাই নীরব হয়ে গেল। তিনি আল্লাহ্‌র হামদ ও সনার পর বললেন, 'হে লোকসকল! তোমরা যদি আমার ওজর মেনে নাও এবং আমার সাথে ন্যায় আচরণ কর, তা হলে তা হবে তোমাদের জন্য সৌভাগ্যের বিষয়। আমার সাথে বাড়াবাড়ি করার অধিকার মূলত তোমাদের নাই। তোমরা যদি আমার ওজর কবুল না কর।' অতঃপর তিনি আয়াতটি পাঠ করলেন:

فَأَجْمِعُوٓا۟ أَمْرَكُمْ وَشُرَكَآءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ثُمَّ ٱقْضُوٓا۟ إِلَىَّ وَلَا تُنظِرُونِ

–তবে তোমরা আর তোমাদের শরিকরা একটি বিষয়ে স্থির সিদ্ধান্ত হয়ে যাও। তাহলে সেই বিষয়টি তোমাদের কারো কাছে গোপন থাকবে না। তারপর আমার বিরুদ্ধে তোমাদের সিদ্ধান্ত মতে কাজ চালিয়ে যাও। আমাকেও কোন অবকাশ দেবার দরকার নাই।[১]

إِنَّ وَلِيِّىَ ٱللَّهُ ٱلَّذِى نَزَّلَ ٱلْكِتَٰبَ ۖ وَهُوَ يَتَوَلَّى ٱلصَّٰلِحِينَ ﴿١٩٦﴾

–নিশ্চয় আমার সাহায্যকারী আল্লাহ্, যিনি কিতাব নাযিল করেছেন। আর তিনি সৎ ও ন্যায়পরায়নদের অভিভাবক।[২]

১. সূরাঃ ইউনুস, ১০: ৭১।
২. সূরাঃ আরাফ, ৭: ১৯৬।

তাঁবুতে অবস্থানরত তাঁর বোন ও কন্যাগণ যখন তাঁর এই বক্তব্য শুনলেন, তাঁদের কান্নার আওয়াজ বড় হতে লাগল। তিনি বললেন, 'আল্লাহ্! তুমি ইবনে আব্বাসের হায়াত দরাজ কর'। তিনি বলেছিলেন, 'যতদিন পর্যন্ত যাতায়াতের পথ সুগম ও সহজতর না হবে, ততদিন মহিলাদের সাথে নেওয়া ভাল হবে না, তাদের বরং মক্কাতেই রেখে যান।' এরপর তিনি আপন ভ্রাতা হযরত অব্বাস বিন আলীকে পাঠালেন। তিনি গিয়ে মহিলাদের কান্না থামালেন। মহিলাদের কান্না বন্ধ হওয়ায় তিনি সকলের দিকে দৃষ্টি দিলেন। নিজের শ্রেষ্ঠত্বের, মহত্বের, বংশীয় গৌরব ও আভিজাত্যের এবং বংশ কৌলিণ্যের দিকটিও তুলে ধরলেন। তিনি বললেন, 'হে লোকসকল! তোমরা সবাই নিজেদের বগলের গন্ধ শুঁকে দেখ। নিজেদের পরিসংখ্যান চালাও। আমাকে হত্যা করা কি তোমাদের উচিত কাজ হবে? আমি হলাম তোমাদের নবীরই কন্যার পুত্র। নবীর দৌহিত্র বলতে বর্তমানে দুনিয়াতে কেবল আমিই আছি। আলী হচ্ছেন আমারই পিতা। জাফর যুল জানাহীন হলেন আমার পিতৃব্য। সাইয়েদুশ শুহাদা হযরত হামজা আমার পিতার পিতৃব্য। আমার আর আমার ভ্রাতা সম্পর্কে আল্লাহ্র রাসূল বলেছেন : هَذَانِ سَيِّدَا أَشْبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ 'এরা দুইজন হলেন যুবক জান্নাতবাসীদের সর্দার।' তোমরা যদি আমার কথাগুলো সত্য জ্ঞানে স্বীকার কর, তাহলে সেটিই হবে ভাল কাজ। আল্লাহ্র কসম, যখন থেকে আমি জানতে পারি যে, মিথ্যার উপর আল্লাহ্র গজব নাযিল হয়ে থাকে, সেই থেকে আমি কখনো মিথ্যা বলার ইচ্ছাটিও করি নি। তোমরা যদি এই কথার সত্যায়ন না কর যে, আমি জান্নাতের যুবকদের সর্দার, তাহলে আল্লাহ্র রাসূলের সাহাবা জাবের বিন আবদুল্লাহ্, আবু সাঈদ, যায়দ বিন আরকাম আর আনস বিন মালেকের কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা কর। তারা এই কথার সত্যায়ন করে কি না দেখ। তোমাদের জন্য আফসোস হয়। তোমরা কি আল্লাহ্কে ভয় কর না? আমার এসব কথার কোনটাই কি আমাকে হত্যা করা থেকে তোমাদের বারণ করতে পারে না?'

তিনি বললেন, 'হে লোকসকল! তোমরা আমার পথ ছেড়ে দাও। আমি নিরাপদ কোথাও চলে যাই।' তারা বলল, আপনারই চাচার বংশ ইবনে যিয়াদের হুকুম মেনে নিতে আপনার আপত্তি কোথায়? তিনি বললেন, 'নাউযু বিল্লাহ্।' এরপর তিলাওয়াত করলেন :

إِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُم مِّن كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لَّا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ الْحِسَابِ

–আমি সেসব অহংকারীদের ব্যাপারে, যারা প্রতিদান দিবসে বিশ্বাস করে না, আমার এবং তোমাদের রবের কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করি।[১]

এবার তিনি তাঁর বাহনকে বসালেন। প্রতিপক্ষ বাহিনীকে উদ্দেশ্য করে বললেন, 'তোমরাই বল, তোমরা আমার নিকট হতে কার খুনের বদলা নিতে চাও? আমি কি তোমাদের সম্পদ বিনষ্ট করেছি? কাউকে কোন রূপ আঘাত করেছি? যার প্রতিশোধ তোমরা নিতে চাও!' তারা সকলে নিরুত্তর হয়ে থাকল। এরপর তিনি চিৎকার করে করে বললেন, 'হে শীষ বিন রাবঈ! হে হেজাজ বিন জবর! হে কাইস বিন আশ্আস! হে যায়দ বিন হারেছ! তোমরাই কি আমাকে লিখেছিলে না, ফল পেকেছে! বাগান ফুলে-ফলে ভরপুর হয়ে গেছে! আপনি আমাদের মাঝে চলে আসুন! আপনি আপনার এক অকুতোভয় বাহিনীর কাছে চলে আসুন!' তারা বলল, 'আমরা আপনাকে কোন চিঠিই দিই নি!' তিনি বললেন, 'সুবহানাল্লাহ্! তোমরা অবশ্যই লিখেছিলে!' তিনি আবার বললেন, 'হে লোকসকল! তোমরা যখন আমার উপর অসন্তুষ্ট হয়েছ, তাহলে আমার পথ ছেড়ে দাও; আমি তোমাদের নিকট হতে দূরে কোথাও নিরাপদে চলে যাই!' কাইস বিন আশ্আস বলল, 'আপনি আপনার চাচার বংশ ইবনে যিয়াদের হুকুম মেনে নিচ্ছেন না কেন? তিনি তো আপনার কোন ক্ষতি করবেন না। আপনি যে রূপ চান তিনি তো আপনার সাথে সেরূপই ব্যবহার করবেন।' জবাবে তিনি বললেন, 'তুমিও তো তোমার ভাইয়েরই ভাই।' (কুফবাসীরা যখন হযরত মুসলিম বিন আকীলের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াল, তখন তিনি 'তাওআ' নামের এক বৃদ্ধের গৃহে আশ্রয় নিয়েছিলেন। সে কথা বৃদ্ধের পুত্র বেলাল প্রচার করে দিয়েছিল। এই গোপন সংবাদটি জানতে পেরেছিল মোহাম্মদ বিন আশ্আস, যে ছিল কায়স বিন আশআসেরই ভাই। ইবনে যিয়াদ একটি সেনাদল সাথে দিয়ে মোহাম্মদ বিন আশআসকে পাঠাল ইমাম মুসলিম বিন আকীলকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে আসার জন্য। মুসলিম বিন আকীল যখন বীরদর্পে মোকাবেলা করলেন আর সে যখন বুঝতে পারল যে, তাঁকে গ্রেপ্তার করা সহজ নয়, তখন মোহাম্মদ বিন আশআস ইমাম মুসলিম বিন আকীলকে নিরাপত্তা ও আশ্রয় দেবার প্রতারণায় ফেলে গ্রেপ্তার করিয়েছিল। হযরত ইমাম হোসাইনের কথাটির অর্থ এই ছিল যে, তোমার ভাই যেমন করে প্রতারণার আশ্রয় নিয়ে মুসলিম বিন আকীলকে গ্রেপ্তার করিয়েছিল, আমাকেও তুমি একই কায়দায় গ্রেপ্তার করতে

১. সূরা: মুমিন, ৪: ২৭।

চাও।) তুমি কি চাও যে, মুসলিম বিন আকীলের ছাড়া আরো কোন খুনের বদলাও বনু হাশেমরা তোমারদের কাছে দাবী করুক? তা কখনো হয় না, আল্লাহ্‌র কসম, আমি অপমানের বোঝা মাথায় নিয়ে নিজেকে তাদের হাতে তুলে দেব না। গোলামের ন্যায় দাসখৎ দিয়ে অকৃত অপরাধও স্বীকার করব না।'[১]

হুরের তওবা :

ওমর বিন সাআদ যুদ্ধ শুরু করে দেওয়ার মতলব নিয়ে যখন সামনের দিকে অগ্রসর হল, হুর্ বিন এজিদ তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আল্লাহ্ তোমাকে হেদায়ত করুন! তুমি কি এই মহানুভব ব্যক্তিত্বের (ইমাম হোসাইনের) বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে যাও?' সে বলল, 'আল্লাহ্‌র কসম, যুদ্ধ কম হলেও এমন তো হবেই, যাতে হয় কাটা যাবে শির, না হয় হাত-পায়ের ন্যায় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ!' হুর্ বললেন, 'তাঁর এতগুলো উক্তির একটিও কি তোমাদের কাছে গ্রহণযোগ্য হল না!' ইবনে সাআদ বলল, 'আল্লাহ্‌র কসম, বিষয়টি যদি আমার এখতিয়ারভুক্ত থাকত, তাহলে অবশ্য তা-ই করতাম। কিন্তু করার তো কিছুই নাই। তোমাদের আমীর যে মানেন না!'

একথা শুনে হুর্ আসল মতলব বুঝতে পারলেন। তাঁর অন্তরাত্মায় কাঁপুনি সৃষ্টি হল। এ অবস্থা দেখে তাঁরই গোষ্ঠীর জনৈক ব্যক্তি বলল, 'আল্লাহ্‌র কসম, আজ তোমার মাঝে অভূতপূর্ব অবস্থা দেখতে পাচ্ছি। কোন যুদ্ধেই আমি তোমার এমন রূপ দেখি নি। অথচ আমার দৃষ্টিতে তুমি কুফার অন্যতম একজন বীর পুরুষ। আজ তোমার এ অবস্থা কেন!' হুর্ বললেন, 'খোদার কসম, এখন একদিকে আমার বেহেশ্‌ত, অন্য দিকে দোযখ। আমি এক দুদোল্যমান পরিস্থিতির শিকার। আমি এখন কোন্ দিকে যাই?' কিছুক্ষণ নীরব থাকার পর বললেন, 'আমাকে তো বেহেশ্‌তের দিকেই যেতে হবে। আমাকে কেটে টুকরো টুকরো করা হোক। হোক আমাকে জীবিত পুড়িয়ে দেওয়া!' এই কথা বলে তিনি ঘোড়ার গায়ে মৃদু পদাঘাত করলেন। আর মুহূর্ত মধ্যেই ইমাম আলী মকামের নিকট চলে এলেন।

হযরত ইমাম হোসাইনের নিকট এসেই হুর্ আবেদন জানালেন, 'হে আল্লাহ্‌র রাসূলের পুত্র! আপনার জন্য আমার প্রাণ উৎসর্গিত। আমি সেই বদ নসীব, যে আপনাকে ফিরে যেতে দিই নি। সারা পথ আপনাকে পাহারা দিয়ে

[১]. আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৮: ১৭১। ইবনে আছীর, ৪: ৬১, ৬২।

রেখেছিলাম। এই স্থানে এসে তাঁবু খাটানোর জন্য আপনাকে বাধ্য করেছিলাম। এক আল্লাহ্‌র নামে কসম করে বলছি, আমি যদি আগে থেকে জানতাম যে, এরা আপনার সাথে এই রূপ ব্যবহার করবে, তাহলে আমি কখনো তাদের পক্ষ নিতাম না। যেসব বেয়াদবি আমার হয়ে গেছে, সেসব বেয়াদবি করতে হত না। এখন আমি অনিচ্ছাকৃত ভুলের জন্য অত্যন্ত লজ্জা অনুভব করছি। আমি আল্লাহ্‌র দরবারে তাওবা করছি। আমার এই জীবন আপনার জন্য কুরবান করে দেওয়ার ওয়াদা করছি। দয়া করে আপনি বলুন, আমার তাওবা কবুল হবে কি না?' তিনি বললেন, 'হাঁ, তোমার তাওবা আল্লাহ্ কবুল করবেন। তোমাকে মাফও করে দেবেন। তোমার নাম কী শুনি?' বললেন, 'আমার নাম হুর্ বিন এজিদ!' তিনি বললেন, 'দুনিয়া ও আখিরাতে তুমি হুরই থাকবে (আজাদই থাকবে)। ঘোড়া থেকে নেমে আস!' হুর্ বললেন, 'এই মুহূর্তে নিচে নেমে আসতে পারি, কিন্তু ওসব শত্রুদের বিরুদ্ধে আপনার জন্য আমার জীবন দিয়ে দেব।' তিনি বললেন, 'তোমার ইচ্ছা তুমি পূরণ করিও। আল্লাহ্ তোমাকে রহমত করুন!'[১]

কুফাবাসীদের উদ্দেশ্যে হুরের বক্তব্য :

হযরত ইমাম হোসাইনের জন্য প্রাণোৎসর্গকারীদের তালিকাভুক্ত হওয়ার পর হুর্ কুফাবাসীদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিলেন। তিনি বললেন, 'হে কুফাবাসীরা! স্বয়ং তোমরাই হোসাইনকে দাওয়াত দিয়েছিলে। তিনি যখন এলেন, তোমরা তাঁকে দুশমনদের হাতে তুলে দিয়েছ। তোমরাই তো বলেছিলে, তাঁর জন্য তোমরা প্রাণ সঁপে দিতে প্রস্তুত রয়েছ। এখন তো তোমরা তাঁর উপর হামলা করতে, তাঁকে প্রাণে বধ করতেই বদ্ধপরিকর! তাঁকে তোমরা আল্লাহ্‌র জমিনে কোথাও চলেও যেতে দিচ্ছ না। যে জমিনে জীব-জন্তুরা পর্যন্ত বিনা বাধায় চলাফেরা করে। তোমরা তাঁর ও তাঁর সাথীদের জন্য ফোরাত নদীর পানি জব্দ করে রেখেছ। অথচ এই ফোরাতের পানি পান করেই তৃষ্ণা মেটায় কুকুর শুয়রেরাও। এদিকে হোসাইন আর তাঁর সাথীরা আজ বুক ফাটা পিপাসায় কাতর। তোমরা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের পর তাঁর আহ্‌লে-বাইতের সাথে অত্যন্ত জঘন্য আচরণ করেছ। তোমরা যদি তাওবা না কর আর যে অসৎ উদ্দেশ্যে বদ্ধপরিকর হয়ে তোমরা আজ এখানে সমবেত হয়েছ, তা যদি পরিহার না কর, তাহলে মনে রাখিও, কঠোর পিপাসার দিনে আল্লাহ্ তোমাদেরকে পানি থেকে বঞ্চিত রাখবেন।'

[১]. আত্ তাবারী, ৬: ৩১।

সাথে সাথে ইবনে সাআদের সেনারা হুরকে লক্ষ্য করে তীর ছুঁড়া আরম্ভ করে দিল। হুর পিছু হটে হযরত ইমাম হোসাইনের সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন।[১]

যুদ্ধের সূচনা :

হুরের পিছু হটে আসার পর ইবনে সাআদ পতাকা হাতে সামনের দিকে অগ্রসর হল। তারপর একটি তীর ছুঁড়ল হযরত হোসাইন রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর প্রতি। আর বলল, 'আল্লাহ্ সাক্ষী! শুরুর তীরটি আমিই ছুঁড়লাম!' এর পর তুমুল যুদ্ধ বেধে গেল। এই পক্ষও তীর চালাতে লাগলেন। প্রথমে চলল মল্ল যুদ্ধ। এই পক্ষের একজনের বিরুদ্ধে ওই পক্ষের একজন করে যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে লাগল। যার যার বীরত্ব প্রদর্শনের এক হিড়িক যেন চলছিল কারবালার ময়দানে![২]

দিনটি কেবল মল্ল যুদ্ধেই শেষ হল। সৌর্যবীর্য ও বীরত্বের কারণে সেদিনের একক মল্ল যুদ্ধে হযরত ইমাম হোসাইনের সাথীরাই জয়ী হলেন। তাই বিশেষ মহল ওমর বিন সাআদকে একক মল্ল যুদ্ধ বাদ দিয়ে উন্মুক্ত হামলার পরামর্শ দিল। অতএব, ইবনে সাআদও ঢালাও যুদ্ধের ঘোষণা দিয়ে দিল।

যিল জওশনের পুত্র শিমার যে কি না এজিদী সেনাশ্রেণির বাম বাহুর সর্দার ছিল, সর্বপ্রথম সে-ই হযরত ইমাম হোসাইনের দলের বাম বাহুটিতে আক্রমণ চালানো আরম্ভ করে দিল। এর পর পরই এজিদী বাহিনীর সেনারা হযরত ইমাম হোসাইনের পক্ষের লোকদের উপর ঝটিকা আক্রমণে ঝাঁপিয়ে পড়ল। ইমাম আলী মকামের পক্ষে আরোহী যোদ্ধা ছিলেন কেবল বত্রিশ জন। তা সত্ত্বেও তাঁরা অসম সাহসিকতা, বীরত্ব ও বাহুদুরী প্রদর্শন করেন। যেদিকেই তাঁরা ধেয়ে চললেন এজিদী বাহিনীর সেনাদের ব্যূহ তছনছ করে দিতে লাগলেন। তাদের ভীরু-কলিজায় কাঁপ ধরিয়ে দিতে লাগলেন। ভরাডুবির শেষ করে দিতে লাগলেন তাদের। শুর্রা বিন কায়স যে কি না আরোহীদের সর্দার ছিল, চতুর্দিক থেকে সে যখন দেখতে পেল যে, তার বাহনগুলো পলায়নের পথ ধরেছে, তখন আবদুর রহমান বিন হোছাইনকে ইবনে সাআদের কাছে পাঠিয়ে দিল। বলল, 'তুমি নিজেই তো দেখতে পাচ্ছ যে, এই সামান্য আরোহী সেনারা আমার আরোহী সেনাদের পৃষ্ঠ প্রদর্শনে বাধ্য করেছে। এখন তো আমার আরোহী সেনারা এদিক-সেদিক ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হয়ে ধেয়ে প্রাণ বাঁচানোতে মশগুল

[১]. আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৮: ১৮০, ১৮১।
[২]. আত তাবারী, ৬: ৩১।

হয়ে গেছে। তাই, দেরি না করে কিছু পদাতিক ও তীরন্দাজ বাহিনী পাঠিয়ে দাও।' শুর্রা বিন কায়সের আবেদনের প্রেক্ষিতে ইবনে সাআদ শীষ বিন রাবঈকে যুদ্ধে যাবার নির্দেশ দিল। কিন্তু সে অস্বীকৃতি জানাল। ইবনে সাআদ এবার হোছাইন বিন নমীর তামীমীকে ডাকল। তার সাথে সমুদয় বর্মধারী সেনাসহ পাঁচশত তীরন্দাজ পাঠিয়ে দিল। তীরন্দাজ বাহিনীর সেনারা হযরত ইমাম হোসাইনের সাথীদের কাছাকাছি যেতে না যেতেই বৃষ্টির ন্যায় তীর বর্ষণ করতে আরম্ভ করে দিল। কিছুক্ষণের মধ্যেই ঘোড়াগুলোকে জখম ও নিষ্কর্ম করে দেওয়া হল। হযরত ইমাম হোসাইনের সেনাদলের অটলত্বে এতটুকু পরিবর্তনও পরিলক্ষিত হল না। তাঁরা সাথে সাথে অশ্ব থেকে নেমে পড়লেন। পদাতিক বাহিনী রূপে যুদ্ধ চালিয়ে যেতে লাগলেন। তাঁরা বীরদর্পে প্রাণপণে এমন তুখোড় যুদ্ধ চালিয়েছিলেন যে, কুফাবাসীদের বিষদাঁতই ভেঙ্গে গিয়েছিল।[১]

তাঁবুতে অগ্নি সংযোগ :

হযরত ইমাম হোসাইন রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু তাঁবুগুলোকে এমনভাবে গাদাগাদি করে খাটিয়ে নিয়েছিলেন যে, কুফাবাসীদের জন্য এদিকে আসার একটিমাত্র পথ ছাড়া অন্য সব রাস্তাই বন্ধ ছিল। চতুর্দিক থেকে আসা যাবে এই মনে করে ইবনে সাআদ তাঁবুতে আক্রমণ চালানোর নির্দেশ দিয়ে দিল। সে বলল, 'তাঁবুগুলো উপড়িয়ে দাও'। কুফাবাসীরা যেই তাঁবু উপড়াবার মানসে অগ্রসর হচ্ছিল, তখন ইমাম আলী মকামের সাথীদের একটি অংশ তাঁবুর ভেতরে এসে অবস্থান নিলেন। তাঁরা সেখান থেকে তাঁবু উপড়াতে আসা লোকজনের উপর তীর, বল্লম, বর্শা ইত্যাদি ছুঁড়ে ছত্রভঙ্গ করে দিলেন এবং তাদের পৃষ্ঠপ্রদর্শনে বাধ্য করলেন। ইবনে সাআদ যখন তার বাহিনীর পরাজয় ও অপারগতা দেখতে পেল, সাথে সাথে নির্দেশ দিল তাঁবুগুলোতে অগ্নি সংযোগ করতে। অতএব, তাঁবুতে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হল। তাঁবুগুলোও জ্বলতে লাগল। হযরত ইমাম হোসাইন রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু এ অবস্থা দেখে বললেন, 'তাদেরকে তাঁবু জ্বালিয়ে দিতে দাও। এই আগুনই তাদের জন্য বাধা হবে। প্রথমে তাঁবুগুলো বাধা ছিল, এখন তাদের দেওয়া আগুনই তাদের জন্য বাধা হয়ে দাঁড়াবে। ঠিক তা-ই হল। আগুনের কারণে এজিদী বাহিনীর লোকেরা পেছন দিক থেকে হামলা চালাতে পারল না।

[১]. ইবনে আছীর, ৪: ৬৮, ৬৯। আত তাবারী, ৬: ৩২।

অভিশপ্ত শিমার হযরত ইমাম হোসাইনের তাঁবুতে, যেটি ছিল অন্যান্য তাঁবু থেকে আলাদা, আর যেটিতে ছিল শিশু আর নারী, বর্শা নিক্ষেপ করল । আর সাথীদের বলল, এই তাঁবুতেও আগুন জ্বালিয়ে দাও : এই তাঁবুগুলোতে যারা আছে তাদেরও জ্বালিয়ে দাও । হযরত ইমাম হোসাইন তখন ডাক দিয়ে বললেন, 'হে যিল জওশনের পুত্র! তুমি কি আমার আহ্‌লে-বাইতকে আগুনে জ্বালিয়ে দিতে চাও? আল্লাহ্ তোমাকে জাহান্নামের আগুনে জ্বালাবেন ।' শিমারের সাথীদের মধ্য থেকে হুমাইদ বিন মুসলিম শিমারকে বাধা দিল । তাকে উদ্বুদ্ধ করল, তোমার মত বীরের পক্ষে নারীদের উপর এরূপ ব্যবহার করা নিতান্তই লজ্জার কাজ হবে । আল্লাহর কসম, পুরুষদের হত্যা করলেই তো তোমার আমীরকে খুশি করার জন্য যথেষ্ট ।' শিমার কিন্তু তার কথায় রাজি হল না । পরে যখন শীষ বিন রাবঈ বাধা দিল, তখন সে তার মত পাল্টাল ।[১]

হযরত আলী আকবরের শাহাদাত :

কেবল আহ্‌লে বাইতের গুটিকতেক লোকজন ব্যতীত বাদ বাকি সবাই যখন এক এক করে শাহাদাতের অমীয় সুধা পান করে ফেললেন, বনু হাশেম ও নবী-বংশের মধ্য থেকে সর্বপ্রথম হযরত ইমাম হোসাইনের জৈষ্ঠ্য শাহজাদা আঠার বৎসরের রাসূল-সদৃশ টগবটে যুবক আলী আকবর যুদ্ধের ময়দানে পা রাখলেন । তাঁর মুখে তখন উচ্চারিত হচ্ছিল :

أَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ ○ نَحْنُ وَبَيْتُ اللهِ أَوْلَى بِالنَّبِيِّ

تَاللهِ لَا يَحْكُمُ فِينَا ابْنُ الدَّعِيِّ ○ كَيْفَ تَرَوْنَ الْيَوْمَ سُتْرِي عَنْ أَبِي

–আলীর পুত্র হোসাইন যিনি, তাঁরই পুত্র আলী আমি!
আল্লাহ্‌র ঘরের কিরে করি, নবীর খুবই কাছের আমি!
হারামজাদার শাসন সে ছার! আল্লাহ্‌র কসম, চলবে না আর!
তুখড়াবো আজ রণের মাঠ! দেখবে আমার বাবার ঠাঁট![২]

হযরত আলী আবকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হু তরবারি হাতে নিয়ে এজিদী বাহিনীর সেপাহীদেরকে মূলো-গাজরের মত কাটতে শুরু করলেন । হযরত ইমাম হোসাইন এতদিন অপেক্ষায় ছিলেন যুবা সমাজের পূর্ণ আদর্শ, সৌন্দর্যের মূর্তপ্রতীক আপন পুত্রের অদ্ভুত রণকৌশল স্বপক্ষে অবলোকন করবেন, কীভাবে

[১]. ইবনে আছীর, ৪১: ৬৯ ।
[২]. আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৮: ১৮৫ ।

তিনি কারবালার মাঠকে মাতিয়ে রেখেছেন! কিন্তু কারবালার বিষাদময় মরুপ্রান্তরে তাঁকে দেখা যাচ্ছিল না । তিনি কোথায়, কীভাবে, তার কিছুই ইয়ত্তা পাওয়া যাচ্ছিল না । কেবল এই কথাই মনে করা যাচ্ছিল যে, শোচনীয় পরাভবের গ্লানি নিয়ে এজিদী বাহিনীর কাপুরুষ সেনারা যেদিকে পলায়নের পথ নিচ্ছিল তিনি হয়ত সেদিকেই রয়েছেন । হযরত আলী হায়দারে কাররারের দৌহিত্র, নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রাণপ্রিয় এই নাওয়াসা বহুক্ষণ যাবৎ এজিদী বাহিনীর লস্করদেরকে জাহান্নামের পথ ধরিয়ে দেন । দেহে বিশ বিশটি জখমের দাগ নিয়েও তিনি রণে ভঙ্গ দেবার লোক নন । লড়াই করতে করতে তৃষ্ণা যখন তাঁকে নিতান্তই কাবু করে ফেলে, তখন তিনি এক গণ্ডুষ পানি পান করে নতুন করে দম ভরতে আসেন । আব্বাজানকে সম্বোধন করে বললেন, 'আব্বাজান! কোন রকম যদি কেবল এক গণ্ডুষ পানি হয়, সেটুকু দিয়েই জিহ্বা ভিজাব । কাজ যে এখনো বাকি রয়ে গেল!' হযরত ইমাম আলী মকাম বললেন, 'বাবা আলী আকবর! পানি তো নাই! তবে আমার শুকনো জিহ্বাটি না হয় তোমার মুখের মধ্যে পুরিয়ে দিতে পারি!' হযরত আলী আকবর ইমাম আলী মকামের শুকনো জিহ্বাটি চুষলেন । এরপর আবারো ময়দানে ছুটে চললেন । দীর্ঘক্ষণ যুদ্ধ করার পর দেহে অসংখ্য আঘাত নিয়ে অবশেষে ঘোড়ার জিনপোশে এলিয়ে পড়লেন তিনি । এমন সময় একটি বল্লম তাঁর বক্ষে এসে বিধল । হযরত আলী আকবর অশ্বের জিন্ থেকে ঢলে পড়ার সময় আওয়াজ দিলেন يَا أَبَتَاهُ أَدْرِكْنِيْ 'আব্বাজান! আমাকে সামলান' । হযরত ইমাম হোসাইন তৎক্ষণাৎ দৌড়ে পুত্রের নিকটে গেলেন । পুত্র আলী আকবর পিতার দিকে দেখে বললেন, 'আব্বাজান! আপনি কোন রকম বল্লমের এই ফলাটি যদি আমার দেহ থেকে বের করে নিতে পারেন, তাহলে আমি আবারও ময়দানে যাচ্ছি!' সন্তান তাঁর ক্ষত-বিক্ষত দেহ নিয়েও সাহস হারিয়ে রণে ভঙ্গ দেবার মত বীর নন! হযরত ইমাম হোসাইন রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হু অকুতোভয় বীরপুরুষ সৌন্দর্যের মূর্তপ্রতীক আপন পুত্র আলী আকবরকে আপন কোলে তুলে নিলেন । দেখলেন, দেহের সর্বাঙ্গে অসংখ্য আঘাতের চিহ্ন । হযরত ইমাম হোসাইন অনেক সাহস করে বল্লমের ফলাটি হযরত আলী আকবরের দেহ থেকে বের করে নিলেন । কিন্তু সাথে সাথে পিনকি দিয়ে রক্তের ফোয়ারা ছুটল । রক্তক্ষরণ জনিত কারণে পিতার চোখের সামনেই মুসলিম উম্মাহ্‌র সার্থক বীরপুরুষ বীরোত্তম আলী আকবর শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন । ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন!!

এই ঘটনার দিন হযরত ইমাম হোসাইন রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হুর বয়স হয়েছিল ছাপ্পান্ন বৎসর পাঁচ মাস পাঁচ দিন। এই বয়সেও তাঁর মাথার একটি পশম, একটি গোঁফ-দাড়িও সাদা হয় নি। চোখের সামনে যুবা বয়সে আপন পুত্রের অকাল প্রয়াণ তাঁর অন্তরাত্মায় এমন বিরূপ প্রভাব ফেলেছিল যে, ময়দান থেকে তাঁবুতে লাশ নিয়ে আসার এই সংক্ষিপ্ত পরিসরে তাঁর চুল, গোঁফ ও দাড়িগুলো পুরোপুরি সাদা হয়ে গিয়েছিল।

হযরত কাসেম বিন হাসানের শাহাদাত :

নবী বংশের আহলে-বাইতের শহীদ সদস্যদের মধ্যে রয়েছেন হযরত কাসেম বিন হাসানও। তিনি ছিলেন হযরত ইমাম হাসান মুজতবার পুত্র, হযরত ইমাম হোসাইনের ভাতুষ্পুত্র ও তাঁর ভাবী জামাতা। তাঁর সাথে ইমাম হোসাইনের প্রাণপ্রিয়া কন্যা হযরত সকিনার ভবিষ্যৎ বিয়ে শাদীর কথাবার্তা চলছিল। নবী পরিবারের সদস্যরা যখন একের পর এক শহীদ হতে লাগলেন, তখন হযরত কাসেম বিন হাসানও যুদ্ধের ময়দানে যাওয়ার জন্য নিজ পিতৃব্য হোসাইনের কাছ থেকে অনুমতি চাইলেন। বললেন, 'চাচাজান! আপনি আমাকে অনুমতি দিন! আমি ময়দানে যাব, আল্লাহ্র রাহে শির দিয়ে দিতে ইচ্ছা হয় আমার!' হযরত ইমাম হোসাইন রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হু বললেন, 'বাবা! আমি তোমাকে কোন্ দিলে অনুমতি দিতে পারি! তুমি যে আমার জৈষ্ঠ্য ভ্রাতার বংশের একমাত্র প্রদীপ!' তবু হযরত কাসেম নাছোড় বান্দা। তিনি চাচাকে বললেন, 'চাচাজান! আল্লাহ্র ওয়াস্তে আপনি আমাকে দুশমনদের বিরুদ্ধে লড়বার অনুমতি দিন। আজকের এই কারবালার ময়দানে আল্লাহ্র রাহে প্রাণ উৎসর্গ করার সৌভাগ্য থেকে আপনি আমাকে বঞ্চিত করবেন না!' অগত্যা চাচা ইমাম আলী মকাম অশ্রুসজল নয়নে ভাতুষ্পুত্রকে বক্ষের সাথে জড়িয়ে নিয়ে রণক্ষেত্রে যাবার অনুমতি দিলেন।

হযরত কাসেম বিন হাসান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হু ময়দানে গিয়ে হায়দারী বীরত্বের চরম পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করলেন। এজিদী বাহিনীর অসংখ্য সেনাদেরকে জাহান্নামে পাঠিয়ে দিলেন। হযরত কাসেম বিন হাসান রণক্ষেত্রে কীরূপ যে সৌর্যবীর্য দেখিয়েছিলেন, সে সম্পর্কে বর্ণনা করছেন হুমাইদ বিন মুসলিম, যিনি ছিলেন ইবনে সাআদের সেনাদলে। বলছেন, হঠাৎ করে রণক্ষেত্রে আবির্ভাব হতে দেখা গেল চাঁদের মত এক সুদর্শন কিশোরকে। কিশোরটির গায়ে কামিজ, পরণে লুঙ্গি, পায়ে জুতো আর হাতে ছিল নাঙ্গা তরবারি। একটি জুতোর, সম্ভবতঃ বামটির জিহ্বা ছিল ফুটো। কিশোরটি

শার্দুলের ন্যায় গর্জে গর্জে সমগ্র রণক্ষেত্রকে মাতিয়ে তুলেছিলেন আর তুখোড় লড়াইয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন শত্রুর উপর। ওমর বিন এজদী তরবারির ঘা মারে তাঁর শির লক্ষ্য করে। কিশোরটি 'চাচাজান!' বলে চিৎকার দিয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। সঙ্গে সঙ্গে ইমাম হোসাইন তেজিয়ান ব্যাঘ্রের ন্যায় ওমর বিন সাআদ এজদীর উপর তরবারি চালান। সে বাহু দিয়ে রুখে। কনুইয়ের উপর থেকে বাহুটি বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। সে চেঁচামেচি করতে করতে পালিয়ে যায়। কুফাবসীরা তাকে বাঁচাবার জন্য ছুটে। ততক্ষণে সে মাটিতে পড়ে যায় এবং ঘোড়ার পায়ে পিষ্ট হয়। বর্ণনাকারী বলছেন, ময়দানের উড়ন্ত ধূলিবালি কমে গেলে আমি দেখতে পাচ্ছিলাম যে, ইমাম হোসাইন আপন ভাতিজার পাশে দাঁড়িয়ে আছেন। কিশোর হাসান পায়ের এঁড়িগুলো নাড়ছিলেন। হযরত ইমাম হোসাইন বললেন, 'তোমাকে যে কতল করল, সে আল্লাহ্র রহমত হতে চির বঞ্চিত হল! কেয়ামতের দিন সে তোমার নানাজানকে তোমাকে হত্যা করার কী জবাব দেবে! তোমার চাচার পক্ষে এ নিতান্তই অসহনীয় যে, তুমি ডাকবে, অথচ সে জবাব দিচ্ছে না কিংবা সে জবাব দিলেও তাতে তোমার কোন লাভ হচ্ছে না! আল্লাহ্র কসম, তোমার চাচার বিরোধীই দেখা যায় সমধিক আর পক্ষের লোক স্বল্পই!'

অতঃপর ইমাম হোসাইন রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হু বক্ষে জড়িয়ে শহীদ ভাতিজা কাসেমের লাশটি উঠিয়ে নিয়ে আপন সন্তান হযরত আলী আকবর সহ অন্যান্যদের লাশগুলোর পাশে এনে শুইয়ে দিলেন।

বর্ণনাকারী বলছেন, ইমাম আলী মকাম যখন হযরত কাসেম বিন হাসানকে উঠিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলেন তখন তাঁর পাগুলো মাটিতে গেঁড়ে যাচ্ছিল। আমি এখনো তাঁর পাগুলো মাটিতে দাবিয়ে যেতে দেখতে পাচ্ছি। আমি যখন কিশোরটি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম, তিনি আমাকে বললেন, 'এ হচ্ছে হায়দারে কররার আলীর পুত্র হাসানের সন্তান!'[১]

এ পর্যন্ত হযরত আলী আকবর, হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মুসলিম বিন আকীল, হযরত আবদুল্লাহ্ বিন জাফরের দুই পুত্র আওন ও মোহাম্মদ, হযরত আকীল বিন আবি তালিবের দুই পুত্র আবদুর রহমান আর জাফর সহ কাসেম বিন হাসান একের পর এক শহীদ হয়ে যান।

১. আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৮: ১৮৬।

হযরত আলী আসগরের শাহাদাত :

নবী-বংশের উৎসপ্রদীপগণ এক এক করে সকলেই শহীদ হতে চলেছেন। আল্লাহ্‌র ইচ্ছার উপর পরম সন্তুষ্ট হযরত ইমাম হোসাইন রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হু তাঁবুর দরজায় বসে ছিলেন। এমন সময় তাঁরই কনিষ্ঠ পুত্র আলী আসগরকে তাঁর সামনে আনা হল। তিনি তাঁকে কোলে তুলে নিলেন। চুমোয় চুমোয় ভরে দিতে লাগলেন। আদর করতে লাগলেন। এরপর তিনি পরিবার-পরিজনদের অছিয়ত করছিলেন। এই ফাঁকে ইবনে মুকিদুন্নার নামে পরিচিত বনী আসাদ গোত্রের জনৈক ব্যক্তি একটি তীর ছুঁড়ে মারল আলী আসগরকে লক্ষ্য করে। হযরত ইমাম হোসাইনের বাহুর ফাঁক দিয়ে শিশু আলী আসগরকে ভেদ করে বেরিয়ে যায় তীরটি। পিতার কোলে আদর নিতে আসা শিশুর চিরশয়ান যে এভাবে রচিত হবে কে জানে! আলী মকাম হযরত হোসাইন শিশুপুত্র আলী আসগরের রক্ত হাতের তালুতে নিলেন। আসমানের দিকে ছিঁটে মেরে বললেন, 'হে পরওয়ারদেগার! তোমার ইচ্ছায় যদি আমাদের পক্ষে বিজয় না রেখে থাক, তাহলে তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক। এসব জালিমের বিচার তোমার হাতেই তুলে দিলাম।'[১]

অন্য বর্ণনা মতে, হযরত আলী আসগর, যাঁর আসল নাম ছিল আব্দুল্লাহ্ কারবালাতেই ভূমিষ্ঠ হন। ভূমিষ্ট হওয়ার পর পর তাঁকে নিয়ে আসা হয় ইমাম হোসাইনের নিকট। তিনি আপন নবজাতককে কোলে নিয়ে তাঁর কানে আজানের ধ্বনি শোনাচ্ছিলেন। এমন সময় হঠাৎ একটি তীর তাঁর কণ্ঠে এসে বিদ্ধ হয়। সাথে সাথেই তিনি শহীদ হয়ে যান। ইমাম হোসাইন রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হু তাঁর কণ্ঠ থেকে তীরটি টেনে বের করে নেন। এরপর রক্তগুলো হাতের তালুতে করে নিয়ে প্রয়াত সন্তানের সারা দেহে মাখলেন। তারপর বললেন, 'আমি আল্লাহ্‌র কসম করে বলছি, হযরত সালিহ আলাইহিস সালামের উষ্ট্রীর চেয়ে তুমিই আল্লাহ্‌র নিকট সমধিক প্রিয়। আর মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত সালিহ আলাইহিস সালামের চেয়ে আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে সমধিক প্রিয়। হে আল্লাহ্! তুমি যদি আমাদের পক্ষে সাহায্য-সহযোগিতা না করার ইচ্ছা পোষণ করে থাক, তাহলেও আমি সন্তুষ্ট। তুমি তা-ই কর, যাতে আমাদের কল্যাণ ও মঙ্গল নিহিত রয়েছে। আমাদের নিয়ে তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক।'[২]

১. আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৮: ১৮৬।
২. আত তাবারী, ৬: ৩৩।

কিছু বর্ণনা এমনও পাওয়া যায় যে, হযরত আলী আসগর তখন ছয় মাসের নবজাতক। তিনি কঠোর পিপাসায় কাতরাচ্ছিলেন। হযরত ইমাম হোসাইন তাঁকে নিয়ে গেলেন এজিদী বাহিনীর দিকে। তাদের বললেন এই নিষ্পাপ নবজাতককে একবিন্দু পানি দিতে। তারা পানি তো দিলই না, তদস্থলে তারা তাঁকে তীরই মেরেছিল।

ইমাম হোসাইনের কঠোর অবস্থান ও দৃঢ়চিত্ত এই বর্ণনাটি বিশ্বাস করার পক্ষে সাড়া দেয় না। কেননা, যেই হোসাইন ইসলাম ও আহ্‌লে-বাইতের মর্যাদা ও সম্মানের খাতিরে নিজের সবকিছুই কুরবান দিয়ে দিচ্ছেন, তিনি কি না নিজের সন্তানের জন্য এজিদী বাহিনীর নিকট গিয়ে পানি ভিক্ষা করতে পারেন! সত্যি সত্যি যদি তাঁর পানির প্রয়োজন থাকত, তাহলে এজিদী বাহিনীর কাছে গিয়ে তাঁকে পানি ভিক্ষা করার দরকার ছিল না, বরং তিনি ফোরাত নদীকে একটিবার ইশারা করলেই ফোরাত তাঁর কদমের পাশ দিয়েই প্রবাহিত হতে থাকত। যদি আকাশের দিকে ইঙ্গিত করতেন, বর্ষণে বর্ষণে সয়লাব হয়ে যেত কারবালার প্রান্তর। হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের সন্তান ইসমাঈল আলাইহিস সালামের পায়ের আঘাতে যদি জমজমের ফোয়ারা প্রবাহিত হয়ে যেতে পারে, রাসূলের দৌহিত্র হযরত হোসাইনের পদাঘাতে কারবালার ময়দানে ঝর্ণা প্রবাহিত হবে না কেন? তিনি যদি কারবালার জমিনে একটিবার এঁড়ি মারতেন, তাহলে একটি কেন হাজার হাজার স্রোতস্বীনির উৎসরণ ঘটত। হলে কী হবে! এ তো ছিল পরীক্ষা! এ তো ছিল হোসাইনের মহান যাচাই-ক্ষেত্র! তিনি তো দুঃখ-কষ্ট, ত্যাগ-তিতীক্ষা আর প্রাণবিসর্জনের ব্রতী নিয়েই কারবালার নিষ্ঠুর মরুপ্রান্তরে নিজেকে বলী দিতে এসেছিলেন। এসবের মাধ্যমে তিনি তো একমাত্র রাজাধিরাজকেই রাজি করার সন্যাস গ্রহণ করেছিলেন। তিনি তো কল্পনার চোখে অবলোকন করছিলেন, যে নানা তাঁকে আপন কাঁধে সওয়ার নিতেন, নবী-তনয়া যে ফাতেমা তাঁকে বুকের দুধ পান করাতেন, যে পিতা আলী শেরে খোদার শোণিতধারা তাঁর রগরেশায় খেলা করছে, তাঁরা সকলেই যে তাঁর দিকে চোখ খুলে চেয়ে আছেন! কারবালার এই রণক্ষেত্রে যেখানে স্থির ও অবিচল থাকার মহড়া দেখাতে হবে, সেখানে তাঁর কদমযুগল কেঁপে উঠছে না তো! তাই তিনি এই কঠিন অগ্নিপরীক্ষায় দৃঢ়চিত্ত স্থির ও অবিচল থেকে আল্লাহ্‌র রেজামন্দির পূর্ণ আদর্শ হয়ে অসম সাহস বুকে নিয়ে সপ্রতিভ্ত হাসি ফুটিয়ে রেখেছিলেন তাঁর সোনা মুখে।

অতঃপর হক ও বাতিলের, কল্যাণ ও অকল্যাণের এই মহা রণক্ষেত্রে হযরত ইমাম হোসাইনের অপরাপর ভ্রাতা হযরত আবু বকর, হযরত আবদুল্লাহ্, হযরত আব্বাস, হযরত ওসমান, হযরত জাফর এবং হযরত মোহাম্মদ রিজওয়ানুল্লাহ্ প্রমুখকেও শহীদ করে ফেলা হল।

হযরত ইমাম হোসাইন রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর শাহাদাত :

আহ্লে বাইতের সকল সদস্যই যখন একের পর এক করে শহীদ হয়ে গেলেন, তখন সবশেষে ইমাম হোসাইন রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হু কারবালার মহা রণক্ষেত্রে আগমন করবার জন্য প্রস্তুত হলেন। হযরত যাইনুল আবেদীন যিনি তখন অসুস্থ ছিলেন, ইমাম আলী মকামের নিকটে এসে আবেদন জানালেন, 'আব্বাজান! আপনি আমার উপর এমন অবিবেচনা করবেন না। আমি জীবিত থাকতে আপনি যুদ্ধের ময়দানে যাবেন, তা হয় না। আমিও আমার ভাইদের মত আমার নানাজানের দর্শন লাভ করতে চাই। আমিও আমার দাদীজানের দরবারে গিয়ে পৌঁছাতে চাই। সকলের পরে এখন শাহাদাতের সুধা পান করার আমারই পালা!' তিনি বললেন, 'বাবা! তুমি যুদ্ধের ময়দানে যেও না। কারণ, নবী-বংশের প্রদীপ বলতে সব কটিই নিভে গেছে, সব কটি পুষ্পই বৃন্ত থেকে ঝড়ে গেছে। আমার বংশে বর্তমানে কেবল তুমিই আছ। আমাকে তো শহীদ হতেই হবে। তুমিও যদি শহীদ হয়ে যাও, আমার নানাজানের বংশ যে আর থাকে না! নানাজানের বংশ রক্ষা করার জন্য তোমাকে যে জীবিত থাকতে হয়!'

অতএব, ইমাম হোসাইন হযরত যাইনুল আবেদীনকে রেখেই কারবালার মহা রণক্ষেত্রে চলে আসেন। তুখোড় যুদ্ধ চালাতে থাকেন। দীর্ঘ সময় ধরে তিনি এজিদী বাহিনীকে এক এক করে ধরাশায়ী করতে থাকেন। সমস্ত এজিদী বাহিনীতে আতঙ্ক ছেয়ে গেল। হযরত আলী শেরে খোদার এই শার্দুল সন্তান তরবারি হস্তে যেদিকেই পথ নিচ্ছিলেন, এজিদের নরপশুরা কাপুরুষের মত কেবল পালিয়ে বাঁচার পথই নিচ্ছিল। বিশ্বাসঘাতক সুযোগসন্ধানী কুফাবাসীদের রক্ত দিয়ে তিনি মিটিয়ে চলছিলেন তৃষ্ণার্ত তরবারির অদম্য পিপাসা। তরবারি আর বর্শার আঘাতও সহ্য করতে হয় তাঁকে।

যুদ্ধের এক পর্যায়ে তিনি অত্যন্ত পিপাসার্ত হলেন। পানির জন্য মুখ নিলেন ফোরাত নদীর দিকে। কঠোর হস্তে বাধা দিতে লাগল শত্রুদল। এমন সময় এসে বিদ্ধ হল একটি তীর। চেহারায় আঘাত পেলেন তিনি। তীরটি খুলে নিলেন। হাত দিয়ে দেখলেন, জখম বড়, রক্ত বেশি। হাতের তালুর রক্তগুলো

তিনি আসমানের দিকে ছিঁটে মারলেন। আল্লাহ্র শুকরিয়া আদায় করত বললেন, 'আল্লাহ্! আমি তোমার হাতে বিচার তুলে দিলাম! তোমার রাসূলের দৌহিত্রের সাথে কীরূপ আচরণ করা হচ্ছে, দেখ!'[১]

এবার জিল জওশনের পুত্র শিমার কুফার দশজন ব্যক্তিকে সাথে নিয়ে হযরত ইমাম হোসাইনের তাঁবুর দিকে পা বাড়াল, যেখানে ছিল তাঁর পরিবার-পরিজন, আসবাবপত্র ও মালামাল। ইমাম হোসাইনও আপন পরিবার-পরিজন ও কাফেলার দিকে আসছিলেন। এমন সময় শিমার তার সাথীদের নিয়ে ইমাম আলী মকামের পথ রোধ করে দাঁড়াল। তাতে ইমাম হোসাইন বললেন, 'তোমাদের নিয়ে আক্ষেপ হয়! তোমাদের কোন ধর্মও যদি না থাকে, কেয়ামত দিবস বলেও কিছুকে যদি তোমাদের ভয় না হয়, তবু অন্তত ভদ্রতা বলেও তো একটি কথা আছে! তোমাকে বলছি শোন! তোমার এসব চেলা-চামুণ্ডরা যেন আমার পরিবার-পরিজন ও মালপত্রের দিকে অগ্রসর না হয়!' জবাবে শিমার বলল, 'হে ফাতেমার পুত্র! তোমার আদেবন মঞ্জুর হল!'[২]

আবদুল্লাহ্ ইবনে আম্মার বলছেন, ইমাম হোসাইন যখন তাদের দ্বারা পথরুদ্ধ হলেন, আমি দিব্যি দেখতে পেয়েছিলাম যে, তিনি ব্যূহের ডান দিক থেকে আক্রমণ আরম্ভ করে দিলেন। তাঁর আক্রমণের ধরন দেখে শিমারের সাথীদের একে একে সবাই ভয়ে পালিয়ে গেল। আল্লাহ্র নামে কসম করে বলছি, কেবল হোসাইনই একজন; তাঁর পূর্বে বা পরে এমন কাউকেই আমি দেখি নি, যিনি অসংখ্য দুশমনের মাঝে এমনভাবে ফেঁসে আছেন যে, সন্তান-সন্ততি ও সহযোগীরা সবাই কতল হয়ে গেছেন, কিন্তু ইমাম হোসাইনের মত বীরত্ব প্রদর্শন করতে পারেন, বীরের আদর্শ সৃষ্টি করতে পারেন এবং ধীর ও স্থিরচিত্ত থাকতে পারেন।'[৩]

হযরত ইমাম হোসাইন দিনের প্রায় শেষভাগ পর্যন্ত ময়দানেই ছিলেন। কেউ যদি ইচ্ছা করত তাঁকে কতল করে দিতে পারত। কিন্তু না, সকলে একে অপরকে ঠেলতে থাকে। কেননা, হোসাইনকে বধ করার গুরু দায়িত্ব ও গুনাহ্ কেউ মাথা পেতে নিতে চায় নি। জিল জওশনের অস্পৃশ্য পুত্র শিমার বলল, 'ধিক্ তোমাদেরকে! কিসের অপেক্ষা করে বসে আছ? শুভকাজে খামাখা দেরি

১. আত তাবারী, ৬: ৩৩।
২. আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৮: ১৮৭।
৩. আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৮: ১৮৮।

করছ কেন?' এরপর চতুর্দিক থেকে মানব-বেষ্টনী সৃষ্টি হল। ইমাম হোসাইন উচ্চ আওয়াজে বললেন, 'তোমরা তো দেখছি আমাকে কতল করার জন্য একে অপরকে উস্কানি দিচ্ছ! শোন, আল্লাহ্‌র কসম করে বলছি, আমার পরবর্তীতে দুনিয়ার কোন মানুষকে কতল করাতে আল্লাহ্ ততটুকু অসন্তুষ্ট হবেন না, যতটুকু অসন্তুষ্ট তিনি আমাকে কতল করার কারণে হবেন!'[১]

বদ-বখ্‌ত শিমারের উস্কানিতে এজিদের সৈন্যরা চতুর্দিক থেকে হযরত ইমাম হোসাইনকে ঘিরে ফেলল। যুরআ বিন শুরাইক তামিমী অগ্রসর হয়ে তাঁর বাম কাঁধে তরবারি বসিয়ে দিল। কাঁধ ঢুলতে লাগল। এ অবস্থা দেখে আক্রমণকারীরা পিছু হটে গেল। সিনান বিন আবু আমর বিন আনস নাহাফী সামনে এসে শর দিয়ে আঘাত হানল। এতে তিনি প্রচণ্ড ঘায়েল হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন। এরপর সে বাহন থেকে নেমে এসে তাঁর মস্তকটি আলাদা করে নিল। অতঃপর এজিদের পুত্র খুলীর হাতে সে শিরটি তুলে দিল।[২]

অন্য বর্ণনা মতে, ইমাম হোসাইন রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হুকে শহীদ করেছিল জিল জওশনের পুত্র অভিশপ্ত শিমার। এও কথিত আছে যে, বনী মাযহাজ্ব গোত্রের জনৈক ব্যক্তি তাঁকে শহীদ করেছিল।[৩] আল্লাহ্‌ই ভাল জানেন!

কুলাঙ্গার এজিদের অস্পৃশ্য সৈন্যরা তাঁর পবিত্র দেহ মোবারক হতে সমস্ত পোষাক খুলে নিয়ে তাঁকে দিগম্বর করে ফেলল। খাযাম আসরীর যে জুব্বাটি তাঁর পরণে ছিল সেটি খুলে নিয়েছিল কায়স বিন মোহাম্মদ আসআছ, পাজামাটি খুলে নিয়েছিল বাহ্‌র বিন কাআব, জুতো জোড়া খুলে নিয়েছিল আসওয়াদ বিন খালেদ, মাথার পাগড়ী মোবারক খুলে নিয়েছিল আমর বিন এজিদ, চাদরটি খুলে নিয়েছিল এজিদ বিন শাবল আর বর্ম আর হাতের আঙ্গটি খুলে নিয়েছিল সিনান বিন আনস নাহাফী। বনী নাহাশ গোত্রের জনৈক ব্যক্তি তরবারিটি নিয়ে নিয়েছিল, যে পরবর্তীতে হাবীব বিন বদীলের ছত্রছায়ায় এসে গিয়েছিল।

এমনতর চরম ও অবর্ণনীয় জুলুম অত্যাচারের পরও আহলে বাইত-বিদ্বেষী এজিদীরা ক্ষান্ত হল না। হযরত ইমাম হোসাইনের পবিত্র দেহ মোবারককে তারা অশ্বের ক্ষুরা দিয়ে মাড়িয়ে ধুনো ধুনো করে ফেলেছিল। এহেন

১. ইবনে আছীর, ৪: ৭৮।
২. আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৮: ১৮৮।
৩. আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৮: ১৮৮।

পৈশাচিকতার পর বদ-বখ্‌তরা আহ্‌লে বাইতে-নবুয়তের তাঁবুতে প্রবেশ করে সমস্ত মালামাল লুট করে নিয়ে যায়।[১]

শহীদ হয়ে যাওয়া ইমাম হোসাইন রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হুর দেহ মোবারকে শরের আঘাত ছিল তেত্রিশটি আর তরবারির আঘাত ছিল চৌত্রিশটি। হযরত ইমাম যাইনুল আবেদীনকে (যিনি তখন ছিলেন এগার কি তের বৎসরের অসুস্থ বালক) হত্যা করার উদ্দেশ্য করল শিমার। কিন্তু শিমারের সাথীদের মধ্য থেকে হুমাইদ বিন মুসলিম তাকে হত্যা করতে বাধা দিল। এরপর ওমর বিন সাআদ তাঁবুতে চলে এল। সে বলল, 'খবরদার! কেউ যেন এসব মহিলাদের দিকে অগ্রসর না হয়। আর কেউ যেন এই বালকটিকেও হত্যা না করে। কেউ যদি কোন মালামাল নিয়ে থাক, তাহলে এক্ষুণি ফিরিয়ে দাও।' বর্ণনাকারী বলছেন, 'আল্লাহ্‌র কসম, কেহই কোন জিনিস ফিরিয়ে দেয় নি।'[২]

সে সময়ে সিনান বিন আনস ইবনে সাআদের তাঁবুর দরজায় এসে বড় গলায় এই শেরগুলো আওড়াতে থাকে :

أَوْقِرْ رِكَابِيْ فِضَّةً وَ ذَهَبَا ◆ أَنَا قَتَلْتُ الْمَلِكَ الْمُحَجَّبَا

قَتَلْتُ خَيْرَ النَّاسِ أُمًّا وَ أَبَا ◆ وَخَيْرَهُمْ إِذْ يَنْسِبُوْنَ نَسَبَا

–তোমরা সবাই আমার বাহনকে স্বর্ণ-রৌপ্যে সাজিয়ে দাও। আমি মুকুট বিহীন সম্রাটকে হত্যা করেছি।

আমি এমন একজনকে হত্যা করেছি, যার পিতা-মাতা সকলের চাইতে সেরা আর যার বংশ সকলের বংশের চাইতে সেরা ও উন্নত।'

ইবনে সাআদ বলল, 'একে ভেতরে নিয়ে এস।' তাকে যখন ভেতরে ঢুকানো হল, ইবনে সাআদ তাকে চাবুক দিয়ে আঘাত করে বলল, 'তোমার জন্য মায়া হয়! তুমি কি পাগল? তোমার এই শের যদি ইবনে যিয়াদ শুনতে পেত, তাহলে তো তোমাকে হত্যা করে ফেলত।'[৩]

১. আত তাবারী, ৬: ৩৩।
২. আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৮: ১৮৮।
৩. আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৮: ১৮৯।

নবী-বংশের শহীদগণ :

কারবালার ময়দানে হোসাইনী কাফেলার বাহাত্তরজন শহীদ হন। গাজেরিয়া অঞ্চলের অধিবাসী বনী আসাদ গোত্রের লোকেরা তাঁদেরকে পরের দিন দাফন করে দেয়।

নবী-বংশের যেসব সদস্য শহীদ হয়েছেন তাঁদের পরিচয় নিচে প্রদান করা হল:

ইমাম আলী মকামের ভাইদের মধ্যে হযরত জাফর, হযরত আব্বাস, হযরত মোহাম্মদ, হযরত ওসমান, হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুম প্রমুখ।

হযরত হোসাইন রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর সন্তানদের মধ্যে হযরত আলী আকবর, হযরত আলী আসগর (আবদুল্লাহ্) রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা প্রমুখ।

হযরত হাসান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর সন্তানদের মধ্যে হযরত আবদুল্লাহ্, হযরত কাসেম ও হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুম প্রমুখ।

হযরত আবদুল্লাহ্ জাফরের সন্তানদের মধ্যে হযরত আওন ও হযরত মোহাম্মদ রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা প্রমুখ।

হযরত আকীলের সন্তানদের মধ্যে হযরত জাফর, হযরত আবদুল্লাহ্, হযরত আবদুর রহমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুম। ওদিকে হযরত মুসলিম বিন আকীল রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু পূর্বে কুফায় শহীদ হয়েছিলেন। এ চারজন তাঁরই ঔরষজাত সন্তান ছিলেন। তাছাড়াও আকীলের সন্তানদের মধ্যে আবদুল্লাহ্ বিন মুসলিম বিন আকীল এবং মোহাম্মদ বিন আবু সাঈদ বিন আকীলও শহীদ হন।[১]

নির্দয় কারবলার তপ্ত মরুপ্রান্তরে আকায়ে দো জাহান সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের আহ্লে বাইতের উপর নিষ্ঠুরতার যে চরম অত্যাচার, নির্যাতন, জুলুম নিপীড়নের তাণ্ডব চলে, তাতে গগণ-পবনও স্তব্ধ হয়ে যায়! আকাশ-পাতালও রক্তাশ্রু বিসর্জন দেয়! অন্ধকার নেমে আসে সমগ্র দুনিয়ায়! কারবালার হৃদয়বিদারক পৈশাচিক তাণ্ডবের কারণে হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের মনে যে কী ধরনের আঘাত হতে পারে, তাও কি কল্পনা করা যায়! তা হলে কয়েকটি ঘটনা লক্ষ্য করা যাক :

১. আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৮: ১৮৯।

হযরত আব্বাসের কষ্টে নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দুশ্চিন্তা :

হযরত আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু ছিলেন হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের আপন পিতৃব্য। যেহেতু বদর যুদ্ধে তিনি মুসলমানদের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছিলেন, মক্কাবাসীদের পক্ষে যুদ্ধ করতে এসেছিলেন, তাই মক্কাবাসীদের চরম পরাজয় এবং মুসলমানদের মহান বিজয়ের পর যুদ্ধবন্দী হিসাবে তাঁকে মদীনা নিয়ে যাওয়া হয়। অন্যান্য কয়েদীর ন্যায় তাঁকেও রশি দিয়ে বাঁধা হয়। রশির চাপে তিনি সারা রাত কাতরাতে থাকেন। তিনি যেহেতু আয়েশী জীবন-যাপনে অভ্যস্থ ছিলেন, তাই এই বন্দী জীবনে তিনি অত্যন্ত মনোবেদনা ও কষ্ট অনুভব করছিলেন। ফজরের সময় নবী পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদে গেলেন। বললেন, 'আমার চাচা আব্বাসের কষ্টের কথা ভেবে সারা রাত আমার ঘুম হয় নি। তাঁর কাতরানো শুনে আমার মনে ব্যথা অনুভব হয়।'

ভাবনার বিষয় যে, সেই সময়ে হযরত আব্বাস কাফের ছিলেন। ইসলামের নূর দিয়ে তিনি নিজেকে তখনো আলোকময় করে নেন নি। তিনি কাফেরদের পক্ষেই মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে এসেছিলেন। সেই যুদ্ধেই তিনি বন্দী হয়েছিলেন। তা সত্ত্বেও তাঁর কষ্টের কথা ভেবে রাসূলের মনোবেদনা সৃষ্টি হয়েছিল। সারা রাত জেগে ছিলেন। ঘুমাতে পারেন নি। কেবল এই কারণেই যে, আব্বাস ছিলেন রাসূলের আপন চাচা। অতএব, তিনি সাহাবায়ে কেরামদের বললেন, 'আপনারা যদি ভাল মনে করেন, ফিদিয়া নিয়ে তাঁকে মুক্ত করে দিন।'

হযরত হামজার হত্যাকারীকে শাসানো :

ওহুদ যুদ্ধে রাসূলের চাচা হযরত হামজা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু শহীদ হয়ে যান। তাঁকে যে হত্যা করেছিল সে ছিল এক কৃতদাস, নাম ওয়াহশী। তিনি মক্কা বিজয়ের পর ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবাদের দপ্তরে নাম উঠে তাঁর। ইসলামের দৃষ্টিতে ইসলাম গ্রহণের পূর্বেকার যত যত অপরাধ আর গুনাহ্ থাকে, ইসলাম গ্রহণের পরে সবগুলোই মাফ হয়ে যায়। এই নিয়ম-নীতি ওয়াহশীর জন্যও প্রযোজ্য হল। রাসূলের চাচা হযরত হামজাকে নৃশংসভাবে কতল করার সকল অপরাধ ক্ষমা করে দেওয়া হল। তা সত্ত্বেও হযরত হামজা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর সাথে নবী পাকের আত্মীয়তার যে বন্ধন ছিল, যেভাবে তিনি তাঁর সঙ্গ দিতেন, এই ওয়াহশী নামের ব্যক্তিটির কারণে তিনি তা থেকে চিরবঞ্চিত হয়ে গেলেন।

জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত সেই অব্যক্ত বেদনা তাঁর মনের মাঝে উঁকি মারত। তাই তিনি সেই ওয়াহশীকে আগে থেকে জানিয়ে রেখেছিলেন, 'তুমি কখনো আমার সামনে পড়বে না। কেননা, তোমাকে দেখার সাথে সাথেই আমার চাচার হত্যার চিত্র আমার চোখে ভেসে ওঠে। তাতে আমি মনের ভেতর ভীষণ ব্যথা পাই।'[১]

উক্ত বর্ণনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, আত্মীয়-স্বজনদের দুঃখ-কষ্টকে নবী পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের দুঃখ-কষ্ট বলে মনে করতেন। তাঁদের দুঃখে তিনি অংশ নিতেন। তাঁদের ব্যথায় তিনি ব্যথিত হতেন। সুদীর্ঘ কাল পরেও কখনো যদি তাঁদের দুঃখ-কষ্টের কথা মনে পড়ত, তখনও তিনি ব্যথিত হয়ে উঠতেন। আমরা যখন নবী-দৌহিত্রকে নৃশংস ভাবে শহীদ করে ফেলার শ্বাসরুদ্ধকর ঘটনার কথা স্মরণ করি, তখন ভাবি, যে রাসূল কাফের অবস্থায়ও নিজের চাচা আব্বাসের কাতরানো অবস্থা বরদাশত করতে পারেন না, যে রাসূল চাচা হামজার নৃশংস শাহাদাতের হৃদয়বিদারক দৃশ্য কখনো ভুলে যেতে পারেন না, বিদেশ-বিভূঁইয়ে ভিনদেশের মাটিতে নিতান্ত অসহায় অবস্থায় ফাতেমার কলিজার টুকরা, রাসূলের কাঁধের আরোহী, হায়দারে কররারের চোখের মণি, আল্লাহর হাবীবের হৃদয়-মনের প্রশান্তি সাইয়েদুনা ইমাম আলী মকাম ইমাম হোসাইন রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হুর উপর কারবালার তপ্ত মরু প্রান্তরে জুলুম অত্যাচারের শেষটিই যখন করা হচ্ছিল, তখন সেই রাসূলের মনের ভেতরের অবস্থার কথা কেউ ভেবে দেখেছেন কি!

রাসূলের মনে কষ্ট ও বেদনা দেওয়া মামুলি কোন অপরাধই নয়! যারাই এ ধরনের আচরণ করে, তাদের ব্যাপারে পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ স্বয়ং বলছেন :

إِنَّ ٱلَّذِينَ يُؤْذُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ لَعَنَهُمُ ٱللَّهُ فِى ٱلدُّنْيَا وَٱلْءَاخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُّهِينًا ﴿٥٧﴾

–নিশ্চয় যারা আল্লাহ্ ও তদীয় রাসূলকে কষ্ট দেয়, দুনিয়া ও আখিরাতে আলাহ্ তাদের উপর অভিশম্পাৎ বর্ষণ করেন। তিনি তাদের জন্য লাঞ্ছনাকর শাস্তির ব্যবস্থা করে রেখেছেন।[২]

[১]. সহীহ্ বোখারী, কিতাবুল মাগাযী, বাবু কতলি হামজাহ্ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু।
[২]. সূরাঃ আহ্যাব, ৩৩ঃ ৫৭।

যারা মুখের বুলি দিয়ে কিংবা যে-কোনভাবে রাসূলের মনে সামান্য ধরনের মামুলি কষ্টও দিয়ে থাকে তাদের জন্য আল্লাহ্ দুনিয়া ও আখিরাতে যেক্ষেত্রে কঠিন পীড়াদায়ক লাঞ্ছনাকর শাস্তি নির্ধারণ করে রেখেছেন, সেক্ষেত্রে এসব বদ-বখ্তদের পরিণতি কেমন হবার কথা, যারা রাসূলের দৌহিত্রকে হত্যা করে, রাসূলের বংশের লোকজনকে গালমন্দ করে, অপমানিত করে, আহ্লে বাইতের শহীদ হওয়া পবিত্র লাশগুলোকে ঘোড়া দিয়ে মাড়ায়, দেহ থেকে মস্তক বিচ্ছিন্ন করে নেয়!

হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হুর বর্ণনা :

কারবালার হৃদয়-বিদারক ঘটনায় স্বয়ং আল্লাহ্র রাসূল মনে যে ব্যথা ও কষ্ট পেয়েছিলেন, তা হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হুর বর্ণনাটি থেকে পরিষ্কার বুঝা যায় :

ذَاتَ يَوْمٍ نِصْفَ النَّهَارِ أَشْعَثَ أَغْبَرَ فِي يَدِهِ قَارُورَةٌ فِيهَا دَمٌ، فَقُلْتُ: بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي يَا رَسُولَ اللهِ مَا هَذِهِ؟ قَالَ: «هَذَا دَمُ الْحُسَيْنِ، وَأَصْحَابِهِ لَمْ أَزَلْ أَلْتَقِطُهُ مُنْذُ الْيَوْمِ»،

–একদা মধ্যাহ্নকালে আমি নবী পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লামকে স্বপ্নে দেখলাম। তাঁর চুলগুলো ছিল এলোমেলো ধূলামলিন। হাতে ছিল রক্তভর্তি একটি বোতল। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'আপনার উপর আমার পিতা-মাতা কুরবান হোক! আপনার হাতে এ কিসের রক্ত?' তিনি বললেন, 'হোসাইন ও তাঁর সাথীদের! যেগুলো আমি আজ সকাল থেকেই কুঁড়িয়ে নিচ্ছিলাম!'[১]

হাদিসের কিতাবাদিতে উল্লেখ রয়েছে, হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস যখন ঘুম থেকে জেগে উঠেছিলেন, তখন তাঁর মুখ দিয়ে উচ্চারিত হচ্ছিল 'ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন'। উপস্থিত সবাই জিজ্ঞাসা করলেন, 'হুজুর, কী ব্যাপার?' তিনি বললেন, 'হোসাইন ইবনে আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হুকে শহীদ করে দেওয়া হয়েছে!' সকলে বললেন, 'আপনি কীভাবে জানলেন?' তখন তিনি বললেন, 'এখনই রাসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাতমের শোক নিয়ে আমার স্বপ্নে দেখা দিয়েছেন! তাঁর হাতে ছিল

[১]. তাহযীবুত তাহযীব, ২ঃ ৩৫৫।

রক্তে ভর্তি একটি বোতল। তিনি বলছিলেন, 'হে আব্বাস! আমার পুত্র হোসাইনকে কতল করে দেওয়া হয়েছে। এগুলো তাঁর এবং তাঁর সাথীদেরই রক্ত।'

হযরত ইবনে আব্বাস বলছেন, আমি সেই দিন, খণ ও তারিখটি মনে রেখে দিয়েছিলাম। সংবাদ পাওয়ার পর মিলিয়ে দেখেছিলাম যে, হুবহু মিল! ইমাম হোসাইনকে ঠিক সেই মুহূর্তেই শহীদ করা হয়েছিল।

হযরত উম্মে সালেমার বর্ণনা :

হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু ঠিক যে সময়ে হুজুর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লামকে স্বপ্নে দেখেছিলেন, একই সময়ে উম্মুল মুমিনীন হযরত উম্মে সালেমাও রাসূলকে স্বপ্নে দেখেছিলেন। রাসূলের পবিত্র বিবিগণের মধ্যে কেবল উম্মে সালেমারই সেই একক পরমত্ব অর্জিত ছিল, যিনি নবী পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাত থেকে সেই মাটি প্রাপ্ত হয়েছিলেন, যা হযরত জিবরাঈল আমীন কারবালার প্রান্তর থেকে উঠিয়ে এনে হযরত হোসাইনের শিশুকালেই রাসূলের হাতে তুলে দিয়েছিলেন। এই মাটি দানকালে হযরত জিবরাঈল রাসূলকে বলেছিলেন, 'হুজুর! এগুলো সেই বিষাদময় ময়দানেরই মাটি, যে ময়দানে আপনার উম্মতের কিছু দুরাচার হযরত হোসাইনকে শহীদ করে দেবে। তখন আপনি থাকবেন না।' তিনি সেই মাটিগুলো হযরত উম্মে সালেমাকে দেবার সময় বলেছিলেন,

يَا أُمَّ سَلَمَةَ إِذَا تَحَوَّلَتْ هَذِهِ التُّرْبَةُ دَمًا فَاعْلَمِي أَنَّ ابْنِي قَدْ قُتِلَ،

–হে উম্মে সালেমা! এই মাটি যেদিন রক্তে পরিণত হবে, বুঝে নেবে, সেদিন আমার হোসাইনকে শহীদ করে দেওয়া হয়েছে![১]

হযরত সালমা বলছেন, আমি আমার মাতা উম্মুল মুমিনীন হযরত উম্মে সালেমার কাছে গেলাম। দেখতে পেলাম তিনি অঝোরে-নয়নে কান্না করছেন। কী যে বর্ণনাতীত শোক ছেয়ে আছে তাঁর চোখে-মুখে! আমি বললাম, 'হে উম্মুল মুমিনীন! আপনি অমন করে কান্না করছেন কেন?' তিনি বললেন, এখনই স্বপ্নে রাসূল এসেছিলেন :

[১]. আল খাসায়িসুল কুবরা, ২: ১২৫। তাহযীবুত তাহযীব, ২: ৩৪৭।

عَلَى رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ التُّرَابُ، فَقُلْتُ: مَا لَكَ يَا رَسُولَ اللهِ؟، فَقَالَ: «شَهِدْتُ قَتْلَ الْحُسَيْنِ آنِفًا»

–'তাঁর মাথা ও চুলে ধূলি-বালি! আমি বললাম, 'আপনার এই দশা কেন!' তিনি বললেন, 'এই মুহূর্তেই আমি হোসাইনের হত্যা দেখে এলাম!'[১]

হোসাইনী কাফেলার বাদবাকি সদস্যদের কুফায় রওয়ানা :

কারবালার বিষাদময় ঘটনার পরের দিন ভোরে ওমর বিন সাআদ হযরত ইমাম হোসাইনের বাদবাকি বংশীয় সদস্য ও নারীদেরকে হাওদাজে করে কুফা পাঠিয়ে দেয়। কাফেলাটি যেই কারবালার বিদগ্ধ প্রান্তর দিয়ে যাচ্ছিল, হযরত ইমাম হোসাইন সহ তাঁর সহযোগীদের পোশাকবিহীন দাফন না-করা লাশগুলো বিচ্ছিন্নভাবে অবহেলিত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখেছিলেন, তখন তাঁদের প্রাণ বের হয়ে যাওয়া চিৎকার ধ্বনিতে গগণ-পবন প্রকম্পিত করে তুলছিল। কান্নায় তাঁদের এমন দুঃসহ ব্যথা ছিল যে, কলিজাই যেন চৌচির হয়ে যায়। হযরত যায়নাব রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা ব্যথাতুর কান্না নিয়ে বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বললেন, 'হে আল্লাহ্‌র রাসূল! দোহাই আপনার! দেখুন! একটি বার দেখুন! এই হা-হা করা নিষ্ঠুর মরু ময়দানে রক্তে রঞ্জিত আপনার হোসাইনের অবহেলিত দিগম্বর দেহখানি! হে আল্লাহ্‌র রাসূল! দোহাই আপনার! দেখুন! আজ আপনার কন্যারা বন্দী! আপনার শাহজাদাদের পোষাকবিহীন লাশের সারি অযত্নে অবহেলায় দাফন না পেয়ে পড়ে আছে এই ময়দানে! মরু-সাইমুম ধূলি ওড়াচ্ছে তাঁদের নিষ্পাপ দেহে!!'

হযরত যায়নাবের হৃদয় ব্যাকুল করা আর্তনাদ শুনে দোস্ত-দুশমন সকলেই কান্নায় মুহ্যমান হয়ে পড়েছিল।[২]

শহীদগণের দাফন :

এজিদ বাহিনীর লোকজনেরা যখন সেখান থেকে চলে যায়, শাহাদাতের পরের কি তারও পরের দিন বনু আসাদ গোত্রের লোকজন ঘটনাস্থলে আসে, যারা ফোরাত নদীর তীরে গাজেরিয়ায় বসবাস করত। তারা হযরত ইমাম হোসাইন

[১]. মুস্তাদরিক, ৪: ১৯। আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৮: ২০০। তাহযীবুত তাহযীব, ২: ৩৫৬।
[২]. আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৮: ১৯৩। তাবারী, ৬: ৩৩। ইবনে আছীর, ৪: ৮১।

রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর মস্তকবিহীন লাশটিকে আলাদা জায়গায় দাফন করল। আর বাদবাকিদেরকে অন্যত্র সমাহিত করে দিল।[১]

নূরানী মস্তকটির উপর আলো ও শ্বেত পক্ষী :

আহ্‌লে-বাইতের বাদবাকি সদস্যগণ মুহররম মাসের একাদশ তারিখে কুফা এসে পৌঁছান। ওদিকে শহীদদের কর্তিত শিরগুলো আগে থেকেই পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল। ইমাম আলী মকামের কর্তিত মস্তক খুলীর মারফত ইবনে যিয়াদের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছিল ইবনে সাআদ। খুলী মস্তকটি নিয়ে কুফা এসে দেখতে পেল প্রশাসনিক ভবনের তোরণদ্বার বন্ধ। তাই সে মস্তকটি নিয়ে তার গৃহে গিয়ে উঠল। সে মস্তকটিকে একটি পাত্রে ঢেকে রাখল। এরপর তার স্ত্রী 'নাওয়ার'কে দিয়ে বলল, 'আমি তোমার জন্য সারা জনমের অটুট সম্মান নিয়ে এসেছি!' স্ত্রী জিজ্ঞাসা করল, 'সে কী?' খুলী বলল, 'আমি হোসাইনের মস্তক নিয়ে এসেছি!' স্ত্রী বলল, 'সবাই তো নিয়ে আসে স্বর্ণ-রৌপ্য। তুমি কি না নিয়ে এলে আল্লাহ্‌র রাসূলের প্রাণপ্রিয় দৌহিত্রের মস্তক! আল্লাহ্‌র কসম, আমি আর একটি রাতও তোমার সাথে কাটাব না!' এ কথা বলে সে বিছানা ছেড়ে উঠে গেল। এরপর খুলী তার অপর স্ত্রীর কাছে গেল, যে ছিল বনী আসাদ গোত্রের। তাকে ডাকল। সে তার সাথেই ঘুমাল।[২]

খুলীর পাশ ছেড়ে চলে এসে ইমাম হোসাইন রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর মস্তকটি যেখানে রাখা হয়েছিল নাওয়ার সোজা সেখানে এসে বসল। তার উক্তি:

فَوَاللهِ مَا زَلْتُ أَنْظُرُ إِلَى نُوْرٍ يَسْطَعُ مِثْلَ الْعَمُوْدِ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْإِجَانَةِ،
وَرَأَيْتُ طَيْرًا بَيْضًا تَرَفْرَفُ حَوْلَهَا.

—আল্লাহ্‌র কসম, আমি দেখতে পেলাম আসমান থেকে পাত্রটি পর্যন্ত সরাসরি একটি আলোর স্তম্ভ! আমি দেখতে পেলাম শ্বেত রঙের একটি পক্ষী পাত্রটির চতুর্দিকে ঘুরপাক খাচ্ছে![৩]

ভোর হতে না হতেই খুলী নূরানী মস্তকটি নিয়ে গেল ইবনে যিয়াদের কাছে।

১ তাবারী, ৬: ৩৩।
২ আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৮: ১৮৯।
৩ আত তাবারী, ৬: ৩৩। ইবনে আছীর, ৪: ৮০।

ইমাম আলী মকামের মস্তক ও ইবনে যিয়াদ :

ইবনে যিয়াদের ভরা দরবার! গতকাল থেকে সকলের জন্য সাধারণ অনুমতি চলছে। এমন ভরা দরবারে ইবনে যিয়াদের সম্মুখে একটি তশতরিতে করে ইমাম হোসাইনের মস্তকটি পেশ করা হল। হুমাইদ বিন মুসলিম বলছে, ওমর বিন সাআদ আমাকে বিজয়ের সুসংবাদ ও নিজের সুস্থতার কথা জানিয়ে তার পরিবার-পরিজনের সাথে কুফায় পাঠায়। আমি যখন এসে পৌঁছি তখন ইবনে যিয়াদের দরবার ছিল জমজমাট। সাক্ষাৎকারীদের একটি দল তার আশপাশে বসা ছিল। আমিও তাদের সাথে বসে গেলাম। আমি দেখতে পেলাম, হযরত ইমাম হোসাইনের পবিত্র মস্তকটি তার সামনে রাখা আছে। কিছুক্ষণ পর সে হাতে ছোরা নিয়ে মস্তকটির সম্মুখের দাঁতগুলো ঠোকরাচ্ছে। এ দৃশ্য দেখে হযরত যায়দ বিন আরকাম তাকে রেহাই দিলেন না। তিনি চিৎকার দিয়ে বলে উঠলেন, 'ওই দাঁত থেকে তোমার ছোরা হটিয়ে নাও! যেই আল্লাহ্ ব্যতীত কোন মাবুদ নাই, তাঁর নামে কসম করে বলছি, আমি আল্লাহ্‌র রাসূলকে নিজের এই চোখ দিয়ে দেখেছি যে, তিনি ওই অধরে চুমু খাচ্ছেন!' সাথে সাথে তিনি ভেউ ভেউ করে কেঁদে উঠলেন। ইবনে যিয়াদ বলল, 'আল্লাহ্ তোমাকে আরো কাঁদাক! আল্লাহ্‌র কসম, তুমি যদি বয়োবৃদ্ধ না হতে, তোমার জ্ঞানবুদ্ধি যদি লোপ না পেত, তাহলে আমি তোমাকে হত্যা করে ফেলতাম!' বর্ণনাকারীর উক্তি, এর পর যায়দ বিন আরকাম সেখান থেকে উঠে চলে যান। তিনি চলে যাওয়ার পর লোকজন বলল, আল্লাহ্‌র কসম, যায়দ বিন আরকাম যেসব কথা বলেছে, তা যদি ইবনে যিয়াদ শুনতে পেতেন, তাহলে তিনি তাকে অবশ্যই কতল করে দিতেন। হুমাইদ বিন মুসলিম জিজ্ঞাসা করল, 'তিনি কী বলেছেন?' লোকেরা বলল, সে যখন আমাদের পাশ দিয়ে যাচ্ছিল, তখন এই কথাগুলো বলে বলেই যাচ্ছিল 'নিজেও একজন দাস, বাদশাহ্‌ও হয়ে আছে দাসদেরই। প্রশাসনকে নিজের তরফ বানিয়ে রেখেছে। হে আরবগণ! আজকের পর থেকে তোমরা দাস হয়েই থাকবে! কেননা, তোমরা তো ফাতেমার নয়ন-মণিকে শহীদ করে দিয়েছ! অথচ প্রশাসক বানিয়ে নিয়েছ মারজানার পুত্রকে! দেখবে, এবার সে তোমাদের বুদ্ধিজীবীদের হত্যা করবে। আর দাস বানিয়ে রাখবে তোমাদের নীচ ও হীনদেরকে। অতএব, হে আরবাসী! যারাই এই লাঞ্ছনা ও অপমানের জীবন বেছে নেবে, তাদের কপালে বঞ্চনা ছাড়া আর কিছুই নাই![১]

১. আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৮: ১৯০।

হযরত আনস বিন মালেক রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হু বলছেন, হযরত ইমাম হোসাইনের পবিত্র মস্তকটি যখন একটি তশতরিতে করে ইবনে যিয়াদের কাছে এনে রাখা হল, তখন আমি সেখানে ছিলাম। সে মস্তকটির সৌন্দর্যের তারিফ করছিল। সেই সাথে হাতে একটি ছোরা নিয়ে মস্তকটির নাকে খোঁচা দিচ্ছিল। হযরত আনসের উক্তি, রাসূলের সাথে হযরত হোসাইনের সমধিক মিল ছিল। তিনি ছিলেন ওয়াসমা পাতার কলপ লাগানো।[১]

ইবনে যিয়াদ ও কারবালার বন্দীগণ :

ইবনে যিয়াদের সামনে হযরত ইমাম হোসাইনের পবিত্র শির মোবারক এনে রাখার পর নিয়ে আসা হল বন্দী আহ্লে-বাইতগণকেও। হযরত যায়নাব ছিলেন মামুলি পোষাকে বাঁদীদের দলে। তাই তাঁকে পরিচয় করা যাচ্ছিল না। তাঁকে যখন ইবনে যিয়াদের সামনে নিয়ে আসা হল, সে জিজ্ঞাসা করল, 'এ কে?' হযরত যায়নাব নীরব থাকলেন। জনৈক বাঁদী বলল, 'ইনি হলেন হযরত আলীর কন্যা যায়নাব!' ইবনে যিয়াদ বলল, 'সেই আল্লাহ্র শুকরিয়া, যিনি আপনাদেরকে অপমানিত ও হত্যা করেছেন। আর আপনাদের দাবীকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছেন!' হযরত যায়নাব বললেন, 'বরং আমাদেরকে সকলের চাইতে অধিক সম্মানিত করেছেন, পাক ও পবিত্রই করেছেন! নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ ফাসেকদেরকেই অপমানিত করেন আর ফাজেরদেরকেই করেন মিথ্যা প্রতিপন্ন!' ইবনে যিয়াদ বলল, 'আপনারা কি দেখলেন না, আল্লাহ্ আপনাদের আহ্লে-বাইতদের সাথে কীরূপ আচরণ করলেন!' হযরত যায়নাব বললেন, 'শাহাদাত তো তাঁদের ভাগ্যে আগে থেকেই লেখা ছিল। তাই তো তাঁরা তাঁদেরই শাহাদাতগাহের দিকে নিজে থেকে এসে জমায়েত হয়েছিলেন। অচিরেই আল্লাহ্ তাঁদেরকে আর তোমাকে একটি জায়গায় সমবেত করবেন। তখন তাঁরা তোমার বিপক্ষে আল্লাহ্র আদালতে মামলা রুজু করবেন!' এই কথা শোনার পর ইবনে যিয়াদ গর্জে উঠল। কিছু একটা করার উদ্যোগ নিতে না নিতেই আমর বিন হারীছ বলল, 'আল্লাহ্ আমীরের মঙ্গল করুন, ইনি যে একজন অবলা! কোন নারীর কথায় আমীর নিশ্চয় রাগ করবেন না। মহিলাদের কথায় ধর্তব্য নাই। তাদের নির্বুদ্ধিতায়ও কোন ধিক্কার দেওয়া যায় না!'[২]

১. সুনানে তিরমিযী, বাবু মানাকিবিল হোসাইন।
২. আল বি-ায়া ওয়ান নিহায়া, ৮: ১৯৩।

ইবনে যিয়াদ আলী বিন হোসাইনকে (যাইনুল আবেদীনকে) দেখতে পেয়ে, একটি সিপাহীকে নির্দেশ দিল, 'একে পরীক্ষা করে দেখ। যদি বালেগ হয়ে থাকে, তাহলে নিয়ে যাও আর কতল করে দাও!' সিপাহীটি হযরত যাইনুল আবেদীনের বালেগ হওয়ার মন্তব্য করল। ইবনে যিয়াদ বলল, 'তাকে নিয়ে যাও, কতল করে দাও!' তখন আলী বিন হোসাইন ইবনে যিয়াদকে লক্ষ্য করে বললেন, 'এসব মহিলাদের সাথে তোমার আত্মীয়তার দূরতম কোন সম্পর্কও যদি থেকে থাকে, তাহলে তাদের সাথে এমন কোন নির্ভরযোগ্য লোক পাঠিয়ে দাও, যার হাতে তাঁদের সম্ভ্রম রক্ষা হয়!' ইবনে যিয়াদ বলল, 'তুমিই এসে যাও!' এই বলে যাইনুল আবেদীনকেই মহিলাদের সাথে পাঠিয়ে দিল।[১]

ইবনে আফীফের শাহাদাত :

ইবনে যিয়াদের পক্ষ থেকে সকলকে জামে মসজিদে সমবেত হওয়ার নির্দেশ দেওয়া হল। সবাই যখন সমবেত হল, ইবনে যিয়াদ মিম্বরে উঠল। এরপর নিজেদের সাফল্য ও বিজয়ের কথা সহ হযরত হোসাইনের হত্যার কথা উল্লেখ করে বলল, 'হোসাইন চেয়েছিলেন আমাদের জাতীয় ঐক্যে ফাঁটল সৃষ্টি করে রাষ্ট্রের চাবিকাঠি নিজের হাতে নিয়ে নিতে।' এই কথা শোনার সাথে সাথে আবদুল্লাহ্ ইবনে আফীফ এজদী উঠে দাঁড়িয়ে গেলেন। তিনি ছিলেন হযরত আলীরই একজন সাথী। তিনি দুই চোখের দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেলেছিলেন। বললেন, 'ইবনে যিয়াদ! ধিক্, শত ধিক্ তোমাকে!! তুমি কি না নবীর বংশকে কতল করে যাও আর বুলি আওড়াও সিদ্দীকদের ন্যায়!' সাথে সাথে ইবনে যিয়াদের হুকুমে তাঁকে শূলিতে চড়ানো হল। এরপর ইবনে যিয়াদেরই নির্দেশে হযরত হোসাইনের শির মোবারকটি বর্শাবিদ্ধ করে কুফার অলিতে-গলিতে ঘুরানো হল। পরে শিরটি যাহার বিন কায়সের মারফত সম্মানিত মেহমান রূপে এজিদের কাছে অশ্বারোহী সেনাদের সমবিভ্যাহারে সিরিয়া পাঠিয়ে দিল।[২]

তারপর ইবনে যিয়াদ দুরাচারদের একটি দলের সাথে অন্যান্য শহীদদের শিরগুলো সহ বন্দী আহ্লে-বাইতদেরকে এজিদের কাছে পাঠিয়ে দিল। হযরত ইমাম যাইনুল আবেদীনের হাতে, পায়ে ও গর্দানে জিঞ্জির পরিয়ে দেওয়া হয়েছিল। আর অবলা নারীদেরকে বসানো হয়েছিল উটের নাঙা পিঠে। ইবনে যিয়াদ সিপাহীদের বলে দিল, শিরগুলো যেন তারা বর্শাবিদ্ধ করে সকলকে

১. আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৮: ১৯১।
২. আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৮: ১৯১।

দেখিয়ে দেখিয়ে নিয়ে যায় আর বলে বলে যায়। এতে করে এজিদের বিরোধিতাকারীদের ভয়াল পরিণতি কী হতে পারে তা সকলে দেখতে পাবে আর ভয়ে বিরোধিতা থেকে দূরে থাকবে।

ইমাম আলী মকামের শির মোবারক নিয়ে যাওয়া কাফেলাটি রাস্তায় একটি গির্জার পাশ দিয়ে যাচ্ছিল। রাত্রি যাপনের জন্য কাফেলাটি সেখানে অবস্থান নিয়েছিল। ইবনে কছীরের উক্তি, দুরাচাররা তাঁর শির মোবারকটি পাশে রেখে মদ্য পানে মশগুল হয়। এমন সময় গাইব থেকে একটি লৌহ নির্মিত কলম দেখা গেল আর দেওয়ালের উপর রক্ত দিয়ে কলমটি লিখে চলল :

أَتَرْجُوْ أُمَّةٌ قَتَلَتْ حُسَيْنًا ◆ شَفَاعَةَ جَدِّهِ يَوْمَ الْحِسَابِ

–যাদের হাতে বিনা দোষে নবীর নাতি হোসাইন মরে!
তারাও কি তাঁর নানাজানের শাফাআতের আশা করে![১]

কোন কোন বর্ণনা মতে, এই পংক্তিটি দেওয়ালের গায়ে আগে থেকেই লেখা ছিল। যথা, আল্লামা ইবনে কছীর ইবনে আসাকির থেকে বর্ণনা করছেন, কোন সময়ে কিছু লোকের একটি দল যুদ্ধে যায় রূমে। তারা একটি গীর্জার দেওয়ালে এই শেরটি দেখতে পায়। তারা লোকজনকে জিজ্ঞাসা করে, এই শেরটি কে লিখেছে? তারা বলল, 'এই শেরটি তোমাদের নবী মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর আবির্ভাবেরও তিনশত বৎসর আগের লেখা।'[২]

যে গীর্জায় কাফেলাটি অবস্থান নিয়েছিল সেই গীর্জার পাদ্রীটি যখন দেখতে পেলেন যে, শহীদদের মস্তকগুলো বর্শাবিদ্ধ আর নারীরা নির্যাতিত অবস্থায় বন্দী, তখন তাঁর হৃদয় কেঁপে উঠল। তিনি ব্যাপার জিজ্ঞাসা করলেন। সব কথা জেনে তিনি অত্যন্ত বিমর্ষ হয়ে গেলেন। বললেন, 'তোমরা তো দেখছি অত্যন্ত খারাপ মানুষ! কেউ কি নিজেদের নবীর বংশের সাথে এরূপ আচরণও করতে পারে! তোমরা যেরূপ করেছ!' অতঃপর পাদ্রীটি সেসব দুরাচারদের বললেন, 'তোমরা যদি কেবল একটি মাত্র রাতের জন্য তোমাদের নবীর দৌহিত্রের মস্তকটি আমার কাছে রাখতে দাও আর এই নারীদের সেবা করার সুযোগ দাও, তাহলে তার বদলে আমি তোমাদেরকে দশ হাজার দিনার দেব।' দুরাচাররা তো ধন-সম্পদেরই গোলাম ছিল! তাই তারা বিনাদ্বিধায় দশ হাজার দিনারের

১. আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৮: ২০০।
২. আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৮: ২০০।

লোভে সেই রাতটি পাদ্রীর কাছে কাটাবার জন্য রাজি হয়ে গেল। পাদ্রীটি তাঁর গৃহটি খালি করে নিলেন। পর্দানশীন পূতাত্মা নারীদেরকে গৃহের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন একটি চার দেওয়ালের কক্ষ রাত কাটাবার জন্য দিলেন। তিনি তাঁদের খুবই সমাদর দেখালেন। বললেন, 'আপনাদের কোন কিছুর প্রয়োজন হলে তৎক্ষণাৎ আমাকে বলবেন। আমি নিজে মুসলিম না হতে পারি, কিন্তু আমার মনের মধ্যে আপনাদের বংশের মর্যাদাবোধ অত্যধিক।' তিনি সবাইকে ধৈর্য্য ধারণের উপদেশও দিলেন। তিনি আরো বললেন, 'আল্লাহ্‌র রাস্তায় আল্লাহ্-ওয়ালাদের জন্য অনেক বড় বড় মুসিবত এসে থাকে। অবর্ণনীয় কষ্টের সম্মুখীন হতে হয়। পূর্বে তাঁরা ধৈর্য্যই ধারণ করেছেন। আল্লাহ্ তাঁদের ধৈর্য্যের উত্তম বদলাও দান করেছেন। এখন আপনাদের জন্যও ধৈর্য্য ধারণ করা ছাড়া আর কোন পথ নাই।' নবী-পরিবারের পবিত্র নারীগণ পাদ্রীর মানবতামূলক আচরণে তাঁকে কৃতজ্ঞতা জানান এবং তাঁর জন্য দোয়া করেন।

পাদ্রী গীর্জার খাদেমটিকে বললেন, 'তুমি আজ সারা রাত এই পবিত্র রমনীদের সেবা করে যাবে। এরা হলেন মুসলমানদের নবী মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম)'র পবিত্র বংশেরই পবিত্র রমনী।' এরপর তিনি স্বয়ং আলী মকাম ইমাম হোসাইনের পবিত্র শির মোবরকটিকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন একটি পাত্রে নিয়ে চেহারা, ভ্রূপাতি, দাড়ি ও ধূলায় ধূসর রক্তাক্ত পশম মোবারক নিজ হাতে ধুইতে লাগলেন। প্রথমে তিনি চেহারা মোবরককে ধুয়ে সাফ করে নিয়ে আতর-কাফুর লাগিয়ে সুরভিত করে নিলেন। এরপর অত্যন্ত সম্মান ও শ্রদ্ধার সাথে শির মোবারকটি সামনে নতজানু হয়ে বসে অঝরে নয়নে কান্না করতে লাগলেন।

এহেন অকৃত্রিম সেবায় নবী-বংশের পবিত্র রমনীগণ পাদ্রীকে সারা রাত ধরে দোয়া করতে থাকেন। হোসাইনের শিরটিও যেন তাঁকে দোয়া করেছিল। সাথে সাথেই পাদ্রীর ভাগ্য খুলে গেল। তাঁর চোখ থেকে পর্দা হটে গেল। খুলীর স্ত্রী আসমান থেকে জমি পর্যন্ত বিস্তৃত যে আলোর স্তম্ভটি দেখেছিল সেই নূরটি পাদ্রীও দিব্যি চোখে দেখতে পেলেন। তিনি দেখতে পেলেন, চন্দ্রমুখি একটি নূর হযরত হোসাইনের শির মোবারকের চারিদিকে পরিভ্রমণ করছে। তিনি এই অভাবনীয় ও অতি বিস্ময়কর দৃশ্য দেখলেন আর শির মোকারকের জালাল ও প্রতাপ বুঝতে পারলেন, তাঁর অন্তরের অবস্থাই পরিবর্তন হয়ে গেল। নবী-পরিবারের সাথে তাঁর অপরিসীম ভক্তি আর অকৃত্রিম ভালবাসার সেরা প্রতিদানের সমস্ত ব্যবস্থা হয়ে গেল। তাঁরই অজান্তে তাঁরই মুখ দিয়ে বের হতে

লাগল 'আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ্'। তিনি যেহেতু দুনিয়ার সব ধন-দৌলত কুরবান করেই দিয়েছিলেন, তাই তার বিপরীতে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে ঈমানের চির অম্লান দৌলতই দান করে দিলেন। তিনি ইমাম আলী মকামের পবিত্র শিরটির সম্মান ও মর্যাদা দিয়েছিলেন। আদব করেছিলেন। আদব রক্ষাকারী কোন মানুষ বদ-নসীব আর বে-ঈমান থাকতে পারে না। তাই স্বয়ং আল্লাহ্ই তাঁর ভাগ্যে চিরকালের জন্য লিখে দিলেন নসীব আর ঈমান। আহ্লে-বাইতের পবিত্র রমনীগণের সেবা করে তিনি যে দোয়া পেয়েছিলেন, সেই দোয়াই কাজে এসেছে। তাঁর ভাগ্যই পরিবর্তন হয়ে গেল। এবার তাঁর জন্য আহ্লে-বাইত থেকে দূরে সরে থাকা অসম্ভব হয়ে গেল। অতএব, পরের দিন কাফেলাটি যখন রওয়ানা দিল, তিনিও একজন অনুগত ভৃত্যের ন্যায় তাঁদের সাথে চললেন।[১]

এখানে আরো একটি অত্যন্ত শিক্ষণীয় ঘটনা ঘটে। এজিদী বাহিনীর দুরাচার লস্করেরা ইমাম আলী মকামের সাথীদের তাঁবু থেকে যেসব দিরহাম ও দিনার লুট করেছিল আর যে দিনারগুলো তারা পাদ্রী থেকে নিয়েছিল, সেগুলো নিজেদের মাঝে বিলি-বন্টনের উদ্দেশ্যে যেই থলের মুখ খুলল, দেখতে পেল সবই মাটির চাড়া। সেই মাটির চাড়ার একপাশে পবিত্র কুরআনের এই আয়াতটি লিখিত রয়েছে :

وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلاً عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ

–(আর হে মানব) কস্মিনকালেও এই কথা মনে করবে না যে, অত্যাচারীরা যা কিছু করে আল্লাহ্ সে ব্যাপারে উদাসীন রয়েছে।[২]

দ্বিতীয়পাশে লিখিত রয়েছে :

وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ

–যারা অত্যাচার করেছে তারা অনতিবিলম্বে জানতে পারবে যে, তাদের কোন পাশ করে শোয়ানো হবে।[৩]

১. আস্ সাওয়ায়িকুল মুহ্রিকা।
২. সূরা: ইবরাহীম, ১৪: ৪২।
৩. সূরা: আশ শুয়ারা, ২৬: ২২৭।

দিরহাম ও দিনার মাটির চাড়ায় পরিণত হয়ে যাওয়া এজিদী লস্করদের জন্য সাবধানবাণীই ছিল যে, হে বদ-বখ্তরা! তোমরা নশ্বর এই পৃথিবীর লোভে পড়ে অবিনশ্বর দীনকে ত্যাগ করেছ! রাসূল-পরিবারের উপর জুলুম-নির্যাতন চালিয়েছ! মনে রেখ, দীন তো তোমরা ছেড়েই দিয়েছ, কিন্তু বিশ্বাসঘাতক নশ্বর যে দুনিয়া অর্জনের লোভে তোমরা দীনকে বাদ দিয়েছ, সেই দুনিয়াও তোমাদের হাতে আসবে না। পরিশেষে তোমরা দুনিয়া ও আখিরাতে ক্ষতিগ্রস্তই হয়ে থাকবে।

এজিদের দরবারে হোসাইনের শির :

অপরাপর শহীদগণের কর্তিত মস্তক ও কারবালার বন্দীদের সাথে হযরত হোসাইনের শিরটিও এজিদের সামনে আনীত হল। এজিদ তখন সেই শিরটির সাথে কীরূপ আচরণ করেছিল, সে ব্যাপারে ইতিহাসের পাতায় পাতায় বিস্তর বর্ণনা রয়েছে। এখানে সংক্ষিপ্ত পরিসরে ও সংক্ষিপ্ত আকারে কেবল দুইটি বর্ণনাই তুলে ধরা হল :

এক বর্ণনা মতে, শহীদগণের মস্তক আর কারবালার বন্দীগণকে যখন দামেশকে এজিদের কাছে আনা হল, তখন এজিদ দরবার ডাকল। আম-খাস সকলকেই দরবারে আসার অনুমতি দিল। সবাই ভেতরে প্রবেশ করল। সকলে দেখতে পেল, হযরত ইমাম হোসাইনের শির মোবারকটি এজিদের সামনে রাখা হয়েছে। এজিদের হাতে ছিল একটি ছোরা। সেটি দিয়ে সে হযরত হোসাইনের কর্তিত মস্তকের দাঁত মোবারকে আঘাত করছিল। আর বলছিল, এখন তো তাঁর আর আমাদের উপমা সেই রূপই দাঁড়াল হোছাইন ইবনে হাম্মাম যেমনরূপ বলেছেন :

أَبَى قَوْمُنَا أَنْ يَنْصُفُونَا فَانْصَفَتْ ◊ قَوَاضِبُ فِي إِيمَانِنَا تَقْطُرُ الدَّمَا

يَفْلَقْنَ هَامًا مِنْ رِجَالٍ أَعِزَّةٍ ◊ عَلَيْنَا وَهُمْ كَانُوا أَعَقَّ وَأَظْلَمَا

–আমাদের জাতি বিচার করল না। পরে সেই তরবারিই বিচার হাতে নিল যা আমাদের ডান হাতে ছিল। যা দিয়ে রক্ত ঝরে। সেগুলো এমনসব মানুষের খুলি উপড়িয়ে দিল যারা ছিল আমাদের চেয়ে সঙ্গীন, অতিশয় অবাধ্য আর অত্যাচারী!

হযরত আবু বুরযা আসলামী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হু যখন দেখলেন যে, এজিদ হযরত ইমাম হোসাইনের দাঁত মোবারকে ছোরা দিয়ে আঘাত করছে,

তিনি এমনতর বেয়াদবি বরদাশত করতে পারলেন না। তিনি তখন এজিদকে উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন, 'এজিদ! তুমি কি হোসাইনের দাঁতে তোমার ছোরা মারতে পারছ? (তোমার বেহায়াগিরি বন্ধ কর) আমি অনেক বারই নবীকে ওই অধরে চুমু খেতে দেখেছি! এজিদ! নিশ্চয় কেয়ামত দিবসে যখন তোমাকে নিয়ে আসা হবে, তোমার সুপারিশকারী হবে ইবনে যিয়াদ, আর যখন এই হোসাইন আসবেন, তখন তাঁর সুপারিশকারী হবেন স্বয়ং রাসূল!' এ কথা বলে হযরত আবু বুরযা স্থান ত্যাগ করলেন।[১]

অপর বর্ণনা :

অপর বর্ণনা মতে, হযরত ইমাম হোসাইনের শির মোবারকটি এনে যখন এজিদের সামনে রাখা হল, তখন সে উপমা স্বরূপ নিচের শেরগুলো পাঠ করেছিল :

لَيْتَ اَشْيَاخِيْ بِبَدْرٍ شَهِدُوْا ○ جَزَعَ الْخَزْرَجِ قِ وَقَعَ الْاَسَلِ

قَدْ قَتَلْنَا الضَّعْفَ مِنْ اَشْرَافِكُمْ ○ وَعَدَلْنَا مِيْلَ بَدْرٍ فَاعْتَدِلُ

–ওহে আমার বদর যুদ্ধে নিহত গুরুজনরা! তোমরা তো বনু খজরয গোত্রের তীর-বল্লমের মারে চিল্লাচিল্লি আর চেঁচামেচি দেখেছ! আমরা তোমাদের দ্বিগুণ অভিজাত ব্যক্তিদের হত্যা করে ফেলেছি। আর বদর দিবসের পাল্লার ঝুককে সমানে সমান করে দিয়েছি![২]

যেই এজিদ অবলীলায় নবী-দৌহিত্রের নূরানী অবরদ্বয়ে ছোরার আঘাত করে যাচ্ছিল আর বলে যাচ্ছিল, আজকের দিনটিতে যদি আমার সেসব পূর্বপুরুষরা জীবিত থাকতেন, যাদেরকে বদর-যুদ্ধে হত্যা করা হয়েছিল, তাহলে আমি তাদের বলতাম, আপনাদের হত্যার প্রতিশোধ আমি হোসাইনকে হত্যা করে নবীর বংশ থেকে নিয়েছি! ঈমানের কথা তো এই যে, এ ধরনের উন্মুক্ত ঘোষণার পর তার ঈমানদার হওয়ার কোন সম্ভাবনাই কি আর থাকে? না ইসলাম, আখিরাত ও জান্নাতের সাথে এজিদের দূরতম কোন সম্পর্ক কল্পনা করা যায়?

১. আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৮: ১৯২।
২. আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৮: ১৯২।

রূমের মুখপাত্রের বিস্ময় প্রকাশ আর কড়া মন্তব্য :

যে সময়ে শহীদগণের কর্তিত মস্তক সহ আহ্‌লে-নবুয়তকে এজিদের দরবারে পেশ করা হয়েছিল, সেই সময়ে রোম সম্রাটের একজন মুখপাত্রও তার দরবারে উপস্থিত ছিলেন। তিনি এসব ঘটনা দেখে অত্যন্ত আশ্চর্যবোধ করছিলেন। অথচ তখনো তিনি ঘটনার মূল রহস্য সম্পর্কে জানতে পারেন নি। শেষ অবধি তিনি বরদাশত করতে পারলেন না। লোকজনের কাছে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, আমাকে একটু বলুন তো এই কর্তিত মস্তকটি কার? যার অধরে এজিদ ছোরা মারছে? বড় গৌরব আর আস্ফালন নিয়ে বলছে, বদরে তার যেসব অগ্রজরা নিহত হয়েছিল তারা যদি আজ জীবিত থাকত, তাহলে সে তাদের বলত, দেখ! তোমাদের হত্যার প্রতিশোধ নবীর বংশ থেকে নিয়েছি! আর বিচার করে দিয়েছি সমানে সমান?

লোকজন উত্তরে বলল, 'এটি আমাদের নবীরই প্রিয় দৌহিত্রের শির।' এ কথা শোনার সাথে সাথে খ্রিষ্টান মুখপাত্রের সমস্ত অবয়বে কাঁপুনি সৃষ্টি হল! তিনি বললেন, 'জালিমেরা! আমার কোন সন্দেহই রইল না যে, তোমরা এক মূল্যায়নহীন জাতি! তোমরা জালিম আর দুনিয়া-পূজারী! আমাদের ওখানে একটি গীর্জায় হযরত ঈসার বাহনের পায়ের একটি চিহ্ন সংরক্ষিত আছে। যুগ যুগ ধরে আমরা সেই পদচিহ্নের সম্মান করে আসছি। এদিকে তোমরাও কাবা ঘরের তীর্থে যাও, আমরাও যাই। আমরা তো আমাদের নবীর বাহনের পাকে আমাদের জীবনের রক্ষাকবচ বানিয়ে রেখেছি। অথচ তোমরা কি না তোমাদের নবী বংশের সাথে এরূপ আচরণ কর![১]

تفو بر تو اے چرخ گردوں تفو

'ধিক্ তোমাদের! ফানুস চেন না! ধিক্!!'

জনৈক ইহুদীর অভিশাপ আর ধিক্কার :

এজিদের দরবারে সেদিন এক ইহুদীও উপস্থিত ছিলেন। তিনি বললেন, আমি হযরত দাউদের বংশধর। বর্তমানে সত্তর প্রজন্ম গুজরান হয়ে গেছে, তা সত্ত্বেও হযরত দাউদের উম্মতেরা আমাকে অত্যন্ত সমীহ করে চলে। সেক্ষেত্রে তোমরা তোমাদের নবীর দৌহিত্রকে নৃশংসভাবে হত্যা করেছ! তার উপরে আস্ফালনে

১. আস্ সাওয়ায়িকুল মুহ্‌রিকা, ১৯৯।

ফেটে পড়ছ! অথচ এটি তোমাদের জন্য বিরাট ভরাডুবিরই বিষয়। এই দুর্ভাগ্যের যত মাতমই তোমরা কর না কেন, নগণ্যই!'[১]

এজিদের মুনাফেকীর রাজনীতি :

হযরত ইমাম হোসাইনের পবিত্র শির যখন এজিদের নিকট আনা হল, তখন সে খুবই আনন্দিত হল। তার দৃষ্টিতে ইবনে যিয়াদের সম্মান ও মর্যাদা অত্যন্ত বেড়ে গেল। তাই এজিদ প্রথমে তো ইবনে যিয়াদকে রাষ্ট্রীয় মর্যাদা ও সম্মাননায় ভূষিত করবার কথা ঘোষণা করেছিল। কিন্তু অল্পক্ষণ পরেই সে বুঝতে পারল যে, তার সেই ঘোষণার ফলে জনসাধারণের মনে তার গুরুত্ব বাড়বার স্থলে ঘৃনাই সৃষ্টি হয়েছে, লোকজন প্রকাশ্যেই তার সমালোচনা করছে, তাকে গালমন্দ করছে। এই উপলব্ধি তাকে ভীষণভাবে পীড়া দিতে থাকে। সে ভাবে, যেই নেতৃত্বের জন্য সে এত বড় জঘন্য অপরাধ ঘটাল, সেই অভীষ্ঠ কি তা হলে এখনো নাগালের বাইরে চলে যাবার উপক্রম হচ্ছে! জনগণের ঘৃনার এই জোয়ারে কোন সময়ে সৃষ্টি হতে পারে তরঙ্গের ঢল। তখন তো সবকিছু খড়-কুটোর মত ভাসিয়ে নিয়ে যাবে! অতএব, কারবালার রক্তাক্ত ঘটনায় সে লজ্জাবোধ প্রকাশ করা শুরু করল। সে বলল, 'মারজানার পুত্রের (ইবনে যিয়াদ) উপর আল্লাহ্‌র গজব আসুক! যে কারবালার ময়দানে পবিত্র আহ্‌লে-বাইতগণকে লাঞ্ছিত-অপমানিত করেছে! তাঁদের সদস্যগণকে হত্যা করেছে! তাঁদের উপর অত্যন্ত নৃশংসতা ও পিশাচিকতা প্রদর্শন করেছে! আমি তার এই আচরণে অত্যন্ত মর্মাহত! সে যদি হোসাইনকে জীবিত নিয়ে আসত, তাহলেই আমি বেশি খুশি হতাম! কিন্তু অত্যাচারী ইবনে যিয়াদ তাঁর উপর বড়ই জুলুম করেছে! জুলুমের শেষটাই করেছে! তার উপর আল্লাহ্‌র লানত! সে বড়ই অভিশপ্ত, সে মালউন!'

বিষয়টিকে আল্লামা ইবনে কসীর আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া কিতাবে এভাবেই উল্লেখ করেছেন :

لَمَّا قَتَلَ ابْنُ زِيَادٍ الْحُسَيْنَ وَبَنِي أَبِيهِ، بَعَثَ بِرُءُوسِهِمْ إِلَى يَزِيدَ، فَسُرَّ بِقَتْلِهِمْ أَوَّلًا، وَحَسُنَتْ بِذَلِكَ مَنْزِلَةُ ابْنِ زِيَادٍ عِنْدَهُ، ثُمَّ لَمْ يَلْبَثْ إِلَّا قَلِيلًا حَتَّى نَدِمَ، وَقَدْ لَعَنَ ابْنَ زِيَادٍ عَلَى فِعْلِهِ ذَلِكَ وَشَتَمَهُ فِيمَا يَظْهَرُ وَيَبْدُو،

[১] আস্ সাওয়ায়িকুল মুহ্‌রিকা, ১৯৯।

وَلَكِنْ لَمْ يَعْزِلْهُ عَلَى ذَلِكَ وَلَا عَاقَبَهُ وَلَا أَرْسَلَ يَعِيبُ عَلَيْهِ ذَلِكَ وَاللهُ أَعْلَمُ.

–ইবনে যিয়াদ ইমাম হোসাইনকে তাঁর সাথীদের সহ হত্যা করার পর শহীদগণের কর্তিত মস্তকগুলো এজিদের কাছে পাঠিয়ে দিল। হোসাইনের এই হত্যাযজ্ঞে এজিদ প্রথমে খুবই খুশি হল। সে কারণে তার কাছে ইবনে যিয়াদের সম্মান ও মর্যাদা বেড়ে গেল। কিন্তু সেই আনন্দে সে বেশিক্ষণ স্থায়ী থাকতে পারল না। বরং অল্প সময়ের মধ্যেই লজ্জিত হয়ে গেল। এজিদ ইবনে যিয়াদের এই কৃতকর্মে অভিশাপ তো দিলই, তার উপর তার কঠোর সমালোচনাও করল। সেটিই প্রকাশ পেয়েছিল। কিন্তু সে তার ভাষায় এ ধরনের জঘন্য অপরাধের কারণে ইবনে যিয়াদকে না পদচ্যুত করেছে, না সাজা দিয়েছে। কাউকে পাঠিয়েও তার কাছে নিন্দাবাদ প্রকাশ করা হয় নি।

এজিদের এ ধরনের মুনাফেকীসুলভ কথার ভিত্তিতে, সে যে ইবনে যিয়াদকে অভিশাপ দিয়েছিল, তার সমালোচনা করেছিল, সে কারণে অনেকেই সন্দেহ ও ভুলবুঝাবুঝির শিকার হয়েছেন। তাদের মনে ধারণা সৃষ্টি হয়েছে যে, এজিদ হোসাইনের হত্যায় খুশি ছিল না। সে এই ঘটনায় অত্যন্ত মর্মাহত হয়েছিল!

যারা এ ধারণা পোষণ করেন, তাদের উদ্দেশ্যে বলব, এজিদ যদি ইবনে যিয়াদের কর্মকাণ্ডে অসন্তুষ্ট হয়ে থাকত, তাহলে সে ইবনে যিয়াদ ও ইবনে সাআদ থেকে কিসাস কেন নিল না? আচ্ছা কিসাস রাখুন, তারা দুইজনকে পদচ্যুত করল না কেন? তাদের সাথে যেসব ওয়াদা করেছিল, সেগুলো শিথিল করল না কেন? এসব কিছুর ভেতর দিয়ে আমরা কি পরিস্কার দেখতে পাই না যে, সে তাদের কাছে কোনরূপ প্রশ্নবাদও করে নি, তাদের শাস্তিও দেয় নি।

এসব কিছু থেকে পরিষ্কার বুঝা যায় যে, সে ভেতরে ভেতরে খুবই খুশিই ছিল। ইবনে যিয়াদ ও ইবনে সাআদের কর্মকাণ্ডকে সে মনে মনে সত্যনিষ্ঠ বলেই জ্ঞান করত। পরবর্তীতে সে যে চোখের পানি মুছেছে, হোসাইনের পক্ষে সাফাই গেয়েছে, সবকিছুই ছিল তার রাজনৈতিক অপকৌশল, আর তার নেতৃত্বে ধস্ না আসার অপচেষ্টা! কেননা, হোসাইনের হত্যাযজ্ঞ তার নেতৃত্বকে কাৎ করে রেখেছিল!

এরপর এজিদ ইমাম আলী মকামের শির সহ অপরাপর সকল শহীদগণের শির সম্পর্কে বলেছিল, 'এগুলো নিয়ে দামেশকের বাজারে বাজারে মিছিল কর।' এই কি সেই এজিদ, যে হোসাইনের হত্যায় মর্মাহত হয়েছিল! সে যদি নাখোশই হয়ে থাকত, তবে হোসাইনের হত্যার পরও কেন আরো কিছু করার বাকি থেকে গিয়েছিল! সে যে শিরগুলোকেও বাজারে বাজারে মিছিল করাবার উদ্যোগ নিয়েছিল!

এজিদ নিঃসন্দেহে ইবনে যিয়াদ ও ইবনে সাআদের নৃশংস কর্মকাণ্ডে মনেপ্রাণে খুশিই ছিল। ইবনে যিয়াদের সমালোচনা করে এবং ইমাম হোসাইনের হত্যায় হতাশা প্রকাশ করে সে নিতান্তই লেফাফা দুরস্তিই করেছিল, জনগণ যেন তাকে ভুল না বুঝে! তার আরো একটি প্রমাণ, এই এজিদেরই হুকুমে আহ্‌লে-বাইতের কাফেলাকে দামেশকের অলিতে-গলিতে ঘুরানো হয়েছিল! শহীদদের কর্তিত মস্তক প্রদর্শন করা হয়েছিল। বর্শাবিদ্ধ করে সেই শিরগুলোর কোরাস মিছিল বের করা হয়েছিল।

হোসাইনের শিরের অলৌকিক শান :

বদ্‌-বখ্‌ত এজিদের নির্দেশে শহীদগণের কর্তিত মস্তক আর কারবালার বন্দীদেরকে তিনদিন ধরে দামেশকের বাজারে বাজারে প্রদর্শন করা হয়। হযরত মিনহাল বিন আমর থেকে বর্ণিত,

وَاللهِ رَأَيْتُ رَأْسَ الْحُسَيْنِ حِيْنَ حُمِلَ وَأَنَا بِدِمَشْقَ بَيْنَ يَدَيِ الرَّأْسِ رَجُلٌ يَقْرَأُ سُوْرَةَ الْكَهْفِ حَتَّى بَلَغَ قَوْلُهُ تَعَالَى : أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيْمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا، فَانْطَلَقَ اللهُ الرَّأْسَ بِلِسَانٍ ذَرِبٍ فَقَالَ : أَعْجَبُ مِنْ أَصْحَابِ الْكَهْفِ قَتْلِيْ وَحَمْلِيْ،

–আল্লাহ্‌র কসম, আমি হোসাইনের শির বর্শাবিদ্ধ দেখেছি। তখন আমি দামেশকে ছিলাম। শির মোবারকটির পাশে জনৈক ব্যক্তি সূরা কাহাফ তিলাওয়াত করছিলেন। তিনি তিলাওয়াত করতে করতে যখন أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيْمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا 'আপনি জানেন কি, নিশ্চয় আসহাবে কাহাফ আর রকীম ছিল আমারই অত্যাশ্চর্য বিষয়!' এই পর্যন্ত এলেন, তখন আল্লাহ্‌ তা'আলা শিরটিতে বাকশক্তি দান করলেন, শিরটি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলে উঠল, 'নিশ্চয়

আমাকে হত্যা করা আর আমার শির বর্শাবিদ্ধ করে প্রদর্শন করা এর চেয়েও অধিক আশ্চর্যের বিষয়।'[১]

এতে কোন সন্দেহ নাই যে, হযরত ইমাম হোসাইনকে হত্যা করা আর তাঁর দেহ থেকে মস্তক বিচ্ছিন্ন করে বর্শাবিদ্ধ অবস্থায় দামেশকের বাজারে বাজারে মিছিল করে যাওয়া আসহাবে কাহাফের ঘটনার চাইতেও অধিকতর আশ্চর্যের বিষয়। কেননা, আসহাবে কাহাফেরা তো নিজেদের বাড়িঘর আর স্বদেশ ত্যাগ করে পাহাড়ের গুহায় আশ্রয় নিয়েছিলেন কাফের বাদশাহ্‌র ভয়ে। কিন্তু ইমাম হোসাইন আহলে-বাইত ও অপরাপার সাথীদের সহ যে জুলুম-নির্যাতন আর অবর্ণনীয় নৃশংসতার শিকার হয়েছিলেন, তা এমনসব লোকজনের হাতেই হয়েছিলেন, যারা ছিল ঈমান-ইসলামেরই দাবীদার! আসহাবে কাহাফগণ ছিলেন সাধারণলোক। যাঁরা সেই আমলটির কারণে বেলায়তের মর্যাদা লাভ করেছিলেন। পক্ষান্তরে হযরত ইমাম হোসাইন ছিলেন দীনের নবীরই কলিজার টুকরা, রাসূল পাকেরই পরাণের দৌহিত্র। আসহাবে কাহাফগণ কয়েক বৎসর পর কথাবার্তা বলেছিলেন ঘুম থেকে উঠে। যা-ই হোক, তাঁরা জীবিতই ছিলেন। অথচ ইমাম হোসাইনে মস্তক ধড় থেকে আলাদা হওয়ার কয়েক দিন পর বর্শার সূচাগ্র ফলা থেকে কথা বলে উঠা আসহাবে কাহাফের ঘটনার চাইতেও অধিক আশ্চর্যের!

আহ্‌লে-বাইতগণের মদীনায় ফিরে আসা :

এজিদ নবী-পরিবারের বাদবাকি সদস্যদের মদীনা পাঠিয়ে দেবার ইচ্ছা পোষণ করল। সর্বপ্রথম সে ইমাম যাইনুল আবেদীনকে ডেকে বলল, 'ইবনে যিয়াদের উপর আল্লাহ্‌র লানত হোক! আল্লাহ্‌র কসম, আমি যদি তার জায়গায় হতাম, আমার সমূহ ক্ষতি হয়ে থাকলেও হোসাইন যা যা বলতেন, সবই মেনে নিতাম। কিন্তু আল্লাহ্‌ যা মঞ্জুর করে রেখেছিলেন, সেটি হয়েছে, যা তোমরা দেখতে পাচ্ছ। যা-ই হোক, তোমাদের যদি কোন কিছুর প্রয়োজন হয়, অবশ্যই আমার নিকট লিখে পাঠিয়ে দেবে।' তারপর নোমান বিন বশীরকে ডেকে বলে দিল এঁদের জন্য সফরের প্রয়োজনীয় সবকিছুর ব্যবস্থা নিতে এবং ভদ্র ধরনের সহগামী সেনাদের হেফাজতে মদীনা পৌঁছিয়ে দিতে। অতএব, সে তাঁদেরকে বড়ই সম্মান ও মর্যাদা সহকারে নিরাপদে ও আরামে মদীনা পৌঁছিয়ে দিল।

১. সিরুশ্‌ শাহাদাতাইন, ৩৫।

নবী-পরিবারের সদস্যগণ নোমান বিন বশীরের অনুপম সেবা ও ভদ্রপ্রতীম ব্যবহারে অত্যন্ত মুগ্ধ হলেন। তাঁরা তাকে অকৃত্রিম সেবার বিনিময়ে পুরস্কার স্বরূপ কিছু দিতে চাইলেন। অতএব, হযরত যায়নাব ও হযরত (ছোট) ফাতেমা সেই অলংকারগুলো যা তাঁদেরকে এজিদ তাঁদের অলংকারের বদলায় দিয়েছিল, পরণ থেকে খুলে নিয়ে নোমান বিন বশীরের নিকট পাঠিয়ে দিলেন। আর বলে পাঠালেন, 'বর্তমানে আমরা সম্বলহারা। এ ছাড়া আমাদের কাছে এখন কিছুই নাই। এ হচ্ছে তোমার সুন্দর ব্যবহার আর অকৃত্রিম সেবার শুকরিয়া ও বখশিশ! তুমি এগুলো গ্রহণ কর!' কিন্তু হযরত নোমান বিন বশীর অলংকারগুলো ফেরৎ দিয়ে বললেন, 'আল্লাহ্‌র কসম, আমি দুনিয়ার লোভে কিছু করি নি। আমি বরং আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য আর রাসূলের পরিবার-পরিজন বলেই নগণ্য সেবাটুকুন করেছি!'[১]

নিপীড়িত এই কাফেলাটি যখন মদীনার উপকণ্ঠে প্রবেশ করল, সমস্ত মদীনাবাসী নিজ নিজ গৃহ থেকে বেরিয়ে তাঁদের দেখার জন্য ছুটে আসে। লোকমান বিন আকীল বিন আবি তালিবের আম্মাজান স্বগোত্রীয় রমনীদের সাথে কাঁদতে কাঁদতে বের হয়ে আসেন। আর নিচের শেরগুলো পড়তে থাকেন :

مَاذَا تَقُولُونَ إِنْ قَالَ النَّبِيُّ لَكُمْ ◊ مَاذَا فَعَلْتُمْ وَأَنْتُمْ آخِرَ الْأُمَمِ

بِأَهْلِ بَيْتِي وَأَنْصَارِي وَذُرِّيَّتِي ◊ مِنْهُمْ أُسَارَى وَقَتْلَى ضُرِّجُوا بِدَمِ

مَا كَانَ ذَاكَ جَزَائِي إِذْ نَصَحْتُ لَكُمْ ◊ أَنْ تَخْلُفُونِي بِسُوءٍ فِي ذَوِي رَحِمِي

–'হে লোকসকল! তোমরা তখন কী জবাব দেবে, রাসূল যখন তোমাদেরকে জিজ্ঞাসা করবেন, আখেরী উম্মত হয়ে তোমরা আমার পরবর্তীতে আমার সন্তান ও আহ্‌লে-বাইতগণের সাথে কী আচরণ করেছ? তোমরা তো তাদের কাউকে বন্দী করেছ, কাউকে রক্তাপ্লুত করেছ। আমি তোমাদের যে উপদেশ দিয়েছিলাম 'আমার পরবর্তীতে তোমরা আমার আত্মীয়দের সাথে দুর্ব্যবহার করবে না'– সেটির জবাব তো এ রকম হয় না!'[২]

১. তাবারী, ৬: ৩৪।
২. আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৮: ১৯৮। ইবনে আছীর, ৪: ৮৯।

হযরত ইমাম জাফর সাদেক রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বর্ণনা করছেন, কারবালার মর্মন্তুদ ঘটনার পর হতে হযরত যাইনুল আবেদীন রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু দিনের বেলা রোজা রাখতেন আর রাতের বেলা নামাজ পড়ে কাটাতেন। ইফতারের সময় যখন দানা-পানি নিয়ে আসা হত তিনি বলতেন, 'আমার বাপ-ভাইয়েরা যে ক্ষিধা আর পিপাসা নিয়ে মারা গেলেন, দানা-পানি চোখে দেখেন নি!' আর কাঁদতেন। খুব জোর এক কি দুই লোকমা খেতেন। আর দুই-এক ঢোঁক পানি পান করতেন। সেই পানিতেও চোখের পানি মিশে যেত! কারবালার করুণ দৃশ্য, বাপ-ভাইয়ের মুহুর্মুহু ভয়ঙ্কর কল্পনা কখনো তাঁর হৃদয়ের শ্লেট থেকে মুছে যায় নি। সারা জীবন তাঁর দুই চোখ অশ্রুসিক্তই ছিল!

এজিদের ফেরাউনিয়াত ও গোমরাহীর বিবরণ :

ইমাম আলী মকাম হযরত ইমাম হোসাইনের শাহাদাতের পর বদ-বখ্‌ত এজিদের মাঝে ফেরাউনিয়াত ও কারূনিয়াত দিন দিন বেড়েই চলেছিল। দিনের পর দিন তার কুবৃত্তি ও অপকর্ম কেবল বৃদ্ধিই পেতে চলেছিল। নেতৃত্বের নেশা তার মন-মগজে নতুন করে চেপে বসে। সে তো আগে থেকেই মদ্যপ ছিল। বর্তমানে মদের নেশা সীমা ছাড়িয়ে যায় তার। দুরাচার তো আগে থেকেই ছিল। বর্তমানে সৎ-মা, বোন ও কন্যাদের সাথেও সে বাচ-বিচারের বালাই করে না। মোটকথা, সে এখন সর্বদোষে দুষ্টের এক মূর্তপ্রতীকে পরিণত হয়ে গেল। তার জুলুম, অত্যাচার ও দুর্নীতির শেষ থাকে নি। সে কারণে আপামর জনসাধারণ বিশেষ করে হেজাযের অধিবাসীরা তার ঘোর বিরোধী হয়ে গেল। এজিদের বিভিন্ন ধরনের দুরাচরণের কারণে তারা তার বশ্যতা ত্যাগ করল। যেমন, গসীলুল মালায়িকা হযরত আবদুল্লাহ্ বিন হানজালা বলছেন, 'আল্লাহ্‌র কসম, আমরা এজিদের বশ্যতা তখনই ত্যাগ করি, যখন সকলে এই আশঙ্কা করে যে, এজিদের এমন ধরণের চরিত্রহীনতার কারণে পাছে আমাদের উপর আসমান থেকে গজবের পাথর এসে পতিত হয়! মা-বোন-বেটী সবাইকে সে বিয়ে করত! মদ পান করত! নামাজ পড়ত না!'

এজিদ যখন দেখতে পেল যে, মক্কা ও মদীনার কোন লোকেই তাকে দুই চোখে দেখতে পারে না, সবাই তার বশ্যতা ত্যাগ করেছে, মক্কা-মদীনার এই বিরুদ্ধবাদ অপরাপর অঞ্চলেরও বিরোধিতার কারণ হয়ে দাঁড়াবে, কেননা, পবিত্র মক্কা-মদীনাই ইসলামের প্রাণকেন্দ্র ও উৎসস্থল, তাই সে তার নেতৃত্বের ডুবন্ত বৈতরণীটিকে কোন রকম উত্তরণের জন্য মুসলিম বিন উকবাকে বিশ হাজার সৈন্য দিয়ে পবিত্র মক্কা-মদীনায় হামলা করার জন্য পাঠিয়ে দিল।

এই কুকর্ম এজিদ নামের সেই দুরাচারেরই যাকে কখনো 'আমীরুল মুমিন'ও বলা হয়, কখনো নামের সাথে 'রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু'ও লিখা হয়, বলাও হয়। বরং কিছু কিছু মানুষ তো এজিদকে মুমিন ও জান্নাতীও বলে থাকে। যেই এজিদকে কখনো মুমিন, কখনো জান্নাতী অভিহিত করা হয়ে থাকে, তার ধর্মীয় কর্মকাণ্ড আর চরিত্র হচ্ছে, সেই অস্পৃশ্যই নবী-দৌহিত্রকে শহীদ করার পর বিশ হাজার সৈন্যের একটি দল পবিত্র মদীনা মুনাওয়ারাকে লণ্ডভণ্ড করে দেবার জন্য পাঠিয়ে দেয়। যারই ফলশ্রুতিতে অবতারণা হয় 'হার্‌রা'র ঘটনার মত ঘৃনিত ইতিহাসের।

বদ-বখ্‌ত এজিদী বাহিনী পবিত্র মদীনা মুনাওয়ারায় গিয়ে এমন তুফান সৃষ্টি করে দিল যে, সে কথা ভাবতেও মন বিষিয়ে উঠে! সৈন্যরা মদীনার অধিবাসীদের উপর এবং আল্লাহ্‌র নবীর প্রিয়জনদের উপর অত্যাচারের শেষ চালাল। হত্যাযজ্ঞ, লুটতরাজ, শ্লীলতাহানির এমন হিড়িক তুলে ফেলল যে, তাওবা, তাওবা .....!! হেরমের বাসিন্দাদের নিকট থেকে এজিদের পক্ষে দাসখৎ নিতে লাগল জোর করে। এই কথার উপর সবাইকে দাস বানাতে লাগল যে, তোমরা এজিদের হাতে বাইয়াত হও, তিনি ইচ্ছা করলে তোমাদের বিক্রি করে দেবেন, ইচ্ছা করলে মুক্ত করে দেবেন'! কেউ আল্লাহ্ ও তদীয় রাসূলের নির্দেশ মোতাবেক কিতাব-সুন্নাহ্‌র কথা বললেই তাকে কতল করে দেওয়া হত। অনেক অনেক মানুষ শহর ত্যাগ করে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়। যারা পালিয়ে যান নি তাদের মধ্য থেকে সতের শ' আনসার-মুহাজির সাহাবা, সাত শ' হাফেজে-কুরআন, প্রখ্যাত তাবেঈ ও পর্দানশীন রমনীসহ অপরাপর প্রায় দশ হাজারের কাছাকাছি সদস্যকে শহীদ করা হয়। তাঁদের ঘরবাড়িও লুট করা হয়। সেই জালিমেরা তিনদিনের জন্য পবিত্র মদীনা নগরীকে বৈধ ঘোষণা দিয়ে বর্বরতা ও পৈশাচিকতার এক মহা তাণ্ডব চালায়। সেই বর্বরতা ও পৈশাচিকতার বিবরণ অবর্ণনীয়। পবিত্র মদীনার পবিত্র রমনীদের শ্লীলতা হানি করা হয়। রাসূলের সাহাবী হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু, যাঁর পবিত্র দাঁড়ি সাদা ছিল, দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেলেছিলেন, মসজিদে নববীতে আশ্রয় নিয়েছিলেন, যাতে যথাসময়ে যথারীতি নামাজগুলো আদায় করতে পারেন, এজিদী বাহিনীরা জিজ্ঞাসা করল, 'বাবা! আপনি কে হন?' তিনি বললেন, 'আমি রাসূলের একজন সাহাবী হই। আমার নাম আবু সাঈদ খুদরী!' দুর্বৃত্তরা সাথে সাথে তাঁর সাদা দাঁড়িগুলো ঝাপটে ধরে চড় লাগিয়ে দেয়! তারপর খুবই বেইজ্জত করে ঘরে পাঠিয়ে দেয়!

দুরাচার বাহিনীর লোকেরা মসজিদে নববীর স্তম্ভগুলোর সাথে তাদের ঘোড়া বেঁধে রাখে! তিনদিন ধরে মসজিদে নববীতে এবাদত-বন্দেগী, নামাজ ও জামাত কিছুই হতে পারে নি। হযরত সাঈদ বিন মুসাইয়িব রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু, যিনি ছিলেন উচ্চমানের একজন তাবেঈ, বলছেন, 'আমি একজন পাগল সেজে মসজিদে নববীর মিম্বরের পাশে লুকিয়ে গেলাম। ধরাও খেলাম! কিন্তু উদাস-পাগল বলে ছেড়ে দেওয়া হল! মদীনার এই অবস্থায় রাসূল পাকের মাজার ত্যাগ করে ঘরে চলে যেতে আমার মন সাড়া দিচ্ছিল না। তিনদিন তিনরাত ধরে আমি এই মিম্বর শরীফেই বসে বসে কাটালাম! সেই সময়ে মসজিদে কোন আজানও দেওয়া হত না, জামাতও হত না। মহান আল্লাহ্‌র কসম, যখন নামাজের সময় হত, তখন রাসূলের রওজায়ে আকদাস থেকে আজান, নামাজ ও জামাতের শব্দ শুনতে পেতাম! অতএব, এই তিনদিনের নামাজগুলো আমি সেই জামাতের সাথেই আদায় করেছিলাম। আমার সাথে অন্য কেউ থাকত না!'

এমন তর হত্যাযজ্ঞ ও লুটতরাজের পর মুসলিম বিন উকবা লোকদেরকে এজিদের বশ্যতা মেনে নেবার জন্য আহ্বান জানাল। লোকদের মাঝে গড়িমসির ভাব দেখা গেল। কিছু লোক জান-মালের ভয়ে বশ্যতা মেনেও নেয়। আবার কিছু লোক সেই কঠোর পরিস্থিতিতেও দৃঢ়সংকল্প থাকে। কোরাইশ বংশীয় জনৈক ব্যক্তি বাইয়াত কালে বললেন, 'আমি বাইয়াত করলাম; তবে আল্লাহ্-আল্লাহর রাসূলের আনুগত্যে, অবাধ্যতায় নয়!' মুসলিম বিন উকবা তাকে হত্যার নির্দেশ দিল। তাকে যখন হত্যা করা হল, তখন তার মাতা এজিদ বিনতে আবদিল্লাহ্ কসম করেছিলেন, আমার যদি সুযোগ হয়, এই জালিম মুসলিমকে জীবিত কি মৃত জ্বালিয়ে পুড়ব!' অতঃপর সেই বদ-বখ্‌ত মুসলিম বিন উকবা মদীনায় তাণ্ডব চালানোর পর যখন পবিত্র মক্কা নগরীর দিকে কুদৃষ্টি করল, সেখানকার আবদুল্লাহ্ বিন যোবাইর ও তাঁর সাথীদেরকে শেষ করে দেবার ঘৃন্য মতলবে, যাঁরা এজিদের বিরোধিতায় বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিলেন, পথিমধ্যে তার পক্ষাঘাত রোগ দেখা দেয়। সে মারা যায়। এজিদের নির্দেশে তার স্থলে হোছাইন বিন নমীরকে সেনাধ্যক্ষ নিযুক্ত করা হল। মুসলিম বিন উকবাকে তারা সেখানেই দাফন করে দিয়ে সামনের দিকে অগ্রসর হতে চলল। এজিদের বাহিনীরা যখন চলে গেল, ঠিক সেই মুহূর্তে নিহত কোরাইশ বংশীয় ব্যক্তির মাতা মুসলিম বিন উকবার মৃত্যুর সংবাদ প্রাপ্ত হলেন। তিনি কিছু লোককে সাথে নিয়ে সেখানে এলেন, মুসলিমকে কবর

থেকে বের করে জ্বালিয়ে দেবার জন্য, যাতে তাঁর কসম পূর্ণ হয়। কবরটি যখন খোঁড়া হয়, দেখা গেল বিরাট এক অজগর সাপ মুসলিম বিন উকবার ঘাঁড় পেঁচিয়ে নাকের হাঁড় ধরে চুষতে রয়েছে। এই দৃশ্য দেখে সবাই ঘাবড়ে গেল। সবাই মহিলাটিকে বলল, স্বয়ং আল্লাহ্ই তার কৃতকর্মের সাজা দিচ্ছেন! তিনিই তো তার জন্য আজাবের ফেরেশতা মোতায়েন করে রেখেছেন! অতএব, আপনি তাকে বাদ দিন, তাকে জ্বালাবার ইচ্ছা ত্যাগ করুন! মহিলাটি বললেন, 'না, তা হয় না। আল্লাহ্র কসম, আমি আমার কসম সত্যে পরিণত করবই! তাকে জ্বালিয়ে আমি নিজের কলিজাটাকে শীতল করব!' অবশেষে বাধ্য হয়ে লোকেরা মুসলিমকে পায়ের দিক থেকে খোলার চেষ্টা করল। সেদিক থেকে যখন মাটি আলগাল, দেখা গেল পায়ের দিকেও একটি অজগর তাকে জড়িয়ে রয়েছে। সকলে মহিলাটিকে বলল, এখন আপনি একে জ্বালাবার ধারণা মন থেকেই বাদ দিয়ে দিন। কারণ, তার জন্য এখানকার আজাবই যথেষ্ট। কিন্তু মহিলাটি নাছোড় বান্দা। তিনি অযু করে দুই রাকাত নামাজ আদায় করলেন। এরপর আল্লাহ্র দরবারে দুই হাত তুলে দিয়ে ফরিয়াদ করতে লাগলেন, 'হে আল্লাহ্! তুমি নিশ্চয় জান যে, এই জালিমটির উপর আমার রাগ একান্ত তোমার রেজামন্দিরই জন্য। তুমি আমাকে সেই ক্ষমতা দান কর, যাতে আমি আমার শপথ পূর্ণ করতে পারি, একে জ্বালিয়ে দিতে পারি!' এই দোয়াটি করার পর মহিলাটি একটি কাঠ দিয়ে সাপের লেজে আঘাত করলেন। তৎক্ষণাৎ সাপটি মুসলিমের ঘাঁড় ছেড়ে দিয়ে চলে গেল। এরপর অপর সাপটিকেও আঘাত করলেন। সেটিও চলে গেল। এবার তিনি মুসলিমের লাশটিকে কবর থেকে বের করে নিয়ে জ্বালিয়ে দিলেন। মনে হয় যেন স্বয়ং আল্লাহ্ও তার প্রথম সাজাকে যথার্থ নয় বলে জেনেছিলেন। তাই তিনিই এই মহিলাটির মাধ্যমে তাকে আগুনে জ্বালিয়ে পোড়ার সাজা দিলেন।

মুসলিম বিন উকবা মদীনার মর্যাদাহানি, মদীনা নগরীতে চরিত্রহীনতা, হত্যাযজ্ঞ, সীমাতিরিক্ততা ও অপব্যয় এতই প্রদর্শন করেছিল যে, মৃত্যুর পর সে 'মুসরিফ' (অপব্যয়কারী) নামেই পরিচিত হয়ে গিয়েছিল। সেই মদীনাতেই সে কুযজ্ঞ চালিয়েছিল, যে মদীনার বাসিন্দাদের সম্পর্কে স্বয়ং রাসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছিলেন,

مَنْ اَرَادَ اَهْلَ الْمَدِيْنَةِ بِسُوْءٍ اَذَابَهُ اللهُ فِي النَّارِ كَمَا يَذُوْبُ الْمِلْحُ فِي الْمَاءِ،

–যে ব্যক্তি মদীনাবাসীদের সাথে খারাপ আচরণের ইচ্ছা পোষণ করবে, তাকে আল্লাহ্ তা'আলা (জাহান্নামের আগুনে) এমনভাবে বিগলিত করবেন, লবণ যেমন পানির মধ্যে বিগলিত হয়ে যায়।[১]

অপর এক রেওয়ায়তে এভাবে এসেছে,

لَا يُرِيْدُ اَحَدٌ اَهْلَ الْمَدِيْنَةِ بِسُوْءٍ اِلَّا اَذَابَهُ اللهُ فِي النَّارِ ذَوْبَ الرَّصَاصِ،

–যে ব্যক্তি মদীনাবাসীদের সাথে খারাপ আচরণের ইচ্ছা পোষণ করবে, তাকে আল্লাহ্ তা'আলা আগুনে তামা যেভাবে বিগলিত হয়ে যায়, সেভাবে বিগলিত করে ফেলবেন।[২]

হযরত ওবাদা বিন সামিত রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হু বলছেন, হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন,

مَنْ اَخَافَ اَهْلَ الْمَدِيْنَةِ ظُلْمًا اَخَافَهُ اللهُ وَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ الْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ لَا يُقْبَلُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا،

–বিনা কারণে যে ব্যক্তি মদীনাবাসীদের ভীত-সন্ত্রস্ত করবে, তাকে আল্লাহ্ তা'আলা ভীত-সন্ত্রস্ত করবেন। তার উপর আল্লাহ্, ফেরেশ্তা ও সমস্ত মানবকুলের অভিশাপ বর্ষিত হবে। কেয়ামত দিবসে আল্লাহ্ তার কোন আমলই কবুল করবেন না।[৩]

উপরোক্ত হাদিসাদি দ্বারা মদীনা ও মদীনাবাসীদের মর্যাদাহানি যারা করবে তাদের পরিণতি কেমন হবে, তা পরিষ্কার রূপে প্রতিভাত হয়ে যায়! এও প্রতীয়মান হয় যে, দুনিয়ার তাবৎ সৃষ্টিকুলে নিকৃষ্টতম জীব হিসাবে গণ্য করা হবে তাদের।

এজিদের নির্দেশে এজিদের লস্করেরা নবী-পরিবারের পবিত্র সদস্যদের এবং মদীনাবাসীদের কেমন রূপ যে মর্যাদাহানি ও অবমাননা করেছে আর তাদের উপর যে কী ধরনের অকথ্য নির্যাতন চালিয়েছে সে কথা ভাবতেও মন কেঁপে উঠে। সন্দেহ নাই যে, এজিদ ও তার সহযোগীরা অভিশাপেরই যোগ্য। তারা আল্লাহ্ তা'আলার এই এরশাদটির আওতায় পড়ে :

১. অনুদিত খুলাসাতুল ওয়াফা, ১২১।
২. অনুদিত জযবুল কুলুব, ৩৭।
৩. জযবুল কুলুব, ৩৮।

إِنَّ ٱلَّذِينَ يُؤْذُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ لَعَنَهُمُ ٱللَّهُ فِى ٱلدُّنْيَا وَٱلْءَاخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُّهِينًا ﴿٥٧﴾

–নিশ্চয় যারা আল্লাহ্ ও তদীয় রাসূলকে কষ্ট দেয়, দুনিয়া ও আখিরাতে আল্লাহ্ তাদের উপর অভিশাপ দেন। তাদের জন্য প্রস্তুত করে রাখা হয়েছে লাঞ্ছনাকর শাস্তি।[১]

পবিত্র মক্কা শরীফে হামলা :

এজিদ সিংহাসনে বসার সাথে সাথেই মদীনার গভর্নর ওয়ালিদ বিন ওকবার মাধ্যমে হযরত ইমাম হোসাইন, হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর ও হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে যোবাইরের কাছ থেকে বাইয়াত তলব করেছিল। হযরত ইমাম হোসাইনকে মদীনার গভর্নর ডেকে পাঠালে তিনি তার কাছে যান এবং এজিদের বশ্যতা মেনে না নিয়ে করে পুনরায় ফিরে আসেন। মদীনার গভর্নর হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে যোবাইরকেও ডেকেছিল। তিনি কিন্তু তার ডাকে সাড়া দেন নি। সেই রাতেই তিনি মদীনা মুনাওয়ারা থেকে হিজরত করে মক্কা নগরীতে চলে আসেন। হিজরতের পর থেকে তখনো পর্যন্ত তিনি পবিত্র মক্কা নগরীর হেরম শরীফের আশ্রয়ে শান্তিতে বসবাস করছিলেন। হেজাযবাসীরা যখন এজিদের মন্দ আচরণের কারণে কঠোরভাবে বিগড়ে যায় তখন হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে যোবাইর মক্কাবাসীদের এক স্থানে জমায়েত হওয়ার আহ্বান জানান। সকলের সামনে তিনি এক জ্বালাময়ী বক্তব্য পেশ করলেন। বক্তব্যের মূলকথা ছিল এ রকম :

'ইরাকবাসীরা বিশেষ করে কুফাবাসীরা গুটিকতেক ছাড়া এতই ধর্মবিমুখ ও গোঁয়ার যে, তারা রাসূলের দৌহিত্রকে আহ্বান করেছিল তাঁকে ইমাম বানাবার কথা বলে, তাঁর পক্ষে সহযোগিতা করার কথা বলে আর তাঁর হাতে বাইয়াত হবে বলে। কিন্তু গোঁয়াররা সেরূপ করে নি। বরং তারা এজিদ সরকারের সাথে আঁতাত করে নিয়ে বলল, 'আপনি আমাদের হাতে ধরা দিন। যাতে ইবনে যিয়াদের হাতে তুলে দিতে পারি। নতুবা আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামুন।' হযরত ইমাম হোসাইন লাঞ্ছনার জীবনকে পাশ কেটে গেলেন এবং সম্মানের মৃত্যুকে প্রাধান্য দিলেন। দুশমনের সামনে তিনি নতশির হন নি। আল্লাহ্ তাঁর

[১]. সূরাঃ আহযাব, ৩৩: ৫৭।

উপর রহমত করুন এবং তাঁর হত্যাকারীদেরকে দুনিয়া ও আখিরাতে লাঞ্ছিত করুন! তারা ইমাম হোসাইনের সাথে যা যা আচরণ করেছে, এতকিছুর পরেও আমরা তাদেরকে কীভাবে বিশ্বাস করতে পারি! কীভাবে মেনে নিতে পারি! তারা কোন অর্থেই আনুগত্যের যোগ্য হতে পারে না। আল্লাহ্র কসম, নিঃসন্দেহে তারা এমন এক ব্যক্তিত্বকেই হত্যা করেছে যিনি ছিলেন কায়েমুললাইল ও সায়িমুন্নাহার– রাতের বেলায় নামাজে মগ্ন থাকতেন আর দিনে রাখতেন রোজা! সালতানাত সঁপে দেবার সমধিক যোগ্য ছিলেন তিনি। তাছাড়া দীনদারী, ফজিলত ও বুজর্গীর দিক থেকেও তিনি তাদের চাইতে অত্যধিক শ্রেষ্ঠই ছিলেন। আল্লাহ্র কসম, তিনি কুরআনের বিপরীতে গোমরাহী ছড়াবার লোক ছিলেন না। আল্লাহ্-ভীতিতে কান্নাকাটিতে মগ্ন থাকার শেষ ছিল না। তিনি রোজাগুলোকে মদ পানে পাল্টে দিতেন না। না তাঁর মজলিসেও আল্লাহ্র জিকিরের আলোচনা বাদ দিয়ে শিকারী কুকুরের আলোচনা হত।'

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে যোবাইর কথাগুলো এজিদের প্রতি ইঙ্গিত করেই বলেছিলেন। ইবনে যোবাইর অতঃপর বললেন, 'অনতিবিলম্বে এই এজিদী লোকেরা জাহান্নামের ইন্ধন হবে।'[১]

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে যোবাইরের এই বক্তব্যের পর সবাই তাঁর কাছে আবেদন জানালেন, 'আপনি সবাইকে আপনার হাতে বাইয়াতের আহ্বান করুন!' অতএব, তিনি বাইয়াতের আহ্বান করলেন। হযরত ইবনে আব্বাস ও হযরত মোহাম্মদ বিন হানাফিয়া ব্যতীত পবিত্র মক্কা ও মদীনার আপামর জনসাধারণ তাঁর হাতে বাইয়াত গ্রহণ করে নিলেন। জনগণ এজিদের সমস্ত কর্মচারীদেরকে মক্কা ও মদীনা থেকে বহিষ্কার করে দিলেন। এভাবে পবিত্র হেজায থেকে এজিদী সরকারের পতন হল।

এজিদ এসব কথা জানতে পারল। তখন সে বিরাট এক বাহিনী পাঠিয়ে দিল পবিত্র মক্কা ও মদীনা আক্রমণের জন্য। সেই বাহিনী পবিত্র মদীনা ও মদীনাবাসীদের সাথে যে ধরনের অসাধু আচরণ করেছিল পূর্বে সে সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। মদীনায় তাণ্ডব চালানোর পর বাহিনীর লোকেরা হোছাইন বিন নামীরের নেতৃত্বে পবিত্র মক্কা মুকাররামাও হামলা চালায়। হযরত

[১]. আত্ তাবারী, ৬: ৩৫।

ইবনে যোবাইর মক্কা শরীফে অবরুদ্ধ হয়ে গেলেন। এজিদী বাহিনীরা একাধারে চৌষট্টি দিন পর্যন্ত পবিত্র মক্কাকে অবরুদ্ধ করে রাখে। তারা অকাতরে মানুষ খুন করতে থাকে আর পাথুরে কামান দিয়ে পাথর বর্ষণ করতে থাকে। এভাবে তারা মক্কা শরীফের পবিত্র আঙ্গিনাকে পাথরে ভরে দেয়। পবিত্র কাবা শরীফে পাথর নিক্ষেপ করা কালে এজিদী বাহিনীরা বলত:

خِطَارُهُ مِثْلُ الْفَنِيْقِ الْمُزْبِدِ • تَرْمِيْ بِهَا جَذْوَانُ هَذَا الْمَسْجِدِ

–এই মিনজানীক (পাথুরে কামান) পুরো কফদার উটের ন্যায়। যা দিয়ে এই মসজিদে (হারামে)র দেওয়ালগুলোতে পাথর বর্ষণ করা হচ্ছে!

পাথর বর্ষণ করতে করতে ওমর বিন হাওতা আস্ সুদুসী নিচের শেরগুলো আওড়াচ্ছিল :

كَيْفَ تَرَى صَنِيعَ أُمِّ فَرْوَةْ • تَأْخُذُهُمْ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةْ

–উম্মে ফর্দাটি (পাথর নিক্ষেপক যন্ত্র) একটু দেখ! ছফা ও মারওয়ার মাঝখানের মানুষগুলোকে সে কীভাবে নিশানা বানিয়েছে![১]

মোটকথা, ওসব বেদীনেরা আল্লাহ্‌র কাবা গৃহে এত বেশি পাথর নিক্ষেপ করে যে, আগুন ধরে যায়। কাবা শরীফের গিলাফ ও দেওয়াল জ্বলে যায়। মসজিদের হারামের স্তম্ভ ভেঙ্গে যায়। এজিদী বাহিনীর পাশবিকতা ও বর্বরতার কারণে পবিত্র হেরেমের বাসিন্দারা সুদীর্ঘ দুই মাস যাবৎ মানবেতর জীবন যাপন করেন। পবিত্র কাবা গৃহ অনেক দিন যাবৎ গিলাফ বিহীন থাকে!

এ সমস্ত ঘটনা ঘটে ৬৪ হিজরীতে।

যুদ্ধ তখনো অব্যাহত ছিল। হঠাৎ খবর এল বদ-বখ্‌ত এজিদ মরেছে। এই খবর শোনামাত্র হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে যোবাইর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হু চিৎকার দিয়ে বলে উঠলেন, 'হে সিরীয়রা! তোমাদের তাগুত মরেছে!'

এজিদের মৃত্যুতে সিরিয়দের সাহস ভেঙে গেছে। এদিকে হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে যোবাইর ও তাঁর সহযোগীদের হিম্মত বেড়ে গেছে। অতএব, হযরত ইবনে যোবাইর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হু সহযোগীদের নিয়ে এজিদী বাহিনীর

[১]. আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৮: ২২৫।

উপর তুমুল আক্রমণ শুরু করে দিলেন। এজিদের মৃত্যুতে তার লস্করদের মনও আগে থেকেই ভেঙে গিয়েছিল। এই হামলার জোর তারা বরদাশত করতে পারল না। তাই তারা চোখে মুখে পথ না দেখে পৃষ্ঠপ্রদর্শন পূর্বক সিরিয়া পালিয়ে গেল। এভাবে মক্কাবাসীরা এজিদী বাহিনীর বর্বরতা ও পাশবিকতা থেকে রেহাই পেল।

হযরত ইমাম হোসাইনের শাহাদাত, শাহাদাতের স্থান, শাহাদাতের সময় সম্পর্কে রাসূলের যুগে ও খেলাফতে রাশেদার যুগে রাসূলের রেওয়ায়তগুলো যাঁদের মাধ্যমে বর্ণিত হয়েছে তাঁদের নামসমূহ নিচে দেওয়া হল :

১. উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দীকা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হা
২. হযরত উম্মে ফজল রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হা
৩. হযরত আনস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হু
৪. উম্মুল মুমিনীন হযরত উম্মে সালেমা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হা
৫. সাইয়েদুনা আবু হোরায়রা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হু
৬. হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হু
৭. হযরত আবি সালেমা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হু
৮. হযরত মোহাম্মদ বিন ওমর বিন ইমাম হাসান রাদিয়াল্লাহু আন্‌হু
৯. হযরত ইয়াহিয়া হাযরামী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হু
১০. হযরত আসবাগ বিন বিনানা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হু।

অধ্যায় : ০৫

শাহাদাতে ইমাম হোসাইন ও মকামে রেযা

আল্লাহ্‌র নৈকট্য ও সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য আল্লাহ্‌র উচ্চ মর্যাদার বান্দাদের যেসব একনিষ্ঠ কর্মকাণ্ড ও প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হয়, তার কয়েকটি ধাপ রয়েছে। আল্লাহ্‌র সূফী বান্দারা তার তিনটি ধাপের কথা উল্লেখ করেছেন। সেগুলো হচ্ছে :

১. সবর
২. তাওয়াক্কুল
৩. রেযা

০১. সবর :

সবর দুই ধরনের হয়ে থাকে। যথা,

১. জাহেদগণের সবর
২. আশেকগণের সবর

জাহেদগণের সবরে তিনটি ধাপ ও স্তর রয়েছে। যথা,

১. সবর লিল্লাহ্– আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে সবর
২. সবর আলাল্লাহ্– আল্লাহ্‌র উপর সবর
৩. সবর মাআল্লাহ্– আল্লাহ্‌র সঙ্গে সবর

সবরের এই প্রকরণ ও স্তরের কথা বর্ণনা করেছেন হযরত আবু বকর শিবলী, যিনি হলেন হযরত সাইয়েদুনা গাউছে আযম রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর মাশায়িখগণের অন্যতম।

সবর লিল্লাহ্– আল্লাহ্‌ও ওয়াস্তে সবর :

জাহেদ, এবাদতগুজার ও পরহেজগার বান্দাদের সবরের প্রথম ধাপ হচ্ছে এই সবর লিল্লাহ্ বা আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে সবর।

আল্লাহ্ তা'আলা আমাদেরকে কিছু কিছু কাজ করার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন। সেগুলোকে বলা হয় 'আমর'। আবার কিছু কিছু কাজ না করার জন্য নিষেধ করেছেন। সেগুলোকে বলা হয় 'নাহী'। ফরজ, ওয়াজিব, সুন্নাত, মান্তাহাব ও মুবাহ্‌গুলোকে শরীয়ত হালাল করে দিয়েছে। এবং এগুলোর উপর অটল থাকার জন্য নির্দেশ দিয়েছে। পক্ষান্তরে যেসব বিষয়ে শরীয়ত নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে সেগুলো থেকে নিজেকে দূরে রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বৈধ পথে চলা এবং হারাম থেকে বাঁচা মানুষের পক্ষে কখনো দুরূহও হয়। মানুষ কখনো হালালের পথে চলতে গিয়ে আরাম, আয়েশ, ভোগ-বিলাস ও ব্যক্তিগত সুযোগ-

সুবিধা পরিহার করে আবার কখনো হারাম থেকে বাঁচতে গিয়ে নিজেদের সমূহ সুবিধা বিসর্জনও দেয়।

হালালভাবে চলতে গিয়ে, হারাম থেকে বাঁচতে গিয়ে, হালাল-হারাম পরখ করতে গিয়ে এবং আমর ও নাহী অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করতে গিয়ে মানুষের যে কষ্ট ও দুঃখ অনুভব হয়, সেগুলোকে হেসে উড়িয়ে দেওয়াকেই 'সবর লিল্লাহ্' বা আল্লাহ্র ওয়াস্তে সবর বলা হয়।

ভাবনার বিষয় :

সবর লিল্লাহ্র উপরোক্ত ব্যাখ্যার প্রেক্ষিতে আমাদের দেখতে হবে যে, আমরা কি এই সবরের স্তরটি নিজেদের মাঝে কোনভাবেও বাস্তব রূপ দিতে পেরেছি, যা পরহেজগারদেরই সবর? আমরা তো স্বাভাবিকভাবেই এর প্রাথমিক সীমারেখা থেকেই বাদ পড়ে যাই। আমরা হালালকে পছন্দ করি। কিন্তু তাও সেই পর্যন্তই, যদি হালাল পথে আমাদের কোন কষ্ট ও অসুবিধা না হয়। আমরা বড়ই বেপরোয়া, সাহসী আর ইসলামের মুবাল্লিগ! ইসলামে আমল করি। ইসলামের উপর অটল থাকি। আমরা বড়ই মুত্তাকী ও পরহেজগার। আমরা জাহেদ। নিজেদের দীনদারীর ঢাক-দামামা পিটাই। কিন্তু সেই পর্যন্ত, যদি হালাল পথে এবং নিজেদের স্বার্থে কোন বাধা না আসে। পক্ষান্তরে যেই আমাদের দীনদারি ও স্বার্থে কোনরূপ বাধা এসেছে, আমাদের দীনদারি অবহেলায় পড়ে রয়েছে, স্বার্থকেই বক্ষে জড়িয়ে নিয়েছি। দীনকে এড়িয়ে চলেছি। অথচ এই অবস্থাটি আসে পরীক্ষা আর কুরবানীর রূপ নিয়ে। যাতে করে সাব্যস্ত হয়ে যায়, কে দীনের পথে অটল রয়েছে আর কে তার স্বার্থকে বড় করে দেখেছে।

সবর আলাল্লাহ্ বা আল্লাহ্র উপর সবর :

জাহেদগণের সবরের দ্বিতীয় স্তর হচ্ছে 'সবর আলাল্লাহ্' বা আল্লাহ্র উপর সবর। আল্লাহ্র পক্ষ থেকে অদৃশ্য হিসাবে যা লিপিবদ্ধ হয়েছে তাতে খুশি থাকাকেই 'সবর আলাল্লাহ্' বলা হয়। কি সুস্থতায়, কি অসুস্থতায়, কি ভরা পেটে, কি খালি পেটে, কি আনন্দে, কি দুঃখে, কি সন্তানে, কি সন্তান হরণে, কি দুনিয়াপ্রাপ্তিতে, কি দুনিয়া হারানোতে, কি সম্মানে, কি অপমানে, মোটকথা যা কিছুই আল্লাহ্র পক্ষ থেকে অর্জিত হয়, তার উপর খুশি থাকা, সবর করা, কষ্টে আপত্তি না করা, খুশি ও আনন্দে গর্ব ও অহংকার না করা, বরং সর্বাবস্থায় আল্লাহ্র শুকরিয়া আদায় করা হচ্ছে 'সবর আলাল্লাহ্'।

নিজেদের দিকে দৃষ্টি দিলেই বুঝে আসে যে, আমরা সেই বাণিজ্যেরই বণিজার নই। আমরা এমন যে, যদি খেতে-পরতে পাই, আনন্দে থাকি, সুস্থ থাকি, সহায়-সম্পদ, ইজ্জত-সম্মান, আরাম-আয়েশ তথা আমরা যা কিছু চাই সেগুলো পেতে থাকি, তখন আল্লাহ্র শুকরিয়া আদায় করি। বরং সেই শুকরিয়াও কমই করি। কেননা, বেশি বেশি নেয়ামত পাওয়ার ফলে আমাদের মাঝে অহংকার ও গৌরব সৃষ্টি হয়। পক্ষান্তরে ধন-দৌলত, আরাম-আয়েশ, স্বাস্থ্য ও সুস্থতার কোন কিছু যখন আমরা হারিয়ে ফেলি, তখন সাথে সাথে আপত্তি তুলি। আমাদের প্রতিপালক তো কেবল সেই পর্যন্তই ভাল, যেই পর্যন্ত তিনি আমাদেরকে আমাদের চাহিদা অনুযায়ী সবকিছু দান করেন। এতে করে আমরা যেন আল্লাহ্র উপর নিজেদের চাহিদা চাপিয়ে দিতে চাই আর চাই তাঁকেই যেন আমাদের ইচ্ছার অধীন করতে।

একটি ঘটনা :

সবর আলাল্লাহ্ নিয়ে জনৈক বুজর্গ ব্যক্তির একটি ঘটনা শুনুন। বুজর্গটি ব্যবসায় করতেন। একদিন খবর এল যে, মালমাত্তা সহ তাঁর জাহাজটি সাগরে ডুবে গেছে। এতে করে তাঁর লাখ লাখ টাকা ক্ষতি হয়েছে। খবরটি শোনার কিছুক্ষণ পর তিনি বললেন, 'আল্হামদু লিল্লাহ্'। আবার কিছুদিন পর খবর এল, পূর্বের খবরটি মিথ্যা ছিল। বাণিজ্যের মালমাত্তা বিক্রি হয়েছে। লাখ লাখ টাকা লাভ হয়েছে। এ খবরটি শুনে তিনি কিছুক্ষণ পর 'আল্ হামদু লিল্লাহ্' বললেন।

কেউ তাঁকে জিজ্ঞাসা করল, 'হুজুর! এ কী ধরনের ব্যাপার! আপনি যখন শুনেছিলেন, জাহাজ ডুবে গেছে, লাখ লাখ টাকার ক্ষয়-ক্ষতি হয়েছে, তখনও 'আল্ হামদু লিল্লাহ্' বলেছিলেন, আবার যখন মালপত্র বিক্রি হওয়ার খবর শুনলেন, লাখ লাখ টাকা লাভ হওয়ার খবর এল, তখনও বললেন 'আল্ হামদু লিল্লাহ্'!' তিনি জবাবে বললেন, 'জাহাজটি ডুবে যাওয়ার খবরটি যখন এসেছিল, তখন আমি আমার অন্তরের দিকে খেয়াল করেছিলাম, মালপত্র হারিয়ে যাওয়ার ফলে অন্তর আহত হয়েছে কি না! যে অন্তর আমার প্রতিপালকের দিকে নিবিষ্ট ছিল, সেদিক বাদ দিয়ে সে অন্য দিকে সরে গেল কি না? সুতরাং, আমি যখন আমার অন্তরকে লাখ লাখ টাকার ক্ষতির সংবাদ শুনেও ক্ষতির কথা ভুলে গিয়ে আপন রবের দিকে নিবিষ্ট দেখতে পেলাম, তখন নিজের অন্তরকে সেই অবস্থায় দেখে আল্লাহ্র শুকরিয়া আদায় করেছিলাম। পরে যখন জাহাজ অক্ষত থাকার এবং লাখ লাখ টাকা লাভ হওয়ার খবর এল, তখন আমি আবারো আমার অন্তরের প্রতি দৃষ্টি দিলাম, লাভের কথায় সে

আনন্দিত হয়েছে কি না? দেখলাম, ক্ষতির খবরে সে যেমনরূপ নির্বিকার ছিল, লাভের বেলাতেও তার আকৃষ্টির কোন লক্ষণ নাই। সে কেবল আল্লাহ্‌র ধ্যানেই মগ্ন আছে। আমি যখন আমার অন্তরের এই স্খটলতা লক্ষ্য করলাম, সাথে সাথে তার জন্য আল্লাহ্‌র দরবারে শুকরিয়া আদায় করলাম।'

এ ধরনের মহা মনিষীদের সম্বন্ধে আল্লামা ইকবাল রাহমাতুল্লাহি আলাইহ বলেছেন :

برتر از اندیشۂ سود و زیاں ہے زندگی
ہے کبھی جاں اور کبھی تسلیم جاں ہے زندگی

–লাভ কী সে ছার! ক্ষতিই বা কী?
উর্ধে উঠেই জীবন লভি!
প্রাণ পেয়েও জীবন বুঝি,
প্রাণ দিয়েও জীবন ভাবি!!

'প্রকৃত জীবন লাভের আসল দর্শন বুঝতে হলে মানুষকে লাভ আর ক্ষতির উর্ধে উঠতে হবে। এ কথা বুঝতে হবে যে, কেবল জীবিত থাকার নামই জীবন নয়। বাস্তবে জীবনের রূপ দুই ধরনের। প্রাণ ধারণ করাকে যেমনিভাবে জীবন বলা হয়, অনুরূপ মরণকেও জীবন বলা হয়। যারা চিরজীবন লাভ করতে জানেন, তাদের কাছে জীবন ও মরণ একই রকম বলে মনে হয়!'

সবর মাআল্লাহ্ বা আল্লাহ্‌র সাথে সবর :

জাহেদগণের সবরের তৃতীয় স্তরটির নাম হল 'সবর মাআল্লাহ্'। যদি স্বাভাবিক কোন অশান্তি বা শান্তি আসে, আর অবস্থাও থাকে অনুকূল, তাহলে সেটি হচ্ছে জাহেদগণের দ্বিতীয় স্তর 'সবর আলাল্লাহ', যা পূর্বে আলোচিত হয়েছে। কিন্তু মানব-জীবনে যদি এমন অবস্থা এসে সমুপস্থিত হয়, যে অবস্থায় দুঃখ, বেদনা, কষ্ট, ব্যথা সবকিছু মানুষের জীবনে এক আপদ রূপে আপতিত হয়, মানুষ অস্বাভাবিক মুসিবত ও বিপদের অতল গহ্বরে ডুবে যায় এবং ধারাবাহিক সেই মুসিবতের আঘাতে জর্জরিত হতে থাকে, মনে হয় যেন আল্লাহ্‌র ফয়সালা ও তকদীরের নির্মম খঞ্জর চলছে, মাথায় যেন করাত চালানো হচ্ছে, গুলিতে গুলিতে ঝাঁঝরা হতে চলেছে বক্ষ, সেই মুহূর্তেও আল্লাহ্‌র জন্য সবর করাকে 'সবর মাআল্লাহ্' বলা হয়।

জাহেদগণের সবরের এই সর্বশেষ স্তরটি কারা অর্জন করতে পারেন সে ব্যাপারে ধারণা করা যায় হযরত আলী কাররামাল্লাহু ওয়াজ্‌হাহুর এই ঘটনাটি দিয়ে। একদা এক সময়ে কোন দুশমনের তীর এসে বিদ্ধ হয় তাঁর দেহ মোবারকের কোন স্থানে। তীরের ফলা এতই গভীরে ঢুকে গিয়েছিল যে, সেটি বের করে নিতে হযরত আলীর পক্ষে বড়ই কষ্ট হচ্ছিল। তাঁর কষ্টের কথা ভেবে তীরটি বের করে নেওয়া হল না। সকলে বিবেচনা করলেন যে, তিনি যখন নামাজে দাঁড়াবেন, তখনই তীর বের করে নেওয়া হবে। অতএব, হযরত আলী যখন নামাজ পড়া আরম্ভ করে দিলেন, সেই সময়ে তীরটি বের করে নেওয়া হল। হযরত আলী কিঞ্চিৎ পরিমাণও কষ্ট অনুভব করলেন না। সাথে সাথে রক্তের ফোয়ারা প্রবাহিত হতে লাগল। অথচ তিনি যথারীতি নামাজেই রত ছিলেন। তীর বের করে আনা হল, তবু তাঁর কোন ধরনের কষ্ট অনুভূত হয় নি। কারণ, আল্লাহ্‌র দরবারে হাজিরীর পূর্ণ একাগ্রতা! বেদনা ও কষ্টের এহেন চরমত্বে নির্বিকার থাকা এবং সবর করাই হল 'সবর মাআল্লাহ'।

আশেকগণের সবর (সবর আনিল্লাহ্) :

আল্লাহ্‌র নৈকট্য প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত হয়েও বিরহ-বেদনার সময়কালে সবর করা আশেকগণেরই সবর। একে বলে 'সবর আনিল্লাহ্' বা আল্লাহ্‌র পক্ষে সবর।

মর্দে মুমিন সর্বদা মওলার সাথে সাক্ষাতের, নৈকট্যের ও মিলনের আশা করে থাকে। আর আশা করে তাঁকে উন্মুক্তভাবে পাওয়ার। কিন্তু সেই জলওয়া সে তখনই অর্জন করে যখন তার প্রাণবায়ু উড়ে যায়। সমস্ত পর্দা ভেদ করে সেই প্রাণকে আল্লাহ্‌র দরবারে হাজির করে দেওয়া হয়। নৈকট্য ও মিলনের এই শুভক্ষণ যতক্ষণ পর্যন্ত না আসে, সেই বঞ্চনার মুহূর্তগুলোতেও সবর করা, শোকর করা এবং নিজের এশক ও মহব্বতে বিভোর থাকা হল 'সবর আনিল্লাহ্'।

জাহেদগণের সবর ছিল তাঁরা আল্লাহ্‌র আদেশ-নিষেধ মেনে চলবেন। দুঃখ, কষ্ট, মুসিবত ও বেদনার শেষ অবস্থায়ও আল্লাহ্‌র শোকর করবেন, সবর করে যাবেন। কিন্তু আশেকগণের সবর হল প্রকৃত বন্ধুর মিলন থেকে বঞ্চিত হওন ও বিরহ-বিচ্ছেদকালে ধৈর্য্য ধারণ করবেন। আশেকগণের সবরের এই অবস্থা জাহেদগণের সবরের অবস্থার চাইতেও অধিকতর কষ্টদায়ক। কেননা, আশেক সব কিছুই সহ্য করে নেয়। তাদের জন্য দুঃখ, কষ্ট, আনন্দ, বেদনা সবই সমান। আদেশ-নিষেধে আমল করা না করা তাদের কাছে কোন গুরুত্বই রাখে

না। তারা সব কিছুই সহ্য করতে পারে। কিন্তু কোন বিষয় যদি তারা মেনে নিতে না পারত, তাহলে তাদের জন্য তা হত বন্ধুর সাথে মিলনে বঞ্চনা। বিরহ-বিচ্ছেদের মুহূর্তটি আশেকদের জন্য ভীষণ কষ্টকরই হয়।

দুঃসাধ্য সবর :

বর্ণিত আছে, জনৈক ব্যক্তি এলেন হযরত শিবলী রাহমাতুল্লাহি আলাইহর দরবারে। জিজ্ঞাসা করলেন, কোন্ ধরনের সবর ধৈর্য্যধারণকারীদের পক্ষে সর্বাধিক দুঃসাধ্য ও কষ্টকর? হযরত শায়খ শিবলী বললেন, 'তা হল সবর ফিল্লাহ্' বা আল্লাহ্ ব্যতীত সব কিছু থেকে দূরে থাকা।' লোকটি বললেন, 'নয়'। তিনি বললেন, 'সবর মাআল্লাহ্।' লোকটি বললেন, 'নয়'। তিনি বললেন, 'সবর লিল্লাহ্'। লোকটি বললেন, 'জী না, এও নয়।' লোকটির এই কথায় শায়খ শিবলী বললেন, 'তাহলে তুমিই বলে দাও, সেটি কোন্ সবর?' লোকটি বললেন, 'সবর আনিল্লাহ্'। বর্ণনাকারী বলছেন, এ কথা শোনা মাত্র শায়খ শিবলী এমন জোরে চিৎকার দিয়ে উঠলেন যে, মনে হচ্ছিল যেন তাঁর প্রাণই বের হয়ে যাবে![১]

প্রকৃত প্রস্তাবে, মজ্জিলগুলোর কাঠিন্য বিবেচনায় আশেকদের সবরের তুলনায় এবাদতগুজারদের সবর কোন গুরুত্বই রাখে না।

হযরত মাওলানা শাউছ আলী শাহ্ পানিপতী একটি ঘটনা বর্ণনা করেন। এক ব্যক্তি কোন আশেক দরবেশের দরবারে যাওয়া-আসা করতেন। তাঁর সাহচর্যে থাকতেন। নিজের কোন হাজত বা মুরাদ পেশ করতেন না। একদিন সেই আশেক দরবেশটি জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি দেখছি প্রতিদিনই আস, আর চলে যাও। অথচ সকলে কোন না কোন হাজত ও মুরাদের কথা বলে। দোয়া চায়। কিন্তু তোমাকে দেখলাম কিছুই বললে না। বল তো দেখি তুমি আস কেন? লোকটি বললেন, 'হুজুর! আমি তো এশকের জ্যোতিঃ নিতে আসি। আমার বাসনা তো কেবল একটাই, আমার গায়েও এশকের আগুন ধরে যাক! এ কথা শুনে দরবেশটি নীরব হয়ে রইলেন।

কিছুদিন পর তিনি আবারো একই কথা জিজ্ঞাসা করলেন। লোকটি বললেন, আমার তো একটিই চাহিদা। বুজর্গটি এবারও চুপ রইলেন। অনুরূপ কিছুদিন পর তিনি আবারও জিজ্ঞাসা করলে লোকটি তাঁর চাহিদার কথা ব্যক্ত করলেন।

[১]. আওয়ারিফুল মাআরিফ লিশ শায়খ শেহাবুদ্দীন সোহ্রাওয়ার্দী।

বললেন, আমার এশকের জ্যোতিঃর দরকার। আমি আর কিছুই চাই না। এবার বুজর্গটি বললেন, তুমি আগামী কাল বনে অমুক জায়গায় যাবে। দেখবে এক লোক পড়ে আছে। পরের দিন এসে আমাকে তার অবস্থার কথা জানাবে।

পরের দিন লোকটি সেই বনে গেলেন। দেখলেন, সেখানে একটি লোক পড়ে আছে। লোকটির মস্তক, বাহু, পা ধড় থেকে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় তড়পাচ্ছে। আর বেরুচ্ছে রক্তের ফোয়ারা। এ অবস্থা দেখে লোকটি ওয়াপেস বুজর্গটির নিকট চলে এলেন। লোকজন যখন চলে গেল, তিনি বুজর্গটিকে বললেন, আমি দেখতে পেলাম যে, লোকটির সব কটি অংগই ধড় থেকে আলাদা। আর তড়পাচ্ছে। এবার বুজর্গটি বললেন, এশকের অবস্থা এমনই হয়! যদি কবুল করতে পার, তবেই তোমাকে এশকের জ্যোতিঃ দেওয়া যাবে!

যেসব লোক এশক ও মহব্বতের দাবী করে না, তাদের কাছে মাহবুব অন্যভাবে সম্মুখীন হন। পক্ষান্তরে তারা যখন এশক ও মহব্বতের দাবী করে, তখন মাহবুবের ধরন পাল্টে যায়। তিনি দুইভাবেই পরীক্ষা করেন। এশক ও মহব্বত-সম্পন্ন ব্যক্তিদের সম্পর্কে পবিত্র কুরআনের বাণী :

وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ

–অবশ্যই আমি তোমাদেরকে কিছু ভয়, কিছু ক্ষিধা, কিছু সম্পদস্বল্পতা এবং জীবন ও ফলাদির ঘাটতি দিয়ে পরীক্ষা করব।[১]

যারা এশক ও মহব্বতের দাবী করে, তাদেরকে পরীক্ষার অগ্নিকুণ্ডে তুলে দেওয়া হয়। তাদেরকে ভয় ও ক্ষিধা দিয়ে পরীক্ষা করা হয়। পরীক্ষা করা হয় জীবনসহ অপরাপর নেয়ামতে ঘাটতি দিয়েও। যাতে করে এ কথা প্রতীয়মান হয়ে যায় যে, এসব লোক তাদের এশক ও মহব্বতের দাবীতে কতটুকু সত্য।

ধৈর্য্য ধারণকারীদের প্রতিদান :

আল্লাহ্র আদেশ-নিষেধে আমল করতে গিয়ে বিভিন্ন দুঃখ-কষ্ট সহ্য করা, যে-কোন ধরনের দুঃখ-দুর্দশায় ধৈর্য্যধারণ করা, বড় বড় বিপদ-আপদে সহনশীল থাকা, পরম প্রিয়তমের মিলনে বঞ্চিত হওনে এবং বিরহ-বেচ্ছেদে স্থির থাকা,

[১]. সূরাঃ বাকারা, ২: ১৫৫।

মোটকথা ধৈর্য্যের সব কটি স্তরই আল্লাহ্ তা'আলার রেজামন্দি ও সন্তুষ্টির উপলক্ষ। সুতরাং, ধৈর্য্যধারণকারীদের প্রতিদান সম্পর্কে বর্ণনা করতে গিয়ে পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে :

إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلصَّٰبِرِينَ

–নিশ্চয় আল্লাহ্ ধৈর্য্যধারণকারীদের সাথেই আছেন।[১]

অতএব, যারা ধৈর্য্যধারণ করে, তারা আল্লাহ্ তা'আলার সঙ্গ সাত করে থাকে। তাছাড়া আরো বলা হয়েছে :

أُوْلَٰٓئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَٰتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ

–এমনসব লোকদের উপর আল্লাহ্র পক্ষ থেকে রয়েছে বিশেষ দয়া ও অনুগ্রহ।[২]

ধৈর্য্যধারণকারীদের উপর আল্লাহ্ তা'আলার অনুগ্রহ বর্ষিত হতে থাকে। যেসব ব্যক্তি আল্লাহ্র রাস্তায় ক্ষিধার যন্ত্রণা বরদাশ্ত করে, পরিপূর্ণরূপে ধৈর্যের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করে, জীবন ও সম্পদের আশঙ্কাজনিত কঠিন কঠিন মঞ্জিলসমূহ অতিক্রম করে, জীবনের সব সাধ বিলীন করে দেয়, আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জনের দৃঢ় প্রত্যয় চোখের সামনে রাখে, এমনসব লোক সেই যোগ্যতা অর্জন করে যে, তাদের উপর অনুগ্রহের বর্ষণ হতে থাকে, তারা অভীষ্ঠে পৌঁছে যায়।

০২. তাওয়াক্কুল :

মানুষ সবরের স্তর অতিক্রম করার পর তাওয়াক্কুলের মকামে এসে প্রবেশ করে। শায়খ আবু আলী রাহমাতুল্লাহি আলাইহ্ তাওয়াক্কুলের তিনটি স্তরের কথা উল্লেখ করেছেন।[৩]

১. প্রথম স্তর : প্রাপ্তিতে শুকরিয়া, অপ্রাপ্তিতে ধৈর্য্যধারণ।
২. দ্বিতীয় স্তর : প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তি সমান হওয়া।
৩. তৃতীয় স্তর : অপ্রাপ্তিতেও শোকর করাকে পছন্দ করা।

[১]. সূরা: বাকারা, ২: ১৫৩।
[২]. সূরা: বাকারা, ২: ১৫৭।
[৩]. আল গুনিয়া লিতালিবী তরীকিল হক্কি লি শায়খ আবদিল কাদের জীলানী, ২: ১৯০।

প্রথম স্তর : প্রাপ্তিতে শুকরিয়া, অপ্রাপ্তিতে ধৈর্য্যধারণ:

ধৈর্য্যের স্তরকে অতিক্রম করার পর তাওয়াক্কুলের যে স্তর শুরু হয়ে যায়, তা হল إِذَا أُعْطِيَ شَكَرَ وَ إِذَا مُنِعَ صَبَرَ 'যখন প্রাপ্তি ঘটে, শুকরিয়া আদায় করে আর যখন অপ্রাপ্তি ঘটে, ধৈর্য্য ধারণ করে'। অর্থাৎ বান্দাটি যখন আল্লাহ্র নেয়ামত প্রাপ্ত হয়, তখন শুকরিয়া আদায় করে। আর যখন তার থেকে নেয়ামত ছিনিয়ে নেওয়া হয়, তখন সে ধৈর্য্যধারণ করে।

দ্বিতীয় স্তর : প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তি সমান হওয়া :

তাওয়াক্কুলের দ্বিতীয় স্তর হল, বান্দাটি এমন হয়ে যাবে যে, اَلْمَنْعُ وَالْعَطَاءُ عِنْدَهُ وَاحِدٌ 'প্রাপ্তি ও অপ্রাপ্তি তার কাছে উভয় সমান'। তাওয়াক্কুলের এই স্তরে প্রাপ্তি ও অপ্রাপ্তি উভয়টিই বান্দাটির নিকট একই গুরুত্বের হয়ে যায়।

প্রথম স্তরটিতে প্রাপ্তিতে ও অপ্রাপ্তিতে পার্থক্য ছিল। প্রাপ্তিতে বান্দা করেছিল আল্লাহ্র শুকরিয়া আদায়, কিন্তু অপ্রাপ্তিতে করেছিল ধৈর্য্যধারণ। পক্ষান্তরে তাওয়াক্কুলের এই দ্বিতীয় স্তরটিতে বান্দা উভয় অবস্থাতেই শুকরিয়া আদায় করছে। নেয়ামতের প্রাপ্তিতেও শুকরিয়া আদায় করছে, কোন নেয়ামত হাতছাড়া হয়ে যাওয়াতেও শুকরিয়া আদায় করছে।

তৃতীয় স্তর : অপ্রাপ্তিতেও শোকর করাকে পছন্দ করা :

তাওয়াক্কুলের তৃতীয় স্তর হল বান্দাটি اَلْمَنْعُ مَعَ الشُّكْرِ أَحَبُّ إِلَيْهِ 'অপ্রাপ্তিতেও শুকরিয়া আদায় করাকে পছন্দ করে'।

কোন নেয়ামত যখন হাতছাড়া হয়ে যায়, বান্দাটি ভাবে যে, প্রিয়জন এই নেয়ামতটি হাতছাড়া হওয়াতেই সন্তুষ্ট। এ কথা ভাবতেই সে আনন্দে উদ্বেলিত হয়। আর সেই নেয়ামতটি হাতছাড়া হয়ে যাওয়াতে তার মধ্যে এমন স্বাদ, আনন্দ ও পুলক শিহরণ সৃষ্টি হয়, যা কোন নেয়ামত লাভ করার ক্ষেত্রেও হয় না।

আল্লাহ্ স্বীয় বান্দাদেরকে পরীক্ষা করে থাকেন। কখনো তিনি বান্দাকে কোন নেয়ামত দিয়ে পরীক্ষা করেন, আবার কখনো নেয়ামত ছিনিয়ে নিয়ে পরীক্ষা করেন। দ্বিতীয় পদ্ধতিতে আল্লাহ্ তা'আলা খাস বন্দাদের পরীক্ষা করে থাকেন। বান্দা যখন ভাবে যে, আল্লাহ্ তাকে বড় ধরনের এক পরীক্ষার জন্য নির্বাচন করেছেন, তখন তার মাঝে যে স্বাদ, আনন্দ ও পুলক শিহরণ সৃষ্টি হয়,

তা তার কাছে সেই আনন্দ ও পুলক শিহরণের চইতেও অধিক মনে হয়, যা সে কোন নেয়ামত পাওয়ার ক্ষেত্রে অনুভব করে। এরই ভিত্তিতে নেয়ামত হাতছাড়া হওয়ার ক্ষেত্রে আল্লাহ্‌র শুকরিয়া আদায় করা বান্দার কাছে পছন্দনীয় হয়ে যায়।

প্রত্যেক আউলিয়া ও প্রত্যেক আল্লাহ্‌ওয়ালা স্ব স্ব অবস্থানের নিরিখে তাওয়াক্কুলের কোন না কোন স্তরেই অবস্থান করেন। যেমন, তাসাওউফের কিতাবাদিতে দুইজন বুজর্গ ব্যক্তির সাক্ষাতের ঘটনা বিবৃত হয়েছে। হযরত শায়খ বায়েজীদ বোস্তামী বলছেন, বলখ রাজ্যের এক যুবক আমাকে হতবাক করে দিলেন। কী হল! যুবকটি হজ্বের সফরকালে আমার কাছেও এলেন। তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'যুহদ' কোন্ জিনিস? আমি বললাম, 'যা কিছুই আমরা পাই, খেয়ে ফেলি। যদি না পেতাম, ধৈর্য্যধারণ করতাম।' যুবকটি বললেন, 'আমাদের বলখের কুকুররাও তো তা-ই করে!' এ কথা শুনে আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'তবে, আপনার দৃষ্টিতে যুহদ কী?' তিনি বললেন, 'আমরা যখন কিছু না পাই, তখন শুকরিয়া করি। আর যদি কিছু পেয়ে যাই, তাহলে অন্যদের জন্য তা ব্যয় করে দিই!' তাঁর কথা শুনে আমি হতবাক হয়ে যাই![১]

একটি ঘটনা :

তাওয়াক্কুলের যে অবস্থায় হাতছাড়া হয়ে যাওয়াতে অধিক স্বাদ ও আনন্দ পাওয়া যায়, সেই অবস্থা সম্পর্কে একটি কাহিনী বলা হচ্ছে। একবার মজনুন জানতে পারল যে, লায়লীর খুব অসুখ হয়েছে। ডাক্তারেরা বলেছেন, নতুন সূত্রে তাকে স্বাস্থ্য ফিরে পেতে হলে তাজা রক্তের ব্যবস্থা করতে হবে। পাগলপারা মজনুন দ্রুত চলে গেছে লায়লীর কাছে। সে প্রতিদিন নিজের তাজা রক্ত দিতে থাকে লায়লীকে সুস্থ করে তোলার জন্য। এক সময়ে লায়লী যখন সুস্থ হয়ে উঠল, শুকরিয়া স্বরূপ দান-দক্ষিণা করার সিদ্ধান্ত নিল। কিছু আহারের ব্যবস্থা করে এলান করে দিল, এই শহরে যত গরীব, মিসকীন ও দরবেশ রয়েছে সকলের দাওয়াত। অতএব, শহরের ফকীর, মিসকীন ও দরবেশরা এল। তাদের মধ্যে সেই মজনুনও ছিল, যে জীবনবাজি রেখে লায়লীকে প্রাণে বাঁচানোর জন্য নিজের গায়ের রক্ত দিয়েছিল। মজনুন ফকিরের চাড়ি হাতে লাইনে দাঁড়িয়ে কখন তার পালা আসে অপেক্ষা করছিল। লায়লী নিজ হাতে সবাইকে নির্বিশেষে এগিয়ে দেওয়া চাড়িতে খাবার বিতরণ করছিল। যেই

[১]. আওয়ারিফুল মাআরিফ লিশ শায়খ শিহাবুদ্দীন সোহ্‌রাওয়ার্দী।

মজনুনের পালা এল, সেও খয়রাতের জন্য চাড়ি এগিয়ে দিল, লায়লী তার বাম হাতে চাড়িটি মাটিতে আছাড় মেরে ভেঙে দিল। তারপর অন্যান্য ফকিরদের খাবার বিতরণে রত হয়ে গেল। মজনুন চাড়ির ভাঙা টুকরোগুলো উঠিয়ে নিল। আর পাগলপারা হয়ে নাচতে আরম্ভ করে দিল। সবাই তাকে বলল, তুমি একটা আস্ত পাগলই তো! ভরা মাজমায় লায়লী তোমাকে অপমানিত করল, আর তুমি দেখছি সেটিকে সম্মান মনে করে ভারী মজা করে নাচছ? মজনুন তখন বলল, হে নির্বোধেরা! পাগল আমি না, তোমরাই! লায়লীর আমার সাথে বিশেষ সম্পর্ক। তবেই তো সে আমার চাড়ি ভেঙেছে। অন্য কারো চাড়ি ভাঙল না কেন? ভাঙার জন্য সে যে একমাত্র আমার চাড়িটাকেই বেছে নিয়েছে সেটিই তো লায়লীর কাছে আমার আর তোমাদের সম্পর্কের পার্থক্যের কথাই প্রমাণ করে।

এ তো আপেক্ষিক প্রেমেরই অবস্থা। এই আপেক্ষিক প্রেমেও যদি প্রিয়জনের কিছু হাতছাড়া হয়, তখন তার বড়ই আনন্দ ও পুলক শিহরণ অনুভূত হয়। এবার ভেবে দেখুন, ওসব লোকের আনন্দ, পুলক ও প্রেম শিহরণের অবস্থা কেমন হবে, যারা অকৃত্রিম ও পরম প্রেমের পথে পা বাড়িয়েছে! তাদের পরম প্রিয়জন যদি তাদের কোন জিনিস হাতছাড়া করে দেন, তখন তারা কি সেটিকে তাদের পরম বন্ধুর বিশেষ দৃষ্টিদান বলে মনে করে আনন্দিত ও পুলকিত হবে না! তাদের দৃষ্টি হাতছাড়া হয়ে যাওয়া নেয়ামতটির উপর নিবদ্ধ থাকে না, বরং নিবদ্ধ থাকে তাদের প্রিয়জনের রেজামন্দি ও সন্তুষ্টিতেই!

তাওয়াক্কুলকারীদের প্রতিদান :

মানুষ সবরের স্তর ও ধাপগুলো অতিক্রম করার পর তাওয়াক্কুলের স্তরে এসে পৌঁছায়। সবরের ফলে বান্দার মধ্যে আল্লাহ্‌র সঙ্গ-লাভ অর্জিত হয়ে যায়। আল্লাহ্‌র বিশেষ অনুগ্রহ, দয়া ও বরকতও তার উপর পূর্বেই বর্ষিত হয়ে থাকে। কিন্তু তাওয়াক্কুলের ফলে তাকে বহুলপ্রতীক্ষিত আল্লাহ্‌র ভালবাসার সুসংবাদ শুনানো হয়। যেমন, আল্লাহ্ তা'আলা এরশাদ করছেন :

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

–নিশ্চয় আল্লাহ্ তাওয়াক্কুলকারীদের ভালবাসেন।[১]

[১]. সূরা: আলে ইমরান, ৩: ১৫৯।

তাওয়াক্কুলকারীদের জন্য সুসংবাদ যে, হে তাওয়াক্কুলকারীরা! আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে তোমরা তো সবরের নেয়ামতগুলো পূর্বেই অর্জন করেছ। এখন তাওয়াক্কুলের কারণে আমি তোমাদেরকে আমার নিজেরই প্রিয় বান্দা বানিয়ে নিলাম। বলা যায়, তাওয়াক্কুলকারীদেরকে আল্লাহ্‌র ভালবাসা দিয়ে ধন্য করা হয়।

রেযা :

সবরের স্তর ও ধাপগুলো অতিক্রম করার পর মানুষ যখন তাওয়াক্কুলের স্তরও অতিক্রম করে ফেলে, সেই থেকে 'রেযা'র স্তরটি আরম্ভ হয়। আল্লাহ্‌র অনেক অলী সবরের কঠিন স্তরগুলোই অতিক্রম করতে পারেন নি। কোন কোন ভাগ্যবান এমনও রয়েছেন, যাঁরা সবরের স্তরগুলো পার হয়েছেন, কিন্তু তাওয়াক্কুলের স্তরে গিয়ে রুদ্ধ হয়ে গেছেন। তবে অনেক স্বল্পই এমন রয়েছেন, যাঁরা সবরের পর তাওয়াক্কুলের স্তরগুলোও পার হয়ে এর পর 'রেযা'র স্তরে গিয়ে পৌঁছে গেছেন।

তাওয়াক্কুলের ন্যায় 'রেযা'র স্তরেও তিনটি ধাপ রয়েছে। এই ধাপগুলোর কথা ব্যক্ত করেছেন হযরত শায়খ আবদুল কাদের জীলানী রাহ্‌মাতুল্লাহি আলাইহ্‌ স্বীয় কিতাব 'গুনিয়াতুত তালেবীনে'। বরাত দিয়েছেন হযরত শায়খ যুন্নুন মিসরী রাহ্‌মাতুল্লাহি আলাইহ্‌র।[১]

১. তরকুল এখ্‌তিয়ার কবলাল কযা (আল্লাহ্‌র হুকুম আসার পূর্বে নিজের এক্তিয়ারকে পরিহার করা) :
২. সুক্কারুল কলব বিমর্‌রিল কযা (আল্লাহ্‌র হুকুম চলাকালে পুলকিত হৃদয় থাকা) :
৩. ফুকদানুল মিরারাতি বাদাল কযা (আল্লাহ্‌র হুকুমের পর চলমানতা বিদ্যমান না থাকা) :

তরকুল এখ্‌তিয়ার কবলাল কযা (আল্লাহ্‌র হুকুম আসার পূর্বে নিজের এক্তিয়ারকে পরিহার করা) :

রেযার স্তরের প্রথম ধাপ হচ্ছে 'তরকুল এখ্‌তিয়ার কবলাল কযা'। অর্থাৎ এই ধাপে আল্লাহ্‌র হুকুমের ছোরা যখন চলতে থাকে, সেই মুহূর্তে বাঁচার এক্তিয়ার থাকা সত্ত্বেও বান্দা নিজেকে আল্লাহ্‌র সেই হুকুম থেকে বাঁচাবে না।

১. আল গুনিয়া লি তালিবী তরীকিল হক্ব, ২: ১৯৮।

এমন যদি হয় যে, মানুষ তার এক্তিয়ার হারিয়ে ফেলে, আর জবাই হয়ে যায়। এই মকামকে রেযা বলা যায় না। রেযা হল মানুষ নিজেকে বাঁচানোর এক্তিয়ার রাখে, নিজেকে বাঁচানোর ক্ষমতাও রাখে। কিন্তু তা সত্ত্বেও আল্লাহ্‌র হুকুমের ছোরাকে সর্বান্তঃকরণে মেনে নেয়।

সুক্কারুল কলব বিমর্‌রিল কযা (আল্লাহ্‌র হুকুম চলাকালে পুলকিত হৃদয় থাকা) :

রেযার প্রথম ধাপ ছিল আল্লাহ্‌র হুকুমের ছোরা চলার পূর্বে এক্তিয়ার থাকা সত্ত্বেও বান্দা নিজেকে বাঁচাবে না। কিন্তু যেই আল্লাহ্‌র হুকুমের ছোরা চলছে, ভাগ্যলিপি তার ফয়সালা শোনাচ্ছে, বান্দার দেহকে টুকরো টুকরো করা হচ্ছে, ভাগ্য তাকে পর্বত-সম দুঃখ, কষ্ট, বেদনা, বিষাদের নিচে দাবিয়ে দিচ্ছে আর বিভিন্ন ধরনের দুর্ভাবনা ও দুরবস্থার শিকার হচ্ছে, এত কিছু দুঃখ-দুর্দশা সত্ত্বেও বান্দা তার হৃদয়ে পুলক ও স্বাদ অনুভব করছে– এটিই হল রেযার দ্বিতীয় ধাপ।

ফুকদানুল মিরারাতি বাদাল কযা (আল্লাহ্‌র হুকুমের পর চলমানতা বিদ্যমান না থাকা) :

রেযার স্তরের তৃতীয় ধাপ হল, আল্লাহ্‌র হুকুমের ছোরা চলা যখন শেষ হয়ে যায়, সবকিছু সার্বস্বান্ত হয়ে যায়, বান্দা তার শেষ পরিণতিতে পৌঁছে যায়, কিছুই অবশিষ্ট থাকে না, এর পরও কখানো ভুলেও বান্দার মুখ দিয়ে আপত্তি তুলবে না। কখনো এই কথা ভাববে না যে, তার পরিণতি বাহ্যতঃ খুবই অগ্রহণযোগ্য হয়েছে, তার উপর জুলুম করা হয়েছে, তাকে কত কত দুঃখ, কষ্ট ও যাতনা বরদাশ্‌ত করতে হয়েছিল।

মকামে রেযা ঃ একটি দুষ্কর ধাপ :

মকামে রেযা পর্যন্ত পৌঁছানো এবং অটল থাকা এমন এক কঠিন ও দুষ্কর ধাপ যে, যে স্তরে এসে অনেক বড় বড় অলীদের কদম পর্যন্ত ফসকে যায়। হযরত শাহ্‌ গাউস গাওয়ালিয়ারী রাহমাতুল্লাহি আলাইহ্‌, যিনি ছিলেন অন্যতম এক কামেল অলী আর মকামে রেযায় উত্তীর্ণ, তাঁর সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, গাওয়ালিয়ারের গভর্নর তাকে বলেছিল, 'আপনি সিরিয়া পর্যন্ত গাওয়ালিয়ারের সীমানার বাইরে কোথাও চলে যান'। তিনি যখন তাঁর পরিবার-পরিজন ও মুরিদদের সাথে নিয়ে গাওয়ালিয়ার থেকে বেরিয়ে পড়লেন, তখন হিন্দু লুটেরারা কোন বাধা নাই দেখে পেছন থেকে তাঁদের উপর হামলা চালাল।

লুটতরাজ করতে লাগল। হযরত শাহ্ মোহাম্মদ গাউস গাওয়ালিয়ারী রাহমাতুল্লাহি আলাইহ্‌র ঘোড়ার উপর তাঁর পেছনে তাঁর নয় বৎসর বয়সের নাতনীও ছিলেন। তাঁর কানে ছিল স্বর্ণের বালি। ডাকাতরা লুট করতে করতে হযরতের ঘোড়ার কাছে এসে পড়ল। তাঁর নাতনীর কান থেকে স্বর্ণের বালিগুলো টেনে নেবার সময় শিশু নাতনীর কান ছিঁড়ে গেল। ব্যথায় শিশু নাতনী চিৎকার দিয়ে উঠলেন। ঠিক সেই মুহূর্তে শাহ্ গাওয়ালিয়ারীর পক্ষে মকামে রেযায় অটল থাকা দুষ্কর হয়ে পড়ল। অতএব, তিনি তাঁর নাঙ্গা তরবারি হাওয়ায় ছুঁড়তে থাকলেন। এতে ডাকাতদলের কর্তিত মস্তকগুলো মাটিতে লুটোপুটি খেল।

অনুরূপ আরেকটি ঘটনা ইমাম নিবহানী বর্ণনা করেছেন 'জামেয়ে কারামাতে আউলিয়া' গ্রন্থে। শায়খ আহমদ শরবিনী রাহমাতুল্লাহি আলাইহ্ ছিলেন অত্যন্ত বড় মাপের একজন আল্লাহ্‌র অলী। তিনি ছিলেন মকামে রেযায় উত্তীর্ণ। তাঁর ছিল একমাত্র একটি শিশু পুত্র। সেই শিশু পুত্রটি যখন মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়ছিলেন, তখন তাঁর স্ত্রী তার কাছে এসে কান্না জুড়ে দিলেন। আবেদন করলেন, আপনার তো আল্লাহ্‌র সাথে গভীর সম্পর্ক। আমার একমাত্র সন্তান আমার কলিজার টুকরা। আমার ভালবাসার একমাত্র কেন্দ্রবিন্দু। আমার কোল যদি খালি হয়ে যায়, আমি যে আর বাঁচব না! আপনি আমার সন্তানকে বাঁচিয়ে দেবার জন্য আপনার আল্লাহ্‌র কাছে ফরিয়াদ করুন! তিনি বললেন, আমি তো আমার আল্লাহ্‌র হুকুমের উপরই নির্ভর করে থাকি। তাঁর ইচ্ছা ও রেজামন্দির উপরই আমি সর্বদা রাজি থাকি। আমার আল্লাহ্ যদি আমার সন্তানের প্রাণ নিয়ে খুশি হন, আমিও তাতেই খুশি। স্ত্রী কেঁদে কেঁদে অনেক আকুতি-মিনতি করলেন। কিন্তু তাঁর হৃদয় আল্লাহ্‌র উপর অটল থাকল। ঠিক সেই মুহূর্তে প্রাণ হরণকারী ফেরেশতা শিশুটির প্রাণ নেবার জন্য হাজির হলেন। মলেকুল মওত জান কবজ করার জন্য যেই হাত বাড়ালেন, বাচ্চার উপর যেই সকরাত শুরু হয়ে গেল, তখন পিতৃস্নেহ উথলে উঠল। তাঁর কদম মকামে রেযা থেকে সরে গেল। সেই মুহূর্তেই তিনি চোখ তুলে উপরের দিকে দৃষ্টি দিলেন। বেলায়তের এতই শক্তি ছিল যে, আল্লাহ্‌র দরবারে ফরিয়াদের ভান নিয়ে দেখার বাকি, লওহে মাহফুজের লেখা পাল্টে গেল। তিনি মলেকুল মওতকে বললেন, (আরবি আছে)

'হে মলেকুল মওত! আপনি আপনার রবের কাছে ফিরে যান। কারণ, এই শিশুর মৃত্যুর হুকুম রহিত হয়ে গেছে!'[১]

[১]. জামেয়ে কারামাতে আউলিয়া, ১: ২৯৬।

হযরত ইমাম হোসাইন ও মকামে রেযা :

হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মতের এক অলীর রূহানী শক্তির এমন অবস্থা যে, তিনি যদি উপরের দিকে চোখ তুলে দেখেন, মহান রব তাঁর জন্য তকদীরকে পাল্টে দেন। মৃত্যুকে জীবন দিয়ে বদলিয়ে দেন। এদিকে হযরত ইমাম হোসানাইন রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু, যাঁর শান হচ্ছে লক্ষ-কোটি আল্লাহ্‌র অলীও যদি একত্রিত হন, তাঁর পাশটিও নাগাড় পাবেন না। ইমাম হোসাইন যদি দৃষ্টি তুলতেন, তাহলে আল্লাহ্‌ই জানেন কী ঘটে যেত! তিনি যদি ইচ্ছা করতেন, হোসাইনী কাফেলাকে জীবন হারাতে হত না, এজিদী বাহিনী ধ্বংস হয়ে যেত, কুফা ও বসরায় তাঁর নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হত! কিন্তু তা হত মকামে রেযার বিপরীতে!

দেখা যায় যে, প্রিয় নবীর উম্মতের বড় বড় আউলিয়াগণের কদমও মকামে রেযা থেকে ফসকে গেছে। কিন্তু রাসূল-দৌহিত্র, ফাতেমার হৃদয়-কন্দর হযরত হোসাইনের কদম মকামে রেযা থেকে এক দণ্ডও নড়ে নি। রৌদ্র-দীপ্ত সূর্যের প্রখর রোদের তাপে উত্তপ্ত কারবালার মরু-প্রান্তরে শহীদ হওয়ার কঠোর স্তরগুলোতেও তাঁর সাফল্য ও উত্তরণ পরিলক্ষিত হয়। তিনি 'মকামে রেযা'র তিন তিনটি ধাপেই পূর্ণ মাত্রায় সফল। মকামে রেযার প্রথম ধাপ ছিল উপলব্ধি করা সত্ত্বেও আল্লাহ্‌র হুকুমকে কবুল করে নেওয়া, এক্তিয়ার থাকা সত্ত্বেও নিজেকে বাঁচানোর চেষ্টা না করা। যথা, বিভিন্ন হাদিসাদি দ্বারা প্রতিপন্ন হয় যে, হযরত হোসাইনকে তাঁর অজান্তে শহীদ করে দেওয়া হয় নি![১]

হযরত ইমাম হোসাইন শিশুকাল থেকেই জানতেন যে, কারবালার ময়দানে তাঁকে শহীদ করা হবে। তাঁর তকদীরে এরূপই লেখা আছে! তিনি শাহাদাতের সময়, স্থান ও অবস্থা সম্পর্কেও তো সম্যক রূপেই জানতেন। তিনি যদি ইচ্ছা করতেন, এজিদের হাতে বাইয়াত হয়ে নিজের উপর থেকে আল্লাহ্‌র হুকুমকে টলিয়ে দিতে পারতেন। তিনি যদি ইচ্ছা করতেন, আল্লাহ্‌র দরবারে ফরিয়াদ করে আল্লাহ্‌র সেই হুকুম থেকে বেঁচে যাওয়ার কোন উপায় অবলম্বন করতে পারতেন। কিন্তু তিনি তা করেন নি। কেননা, তিনি ছিলেন আশেকদের অন্তর্ভুক্ত। জীবনের অনেক অনেক বৎসরই তিনি কাটিয়েছেন পরম বন্ধুর মিলনের অপেক্ষায়। তিনি তো শৈশবেই তাঁর নানাজান থেকে শুনেছিলেন যে, কারবালার ময়দানে রবের ফুল জালালের উন্মুক্ত প্রদর্শনী দেখানো হবে। এ কত বড় সবর যে, জীবনের পঞ্চাশ পঞ্চাশটি বৎসর তিনি বিরহ-বেদনার কঠোর ধাপ অতিক্রম করার মাধ্যমেই গুজরান করেছিলেন!

তিনি মাকামে রেযায় এমনভাবেই প্রতিষ্ঠিত ছিলেন যে, সবকিছু পুংখানুপুংখরূপে জানা সত্ত্বেও এজিদের হাতে বাইয়াত গ্রহণ করাকে কঠোরভাবে অস্বীকার

[১]. এসব হাদিসাদির আলোচনা পূর্বোক্ত পর্বগুলোতে করা হয়েছে।

করেছিলেন। এজিদের প্রতি আনুগত্যের আহ্বান পেয়েও তিনি তা কবুল করে নেন নি। তিনি বিনাদ্বিধায় কারবালা ময়দানের দিকে ছুটে চলেছিলেন। তিনি জানতেন, শাহাদাতের সুধার পেয়ালা তাঁর জন্য অপেক্ষা করে রয়েছে! তিনিও এগিয়ে গিয়ে শাহাদাতের পেয়ালায় মুখ বসিয়েছিলেন। আর অটলত্ব ও সংকল্পের পরম দৃঢ়তায় তিনি প্রকৃত ও পরম বন্ধুর দরবারে গিয়ে পৌঁছেছিলেন।

মকামে রেযার দ্বিতীয় ধাপ হল 'আল্লাহ্‌র হুকুম চলাকালে পুলকিত হৃদয় থাকা'। এই মকামে আল্লাহ্‌র হুকুমের ছোরা চলাকালে বান্দার মোটেও তিক্ততা অনুভব হবে না, বরং সে স্বাদ ও মিষ্টতা অনুভব করবে। মকামে রেযার এই দ্বিতীয় ধাপে হযরত ইমাম হোসাইনের এমন পূর্ণতা লক্ষ্য করা যায় যে, একটি বারও তাঁর মুখ থেকে আপত্তি বা অনুযোগের আভাস পাওয়া যায় নি। দুশমনদের কাছে তাঁর মুখে কোন আবেদন করতে দেখা যায় নি। হা-হুতাশ, চিৎকার বা দুঃখ প্রকাশের কোন শব্দ বড় আওয়াজে শোনা যায় নি। নবী-পরিবারের তাঁবু থেকে মাতমের ক্রন্দনের শব্দ আসে নি। আহ্‌লে-বাইতের প্রত্যেক সদস্যই ধৈর্য্যের দুধ, তাওয়াক্কুলের পানি এবং রেযার খাদ্য ভোজন করেই বড় হয়েছিলেন। মাতমের শোকে মুহ্যমান হওয়া কি তাঁদের মানায়? তাঁরা তো মনের আনন্দেই শাহাদাতকে কবুল করে নিয়েছিলেন! কি পুরুষ, কি নারী সকলেই তো শাহাদাতের উপর খুশি ছিলেন। এ তো ছিল তাঁদের পরীক্ষায় অংশ নেবার আর সাফল্যে আনন্দচিত্ত হওয়ারই এক পরম সুযোগ! অতএব, আল্লাহ্‌র হুকুমের ছোরা চলতেই থাকে, নবী-পরিবারের সদস্যগণ এক একজন করে গর্দান কাটিয়েই দিচ্ছিলেন, শাহাদাতের পরম সুধা পান করেই যাচ্ছিলেন। অবশেষে সেই শাহাদাতেরও পালা এল, যে শাহাদাতের জন্য আসমানের ফেরেশ্‌তারাও ছিল অধীর প্রতীক্ষায়, যে দৃশ্যের অবতারণায় নভোমণ্ডলও শিউরে উঠেছিল, নবী-দৌহিত্র নিজের সঙ্গীদের কুরবানী দিয়ে লাখো এজিদীদের জাহান্নামে পাঠিয়ে দিয়ে সবশেষে তীর আর বর্শার আঘাতে দেহকে ক্ষত-বিক্ষত করিয়ে দেওয়ার পর ঘোড়া থেকে নিচে পড়ে যান! তখন ছিল জোহরের সময়। হযরত হোসাইন সেই মুহূর্তটিরই অপেক্ষায় ছিলেন। তিনি হাতের তরবারিটি রেখে দিলেন মাটির উপর। নিজের রক্তাক্ত হাত মোবারক মারলেন তপ্ত মরুর বুকে। কারবালার উষ্ণ বালুতেই তিনি জীবনের শেষ তায়াম্মুমটি করলেন। এরপর 'আল্লাহু আকবর' বলে নামাজ আরম্ভ করে দিলেন। কেয়াম ও রুকূ করা পর্যন্ত কোন বদ-বখ্‌ত হযরত হোসাইনের কাছে ঘেষতে পারে নি। এদিকে হোসাইন আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে সেজদায় মস্তক মাটিতে রাখলেন। এমন সময়ে দুর্ভাগা ঘাতকের ঘৃনিত তরবারি হযরত হোসাইনের পূতঃপবিত্র গর্দান মোবারককে স্পর্শ করল! তৎক্ষণাৎ মলেকুল মওত আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে হৃদয়-আকুল করা সুসংবাদ শুনিয়ে দিলেন,

يَٰٓأَيَّتُهَا ٱلنَّفْسُ ٱلْمُطْمَئِنَّةُ ﴿٢٧﴾ ٱرْجِعِىٓ إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً

–হে সুদৃঢ় সুস্থির নফস! তুমি তাঁর উপর রাজি, তিনি তোমার উপর রাজি অবস্থায় তুমি তোমার রবের কাছে চলে এস![১]

হোসাইন! তুমি তোমার রেযার পরীক্ষায় বিরাট সফলতা নিয়ে উত্তীর্ণ হয়েছ! তুমি ছিলে আমার উপর সন্তুষ্ট। আমিও তোমার গর্দান দিতে দেখে তোমার উপর সন্তুষ্ট হয়ে গেলাম! অতএব, তুমি 'রেযা বিল কযা'র[২] মুকুট মাথায় দিয়ে আনন্দ চিত্তে আমার নিকট চলে এস!

فَٱدْخُلِى فِى عِبَٰدِى ﴿٢٩﴾ وَٱدْخُلِى جَنَّتِى ﴿٣٠﴾

–অতঃপর তুমি আমার (সম্মানিত ও মর্যাদাবান) বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাও, আমার বেহেশ্‌তে প্রবেশ কর![৩]

হযরত ইমাম হোসাইন মকামে রেযার তৃতীয় ধাপেও সফল ছিলেন। তৃতীয় ধাপটি ছিল, সবকিছু দিয়ে দেওয়ার পরও মুখ দিয়ে কোন আপত্তি বা অনুযোগ না আসা। ইমামে আলী মকাম তো সবকিছু হাতছাড়া হয়ে যাওয়ার পরও খুবই আনন্দচিত্তে পুলকিত হৃদয়ে আল্লাহ্‌র মহামিলনে এবং নানাজানের নূরানী কদমে গিয়েই পৌঁছেছিলেন। তখন তাঁর পক্ষ থেকে তো কোন আপত্তি বা অনুযোগের কিংবা দুঃখ-প্রকাশের কোন প্রশ্নই ছিল না।

কর্মের মহত্ত্ব :

কারবালার ঘটনার আলোচনায় এ কথা পরিষ্কারভাবে প্রতিভাত হয় যে, মকামে রেযার এই ধাপটিতে ইমাম হোসাইনই কেবল অটল ছিলেন তা নয়, বরং তাঁর ন্যায় তাঁর পরিবারের সকল সদস্যও সম্মান ও অটলত্বের বিরাট বৃদ্ধাচল হয়ে দৃঢ় ও স্থির ছিলেন। তাঁদের এতটুকুও পদস্খলন ঘটে নি। পরবর্তীতেও কেউ কোন সময়ে নবী-পরিবারের কোন সদস্যকে কারবালার করুণ ঘটনার আলোচনা করতে শুনে নি। তাঁদের জবানে আপত্তির সুর কেউ কখনো শুনতে পায় নি। বরং তাঁরা তো ইমাম হোসাইনের ঘাতকদের সাথেও সদ্ব্যবহারই করেছিলেন!

কারবালার বিষাদময় ঘটনার পর হযরত ইমাম যাইনুল আবেদীন রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু মদীনা থেকে সামান্য দূরে একটি জায়গায় বসতি স্থাপন করলেন। হযরত ইমাম হোসাইনের ঘাতকদের একজনকে কোন অপরাধে এজিদ সাজা দিতে চাইলে

১. সূরা: ফজর, ৮৯: ২৭-২৮।
২. আল্লাহ্ হুকুমের উপর রাজি থাকা।
৩. সূরা: ফজর, ৮৯: ২৯-৩০।

সে প্রাণে বাঁচার জন্য পালিয়ে যায়। রাষ্ট্রের কোথাও সে নিজেকে বাঁচাবার মত নিরাপদ স্থান খুঁজে পেল না। শেষ অবধি সে সেই পরিবারেই চলে এল, যে পরিবারের রক্ত নিয়ে কারবালায় সে হোলি খেলায় মেতেছিল! লোকটি হযরত যাইনুল আবেদীন রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর নিকট চলে এসে তাঁর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করল। তিনি তাকে তিনদিন নিজের বাড়ীতে থাকার সুযোগ দিলেন। তার সেবা-যত্ন করলেন। চলে যাবার সময় তাকে সফরের খরচ-পাতিও দিলেন। এই সুন্দর ও অনুপম সদ্ব্যবহার দেখে কদম বাড়াতেই লোকটি থমকে দাঁড়িয়ে গেল। সে মনে মনে ভাবল, হয়ত ইমাম যাইনুল আবেদীন তাকে চিনতে পারেন নি। যদি চিনতেন, এরূপ সদাচরণ করতেন না। বরং প্রতিশোধ নিতেন। তাই সে মুখ ফিরিয়ে ওয়াপেস এসে অবলীলায় বলল, হুজুর! মনে হয় আপনি আমাকে চিনতে পারেন নি! তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কীভাবে ধারণা করলে যে, আমি তোমাকে চিনতে পারি নি? লোকটি বলল, যেরূপ আচরণ আপনি আমার সাথে করেছেন, কেউ কোন দিন নিজেদের ঘাতকদের সাথে সেইরূপ সদাচরণ করে না! ইমাম যাইনুল আবেদীন হেসে উঠলেন। আর বললেন, জালিম! আমি তো তোমাকে কারবালার সেই থেকেই চিনি, আমার পিতার ঘাড়ের উপর যেই মুহূর্তে তুমি তরবারি চালাচ্ছিলে! কিন্তু পার্থক্যটা কোথায় জান? তা ছিল তোমার কাজ, আর এ হল আমার কাজ!

অধ্যায় : ০৬

কারবালার ঘটনার ধর্মীয় গুরুত্ব

ইসলামী বর্ষের আরম্ভ হয় মুহররম মাস দিয়ে। শেষ হয় জিলহজ্ব মাসে। মুহররম দিয়ে শুরু হওয়া এবং জিলহজ্ব মাস দিয়ে শেষ হওয়া এই কথার ইঙ্গিত বহন করে যে, ইসলামী জিন্দেগীর সফরের শুরুও হয় কুরবানী দিয়ে, শেষও হয় কুরবানী দিয়ে। বলা যায়, মুসলমানের পুরো জীবনটাই যেন একটি কুরবানী।

জিলহজ্ব মাসটি আমাদের সামনে উদ্ভাসিত করে তোলে হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের এশকে-ইলাহীর দুর্দমনীয় আগ্রহ আর হযরত ইসমাঈল আলাইহিস সালামের শাহাদাতের অদম্য বাসনা। আর মুহররম মাস আমাদেরকে আহ্বান করে শহীদ-সর্দার সাইয়েদুনা ইমাম হোসাইন রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হুর শাহদাতের বাস্তব ঘটনার দিকে। জিলহজ্ব মাসের দশম তারিখে নবী-দৌহিত্র হযরত হোসাইন কেবল নিজেই নন, বরং তাঁর কলিজার টুকরা সন্তান, সহযোগী ভ্রাতা, সহকর্মী প্রিয়জনদের বিসর্জনের মস্তক মওলার দরবারে উৎসর্গ করে দিয়েছিলেন!

মুহররম মাসে ইমাম আলী মকাম সাইয়েদুনা হযরত ইমান হোসাইন রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হু নবী-পরিবারের সদস্যদের সহ আপন সাথীদের সমবিভ্যাহারে (বর্ণনার তারতম্য অনুসারে সর্বাধিক একশত পঁয়তাল্লিশ জন) আল্লাহ্র দীনের ধ্বজাকে চির উড্ডীন রাখার মানসে এবং জুলুম, নির্যাতন, অন্যায়, দুর্নীতি ও পেষণ-দলন-দমন-নীতির সরকারের বিরুদ্ধে জেহাদের পতাকা তুলে ধরার জন্য কারবালার ময়দানে জমায়েত হয়েছিলেন। নারীগণ আর স্বল্প বয়স্ক যাইনুল আবেদীন ব্যতীত সকল পূতাত্মাগণই শাহাদাতের অমীয় সুধা পান করেছিলেন। মানবেতিহাসে এটি একটি মহান ত্যাগ, মহান কুরবানী। মহান আল্লাহ্ তা'আলা এই কুরবানীকে সর্বকালের জন্য সর্বজনের মাঝে ইসলামের মূল রীতি-নীতির অন্তর্ভুক্ত করে দিয়েছেন।

কাবালার ঘটনা কি কেবল একটি ঐতিহাসিক ঘটনা :

হযরত ইমাম হোসাইন ও সাহাবায়ে কেরামদের ঘটনা ও শাহাদাতের কথা আলোচনায় আসে। কিছু কিছু লোক কারবালার ঘটনা ও হযরত ইমাম হোসাইনের শাহাদাতকে কেবল একটি ঐতিহাসিক ঘটনা বলেই মনে করে থাকে। ইতিহাসের পাতায় আরো আরো অনেক লোক যেমনি রূপ নৃশংসতা ও পৈশাচিকতার শিকার হয়েছেন, নির্যাতন-নিপীড়ন ও অত্যাচারে জর্জরিত হয়েছেন, অবশেষে শহীদ হয়েছেন, ইমাম হোসাইন রাদিয়াল্লাহু তা'আলা

আন্হুর শাহাদাতও অনুরূপ একটি ঐতিহাসিক ঘটনা মাত্র। এর চেয়ে বড় কিছু নয়।

মূলতঃ এটি এক ধরনের অভিসন্ধি, যা বিগত এক বিশেষ সময়কাল থেকেই চালু হয়েছে। শাহাদাতের ঘটনা, ইমাম হোসাইনের আলোচনা ইত্যাদিকে বুঝে শুনে ইচ্ছাকৃতভাবেই এড়িয়ে চলা হচ্ছে। তারা মানুষের মনে এই মনোভাব সৃষ্টি করে দিতে চায় যে, কারবালার ঘটনা ও ইমাম হোসাইনের শাহাদাতের আলোচনা শিয়ারাই বেশি করে, শিয়াপন্থীদেরই কাজ হচ্ছে ইমাম হোসাইনের শাহাদাতকে আলোচনার মূল কেন্দ্রবিন্দু বানানো। তাছাড়া তারা মানুষদের এও ধারণা দিতে চায় যে, ইমাম হোসাইনের শাহাদাতকে আলাচনায় আনার কোন গুরুত্বই নাই!

পবিত্র কুরআন শরীফ মনোযোগ সহকারে আদ্যোপান্ত পাঠ করলে দেখা যায় যে, এতে বিভিন্ন ধরনের বিষয় ও জ্ঞানের কথা বিবৃত হয়েছে। যেমন,

১. ইলমুল আকায়িদ (আকিদা সম্বলিত জ্ঞান)
২. ইলমুল আহকাম (বিধি-বিধান সম্বলিক জ্ঞান)
৩. ইলমুত তাজকীর (আলোচনা সম্বলিত জ্ঞান)

ইলমুত তাজকীরের তিনটি রূপ :

১. ইলমুত তাজকীর বিল মওত ওয়া বাদাল মাওত (মৃত্যু ও মৃত্যু পরবর্তী আলোচনা)
২. ইলমুত তাজকীর বি আলায়িল্লাহ্ (আল্লাহ্র নেয়ামত সম্বলিত আলোচনা)
৩. ইলমুত তাজকীর বি আইয়ামিল্লাহ্ (আল্লাহ্র দিবসসমূহ সম্বলিত আলোচনা)

বলা যায়, কুরআনের বিষয়বস্তু ও কুরআনের বিদ্যা সর্বমোট পাঁচটি :

১. ইলমুল আকায়িদ (আকিদা সম্বলিত জ্ঞান)
২. ইলমুল আহকাম (বিধি-বিধান সম্বলিক জ্ঞান)
৩. ইলমুত তাজকীর বিল মওত ওয়া বাদাল মাওত (মৃত্যু ও মৃত্যু পরবর্তী আলোচনা)
৪. ইলমুত তাজকীর বি আলায়িল্লাহ্ (আল্লাহ্র নেয়ামত সম্বলিত আলোচনা)
৫. ইলমুত তাজকীর বি আইয়ামিল্লাহ্ (আল্লাহ্র দিবসসমূহ সম্বলিত আলোচনা)

আমরা এবার, পবিত্র কুরআনের এই পাঁচটি জ্ঞান ও এগুলোর উপকারিতা নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করছি।

ইলমুল আকায়িদ (আকিদা সম্বলিত জ্ঞান) :

পবিত্র কুরআনে কিছু বিষয় ও জ্ঞান রয়েছে যা এই আকিদা সম্বলিত। অর্থাৎ, তাওহীদ, রিসালত, আখিরাত, মালায়িকা, মৃত্যুর পর পুরুত্থান, কেয়ামত সংঘটিত হওন, দোযখ, বেহেশত, তকদীর ইত্যাদি। এই বিষয় ও জ্ঞান সম্বলিত দেদার আয়াত বিদ্যমান রয়েছে পবিত্র কুরআনে। সংক্ষেপে বলতে গেলে, এসব আয়াতসমূহ হচ্ছে আমাদের আকিদা ও ঈমানের মূল ভিত্তি।

হযরত শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ্ মুহাদ্দিস দেহলভী রাহমাতুল্লাহি আলাইহ্ ইলমুল আকায়িদের নাম দিয়েছেন 'ইলমুল মুখাসামা'[১]। কেননা, পবিত্র কুরআনে হক আকিদাগুলো বর্ণনা করার পর বাতিল আকিদার সাথে ওসবের পারস্পরিক তুলনাও করা হয়েছে। যেমন, আমাদের আকিদা একত্ববাদের। পক্ষান্তরে খ্রিষ্টানদের আকিদা তৃত্ববাদের। আর পবিত্র কুরআনে এই উভয় আকিদারই তুলনামূলক বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। তাছাড়া তৃত্ববাদকে বাতিল প্রতিপন্ন করে একত্ববাদকে সত্য রূপে তুলে ধরা হয়েছে। অনুরূপ কেউ কেউ মৃত্যুর পর পুনরুত্থানকে বিশ্বাস করে না। পবিত্র কুরআন এই আকিদাকে খণ্ডন করা হয়েছে। কুরআন শরীফে এই যে হক-আকিদাকে সত্য রূপে প্রতিষ্ঠা করা হল আর বাতিল-আকিদাকে অলীক রূপে প্রতিহত করা হল, এরই ভিত্তিতে হযরত শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ্ মুহাদ্দিস দেহলভী রাহমাতুল্লাহি আলাইহ্ ইলমুল আকায়িদকে ইলমুল মুখাসামা নাম দিয়েছেন।

ইলমুল আকায়িদের উপকারিতা হচ্ছে এ দ্বারা মানুষ তার গবেষণায়, মতবাদে, বিশ্বাসে ও চিন্তা-চেতনায় অটল থাকার সুনির্দ্দিষ্ট ও সুনিয়ন্ত্রিত একটি নিয়ম ও পদ্ধতি পায়।

ইলমুল আহকাম (বিধি-বিধান সম্বলিত জ্ঞান) :

পবিত্র কুরআনের বিষয়বস্তুসমূহ ও জ্ঞানসমূহ হতে একটি জ্ঞান হচ্ছে ইলমুল আহকাম বা বিধি-বিধান সম্বলিত জ্ঞান। কুরআনের কিছু কিছু আয়াত আমাদেরকে নামাজ, রোজা, হজ্ব, যাকাত, নেকাহ, তালাক, হালাল, হারাম ইত্যাদি বিষয়ে ধারণা দেয়। এসব আয়াতে শরীয়তের বিধি-বিধান যাকে আমরা ইসলামী কানুন বলে থাকি সেগুলোরই আলোচনা করা হয়েছে।

[১]. মুখাসামা অর্থ পরস্পর বিবাদ।

ইলমুল আহকামের উপকারিতা হচ্ছে এতে মনব-জীবনকে একটি বিশেষ নিয়ম-নীতির আওতায় নিয়ে আসার এবং সেই মতে নিজের জীবন পরিচালিত করার শিক্ষা রয়েছে।

ইলমুত তাজকীর (আলোচনা সম্বলিত জ্ঞান) :

পবিত্র কুরআনের বিষয় ও জ্ঞানসমূহের একটি হল ইলমুত তাজকীর বা আলোচনা সম্বলিত জ্ঞান। এই আলোচনা সম্বলিত জ্ঞান মানে এমনসব বিষয়াদির আলোচনা, যা পাঠ করলে ও শ্রবণ করলে মানুষ উপদেশ অর্জন করতে পায়। ইলমুত তাজকীরে এমনসব বিষয়ের আলোচনা করা হয়, যেগুলো পাঠ ও শ্রবণ করলে মানুষের মনকে প্রভাবান্বিত করে। মানুষের মনে সৃষ্টি হয় আল্লাহ্র ভয়, আখিরাতের ভাবনা, আল্লাহ্র ভালবাসা, খুযূ-খুশূ ও অনুনয়-বিনয়। অপরদিকে অহমিকা ও গৌরববোধের ন্যায় গর্হিত চরিত্র মানুষের ভেতর থেকে দূরীভূত হয় যায়। নফসের খারাবি ও পঙ্কিলতা থেকে মানুষ পবিত্র হয়। মোটকথা, ইলমুত তাজকীরের মাধ্যমে মানুষ বিভিন্ন দিক ও বিভিন্ন দর্শন সম্পর্কে উপদেশমূলক বাস্তব ধারণা লাভ করতে পারে।

ইলমুত তাজকীরের তিনটি রূপ। যথা,

১. মৃত্যু ও মৃত্যু পরবর্তী সম্বলিত আলোচনা
২. আল্লাহ্র নেয়ামত সম্বলিত আলোচনা
৩. আল্লাহ্র দিবসসমূহ সম্বলিত আলোচনা

পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন স্থানে মৃত্যু সংক্রান্ত আলোচনা রয়েছে। কোথাও ঈমানদারদের মৃত্যুর, কোথাও কাফিরদের মৃত্যুর। আবার ঈমানের মৃত্যুর পর আল্লাহ্র বখশিশ ও দানের কথাও আলোচনা করা হয়েছে, যা ঈমানদারদের জন্য হয়ে থাকবে। অন্যদিকে কাফিরদের মৃত্যুর পর তারা যে তাদের নাফরমানির কারণে আল্লাহ্র আজাবের শিকার হবে সে কথাও আলোচিত হয়েছে। ঈমানদারদের মৃত্যুর পর বখশিশ ও দান এবং না-ফরমানদের মৃত্যুর পর গজব ও আজাবের আলোচনা এ কারণেই করা হয় যে, উদ্বুদ্ধকরণ ও ভীতি প্রদর্শন এই দুই পদ্ধতিতে ঈমান, সততা ও মঙ্গলের প্রতি যেন মানুষের ধাবমানতা সৃষ্টি হয়।

ইলমুত তাজকীর বি আলায়িল্লাহ্ বা আল্লাহ্র নেয়ামত সম্বলিত আলোচনা:

মহান আল্লাহ্ তা'আলা বিভিন্ন স্থান, বিভিন্ন জাতি ও বিভিন্ন সময়ে যেসব দান, বখশিশ, এহসান ও নেয়ামত দান করেছেন পবিত্র কুরআনের স্থানে স্থানে

আমরা সেসবের আলোচনা দেখতে পাই। বনী ইসরাঈলদের যেভাবে সম্বোধন করা হয়েছে :

يَٰبَنِيٓ إِسۡرَٰٓءِيلَ ٱذۡكُرُواْ نِعۡمَتِيَ ٱلَّتِيٓ أَنۡعَمۡتُ عَلَيۡكُمۡ وَأَنِّي فَضَّلۡتُكُمۡ عَلَى ٱلۡعَٰلَمِينَ ﴿٤٧﴾

–হে বনী ইসরাঈলগণ! তোমরা আমার সেই নেয়ামতের কথা স্মরণ রাখিও, যা আমি তোমাদেরকে দান করেছি। আর (স্মরণ রাখিও যে,) আমি তোমাদেরকে বিশ্বময় শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছি।[১]

অতঃপর বলছেন :

وَإِذۡ نَجَّيۡنَٰكُم مِّنۡ ءَالِ فِرۡعَوۡنَ يَسُومُونَكُمۡ سُوٓءَ ٱلۡعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبۡنَآءَكُمۡ وَيَسۡتَحۡيُونَ نِسَآءَكُمۡۚ

–(হে এয়াকুবের বংশধরেরা! স্মরণ রাখিও) আমি যখন তোমাদেরকে ফেরাউনের বংশ থেকে রক্ষা করেছিলাম, যারা তোমাদেরকে অনিষ্টকর শাস্তি দিত; তোমদের পুত্রগণকে হত্যা করত, তোমাদের কন্যাদের জীবিত রাখত।[২]

অন্যত্র উল্লেখ রয়েছে :

وَظَلَّلۡنَا عَلَيۡكُمُ ٱلۡغَمَامَ وَأَنزَلۡنَا عَلَيۡكُمُ ٱلۡمَنَّ وَٱلسَّلۡوَىٰۖ كُلُواْ مِن طَيِّبَٰتِ مَا رَزَقۡنَٰكُمۡۖ

–(আরো স্মরণ রাখিও, ফেরাউন সলীল সমাধির পর তোমরা যখন সিরিয়ার দিকে গমনকালে তীহ্ প্রান্তরে এসে দিক-বিদিক ছুটাছুটি করছিলে) আমি তোমাদের উপর মেঘমালার ছায়ার ব্যবস্থা করেছিলাম, তোমাদের উপর 'মন্' ও 'সালওয়া' অবতীর্ণ করেছিলাম। আমি তোমাদের প্রতি যে রিজিক দান করেছি তা থেকে পবিত্র রিজিকগুলো ভক্ষণ কর।[৩]

১. সূরাঃ বাকারা, ২: ৪৭।
২. সূরাঃ বাকারা, ২: ৪৯।
৩. সূরাঃ বাকারা, ২: ৫৭।

এভাবে মহান আল্লাহ্ তা'আলা মানুষের জীবন নির্বাহ করার উপযোগ স্বরূপ দিবানিশি যে সকল ফলার আর খোরাকসহ বিভিন্ন ধরনের নেয়ামতরাজির ব্যবস্থা করেছেন, পবিত্র কুরআনে আমরা সেসব নেয়ামতের আলোচনাও দেখতে পাই। এসব নেয়ামতের আলোচনার উদ্দেশ্য হচ্ছে, মানুষের মাঝে বিনয় ও কৃতজ্ঞতার মনোভাব সৃষ্টি হওয়া। কেননা, মানুষ যখন জানতে পারবে যে, তারা যেসকল নেয়ামত ভোগ করছে, এসব নেয়ামত তাদের মহান প্রতিপালকের পক্ষ থেকেই প্রাপ্ত হয়েছে, মানুষের ব্যক্তিগত যোগ্যতার ফলশ্রুতি এগুলো নয়, তখনই তাদের মাঝে বিনয় ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের বাস্তব উপলব্ধি ও আগ্রহ পয়দা হবে।

ইলমুত তাজকীর বি আইয়ামিল্লাহ্ বা আল্লাহ্র দিবসগুলো সম্বলিত আলোচনা :

এসব আয়াতে বিভিন্ন দিবস বা ঘটনার এমনসব কথা আলোচনা করা হয়, যা পাঠ করে কিংবা শ্রবণ করে মানুষ মানসিকভাবে প্রভাবিত হয়। এগুলোতে এমনসব ঘটনার আলোচনা করা হয়, যেসবে হক ও বাতিলের পারস্পরিক দ্বন্দ্ব বিদ্যমান ছিল, ফলাফল স্বরূপ হকপন্থীদের উপর বখশিশ করা হয়েছে এবং প্রতিদান দেওয়া হয়েছে, না-ফরমানদের সাজা দেওয়া হয়েছে। এমনসব ঘটনা দ্বারা অনেকেই মানসিকভাবে সাহস পায় এবং হেদায়ত প্রাপ্ত হয়।

কারবালার ঘটনা ঃ কুরআনের বিষয়বস্তুর একটি :

কারবালার ঘটনা কুরআনের সুনির্দিষ্ট বিষয়বস্তুরই একটি অনন্য ঘটনা। এই ঘটনার সম্পর্ক 'আল্লাহ্র দিসবসমূহের আলোচনা'-র সাথে। অর্থাৎ, এটি এমনসব ঘটনারই একটি, যা আলোচনা করা হলে মানুষ উপদেশও লাভ করে, হেদায়তও পায়। এই ঘটনাটিতে শিক্ষা ও সবকের অনেক কিছুই রয়েছে। কারবালার ঘটনা সেসব ঘটনাবলিরই একটি যেগুলো শুনে মানুষের মন ভেঙে যায়, হৃদয় প্রভাবিত হয়।

আমরা যখন পবিত্র কুরআন অধ্যয়ন করি, দেখতে পাই হযরত ইবরাহীম আলাইহিস্ সালামের ঘটনাবলির আলোচনাসমূহ। সেখানে স্বীয় পুত্র হযরত ইসমাঈল আলাইহিস্ সালমকে আল্লাহ্র রাহে জবাই করার সম্পূর্ণ ঘটনা সবিবরণ বিদ্যমান। অনুরূপ হযরত নূহ, হযরত লূত, হযরত হূদ, হযরত দাউদ, হযরত ইসহাক, হযরত যাকারিয়া, হযরত মুসা ও হযরত ঈসা আলাইহিমুস সালাম প্রমুখ নবী-রাসূলগণের ঘটনাবলিও পবিত্র কুরআনে

আলোচিত হয়েছে। সূরা ইউসুফে হযরত ইউসুফ আলাইহিস্ সালামের সম্পূর্ণ ঘটনা বিশদভাবে বিদ্যমান রয়েছে। শৈশবে ভাইদের অমানবিক আচরণ, তাঁর স্বপ্নে দেখা, সৎ-ভাইগণ কর্তৃক তাঁকে শিকার করতে নিয়ে যাওয়া, বনের এক অব্যবহৃত কূপে তাঁকে নিক্ষেপ করা, একটি কাফেলা কর্তৃক তাঁকে কূপ থেকে উদ্ধার করে মিসরে নিয়ে যাওয়া, তাঁকে মিসরের বাজারে বিক্রি করা, যৌবনে পদার্পণ করা, আযীয মিসরের স্ত্রী তাঁর প্রেমে আত্মহারা হয়ে মিলনের প্রস্তাব দেওয়া, প্রস্তাবে রাজি না হওয়ায় তাঁর বিরুদ্ধে অপবাদ লেপন করা, তাঁকে কয়েদ করা, জেলখানায় তাঁর দুই সহতীর্থের স্বপ্নে দেখা, ইউসুফ আলাইহিস্ সালামের কাছে সেই স্বপ্নের তাবির জানতে চাওয়া, স্বপ্নের তাবির করা– এমনরূপ অনেক অনেক ঘটনা নিয়ে ভরপুর পুরো সূরা ইউসুফ।

যেসব মানুষ পবিত্র কুরআনকে কেবল মাস্আলা-মাসয়িল ও বিধি-বিধানেরই উৎসমূল বলে মনে করে, যাদের কাছে মাস্আলা-মাসায়িল ও বিধি-বিধান ব্যতীত অন্য কিছুর আলোচনা বা শ্রবণে কোনই উপকারিতা নাই, তারা যেন সূরা ইউসুফটি ভালভাবে পাঠ করেন। আর দেখেন যে, এই সূরাতে কত কত মাস্আলা ও বিধি-বিধান বিদ্যমান রয়েছে। কত কত ফরজ, ওয়াজিব ও সুন্নাতের আলোচনা রয়েছে। কত কত হালাল-হারাম বর্ণিত হয়েছে। অবশ্যই আমাদেরকে এই কথা স্বীকার না করার কোনই উপায় নাই যে, কুরআন বলতে কেবল মাস্আলা-মাসয়িল ও বিধি-বিধানকেই বুঝায় না। মন-মানসিকতাকে ইসের মধ্যে সীমাবদ্ধ করে রাখা যে, 'তা-ই স্বার্থ, তা-ই শরীয়ত যাতে বিধি-বিধান বর্ণিত রয়েছে আর মাস্আলা-মাসায়িল লিপিবদ্ধ রয়েছে'·· এটি দীনের দৃষ্টিকোণ থেকে নিতান্তই হীনতা!

বিজ্ঞানময় কুরআন শুধু মাস্আলা-মাসায়িল ও বিধি-বিধানের আলোচনাতেই পরিপূর্ণ তা নয়, বরং ঘটনাবলির আলোচনা করাও কুরআনের বিষয়বস্তুগুলোর একটি অন্যতম বিষয়। আর এটিকে অস্বীকার করা সম্ভবও নয়। কেননা, ওসব ঘটনাবলি পাঠ করাতে এবং শোনাতে অনেক ধরনের নসিহতও অর্জিত হয়। এমন অনেক স্থানও রয়েছে, যেখানে এলে হৃদয়ে আবেগের সৃষ্টি হয়। কোথাও এলে ছোট্ট একটি আহ্বান পাওয়া যায়। হৃদয়-মন ব্যাকুল হয়ে উঠে। কখনো চোখ অশ্রুসিক্ত হয়ে উঠে। কখনো মন কোমল হয়ে যায়। পাশাপাশি মাস্আলা-মাসায়িল আর বিধি-বিধান তো আছেই। কখনো ঘটনার মূল নায়কের মহত্ব ও গুরুত্ব মনের পর্দায় উজ্জ্বল হয়ে উঠে। মোটকথা, অসংখ্য হেকমত রয়েছে, যেগুলো কেবল একটি ঘটনা থেকেই মানুষ পেয়ে থাকে।

সালিহীনদের ঘটনা :

পবিত্র কুরআন নাযিল হওয়ার পূর্বেকার যেসব ঘটনা কুরআনে আলোচনা করা হয়েছে, সেগুলো কেবল নবী-রাসূলগণেরই নয়, বরং নবী-রাসূল ছাড়াও অন্যান্য লোকজনের ঘটনাও আলোচনা করা হয়েছে। যেমন ধরুন, আসহাবে কাহাফের ঘটনাটি। আসহাবে কাহাফ তো নবী ছিলেন না। বরং তাঁরা ছিলেন সালিহ্, মুমিন ও মুখলিস বান্দা। পবিত্র কুরআন তাদের ঘটনাটিকে বিশদভাবে আলোচনায় এনেছে। তাঁদের সাথে তাঁদের কুকুরটিও ছিল। কুরআন বলছে, তাঁরা যখন বের হয়ে পড়েন, কুকুরটিও তাঁদের সঙ্গ নিল। তাঁরা গুহায় গিয়ে ঘুমিয়ে পড়লেন।

وَكَلْبُهُم بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ ۚ

–আর তাদের কুকুরটি চৌকাঠে (গুহার কিনারায়) তার দুইখানি হাত বিছিয়ে (বসে) ছিল।[১]

পবিত্র কুরআন আসহাবে কাহাফের কুকুরের বসার ধরনটিও আলোচনায় এনেছে। পাশাপাশি কুকুরের আলোচনা এলেও তো তার বসার ধরন আলোচনায় আনার কোন যৌক্তিকতা ছিল না। কিন্তু দেখুন, কুরআন তাঁদের কুকুরের বসার কায়দাটিও বর্ণনা করেছে।

যাদের দৃষ্টি বিজ্ঞানময় কুরআনের বিষয়বস্তুর ব্যাপ্তি ও হেকমতের প্রতি মোটেও নাই, যারা বিষয়গুলোকে হীন দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ করে, বিচারও করে, তাদের উচিত ঠাণ্ডা মাথায় চিন্তা করা যে, কুকুরটির বসার ধরনটি বয়ান করার কী হেকমত ছিল? কেবল এ-ই তো না, বরং পবিত্র কুরআন যখন আসহাবে কাহাফের সংখ্যা বর্ণনা করে, বলে :

سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَّابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ ۖ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ ۚ

–মানুষ (তো এ-ই) বলে থাকবে যে, তারা ছিল তিনজন। তাদের চতুর্থটি ছিল তাদের কুকুর। আবার (কেউ) বলবে, তারা ছিল পাঁচজন। তাদের ষষ্ঠটি ছিল তাদের কুকুর। (এ ছিল তাদের) অদৃশ্যে

১. সূরা: কাহাফ, ১৮: ১৮।

ঢিল ছুঁড়ার ন্যায়। আবার কেউ বলবে, তারা ছিল সাতজন। তাদের অষ্টমটি ছিল তাদের কুকুর।[১]

প্রশ্ন হচ্ছে, মহান আল্লাহ্‌র কী প্রয়োজন ছিল তাদের উক্তিগুলোকে কুরআনের ভাষায় ব্যক্ত করার? মনে করুন, কিছু লোকের একটি দল কোথাও যাচ্ছে। তাদের সাথে তাদের কুকুরও রয়েছে। অতঃপর কেউ জিজ্ঞাসা করল, দলে কতজন লোক? তখন জবাবে কি একথা বলা হবে যে, তারা সাতজন, আর তাদের অষ্টমটি কুকুর। বরং জিজ্ঞাসার অনুকূলে কেবল মানুষের সংখ্যাই বলা হবে, তাই না?

এভাবে বারে বারে বিভিন্নভাবে পাল্টিয়ে পাল্টিয়ে আসহাবে কাহাফের সংখ্যা ব্যক্ত করা, প্রতিবারে তাঁদের সাথে তাঁদের কুকুরটির কথাও উল্লেখ করা এই কথাই প্রকাশ করে যে, তাদের উক্তির ধরনগুলোতে অবশ্যই কোন না কোন রহস্য বিদ্যমান রয়েছে। মানুষের নিজের জ্ঞান, চিন্তা ও গবেষণাকে যদি বিজ্ঞানময় কুরআনের বিবৃতি ও দীনের মাপকাঠি বলে মনে করা হয়, তাহলে নাউযু বিল্লাহ্ পবিত্র কুরআনের সেসব বিবৃতি যেগুলোতে ঘটনাবলির আলোচনা রয়েছে, কেবলই অহিতকর, নিষ্প্রয়োজন ও প্রজ্ঞাশূণ্য হয়ে যায় না কি! অথচ কুরআন মজীদের কোন অংশ বিশেষকে অনর্থক ও নিষ্প্রয়োজন মনে করা তো কুফরই!

আসহাবে কাহাফের ঘটনাটিকে যদি অন্য দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা হয়, এ কথা বুঝে আসে যে, এই ঘটনাটির মাধ্যমে মহান আল্লাহ্ মূলতঃ আসহাবে কাহাফগণেরই মহত্ব ব্যক্ত করছেন। কেননা, তাঁরা তিনশত নয় বৎসর যাবৎ গুহায় ঘুমিয়ে ছিলেন। জীবিতও ছিলেন। আকাশে সূর্য উঠত। কিন্তু তাঁদেরকে রোদ থেকে রক্ষা করার জন্য নিজস্ব পতিপথ বাদ দিয়ে ডান দিকে মোড় নিত! আর অস্তকালে বাম দিকে ঘুরে যেত!

মহান আল্লাহ্ তা'আলা এরশাদ করছেন :

عَن كَهْفِهِمْ ذَاتَ ٱلْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَت تَّقْرِضُهُمْ ذَاتَ ٱلشِّمَالِ وَهُمْ فِى فَجْوَةٍ مِّنْهُ

[১]. সূরাঃ কাহাফ, ১৮: ২২।

–(হে প্রিয় নবী!) আপনি সূর্যকে দেখতে পাবেন, সে যখন উদয় হয়, তখন তাদের গুহা থেকে ডান দিকটি এড়িয়ে উদয় হয়। আর যখন অস্তমিত হয়, তখন তাদের বাম দিকটি এড়িয়ে যায়। আর তারা ছিল সেই গুহায় এক প্রশস্ত ফাঁকা জায়গাতেই![১]

তিনশত নয় বৎসর যাবৎ আসহাবে কাহাফগণের সাথে তাঁদের কুকুরটিও গুহার কিনারায় না খেয়ে না দেয়ে জীবিত থাকা– এসব আল্লাহ্‌রই কুদরত, তাঁরই নিদর্শন!

প্রজ্ঞা ও হেকমতের দৃষ্টিতে কুরআন শরীফ অধ্যয়ন করলে প্রতিটি আয়াত থেকেই হেকমত ও মারিফতের হাজারো ধারা উৎসরিত হয়ে আসতে দেখা যায়। যেমন, একটু ভেবে দেখুন, আসহাবে কাহাফের ঘটনায় কুকুরটির কথা কেন বার বার উল্লেখ করা হল? তাহলে কি মহাপ্রেমের মূল রহস্যটি এভাবে ধরা দেয়, কুকুরটির কথা বার বার উল্লেখ করে এ কথাই বুঝি জানিয়ে দেওয়া হল যে, কুকুরের মত প্রাণীও যদি আল্লাহ্‌র নেক বান্দার সাহচর্যে আসে, তাঁদের সঙ্গ না ছাড়ে, তাহলে সেও তাঁদের ফয়য থেকে বঞ্চিত যায় না!

মোটকথা, পবিত্র কুরআনের ঘটনাগুলো এমন যে, সেগুলোকে যদি প্রজ্ঞা ও হেকমতের দৃষ্টিতে দেখা হয়, তাহলে প্রতিটি ঘটনাতেই কল্যাণকর অনেক কিছুই দেখা যাবে। কিন্তু এই প্রজ্ঞা আর হেকমত যদি না থাকে, তাহলে কুরআনের যে-কোন ঘটনাকে কেবল একটি ঘটনা বলেই মনে হবে।

ঘটিত ঘটনার কথা আলোচনা করা পবিত্র কুরআনেরই তরিকা। কিন্তু যেসব ঘটনা পবিত্র কুরআন নাযিলের পরে সংঘটিত হয়েছে, সেগুলো তো পবিত্র কুরআনে উল্লেখ থাকার কথা নয়। তাই, পবিত্র কুরআন সেসব ঘটনাবলি সম্পর্কেও একটি ফায়সালা প্রদান করেছে। তা হল, নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের শুভ আবির্ভাবের কয়েক বৎসর পূর্বের কিছু ঘটনাবলি সংক্ষেপে বা বিশদভাবে বর্ণনা করেছে। আর বলেছে যে, পূর্ববর্তীদের ঘটনা আলোচনা করা কেবল পরিশুদ্ধ আর সুন্দর কর্মকাণ্ডই নয়, বরং তা দ্বারা মনের মধ্যে সৃষ্টি হয় আল্লাহ্-ভীতি, বিনয়ভাব, আল্লাহ্‌র নিদর্শনাবলির মহত্ববোধ ও দীনের নসিহতের প্রতি দুর্দমনীয় আগ্রহ। এভাবে ফায়সালাটি এরূপ দাঁড়াল যে, যেসব ঘটনা কুরআন নাযিলের পরবর্তীতে সংঘটিত হবে,

[১]. সূরাঃ কাহাফ, ১৮: ১৭।

সেগুলো পাঠ করা এবং সেগুলোর আলোচনা করাও বিশুদ্ধ হবে। পবিত্র কুরআন এ শিক্ষাই যেন দিচ্ছে যে, পরবর্তীতে সংঘটিত ঘটনাবলির প্রতিও তোমরা মনোনিবেশ দেবে। সেগুলোর চর্চাও তোমরা করতে থাকবে। সেগুলো থেকে তোমরা হেদায়ত ও নসিহত অর্জন করতে পারবে।

কারবালার ঘটনা ঃ আসহাবে কাহাফের ঘটনার চাইতেও অধিক বিস্ময়ের :

পবিত্র কুরআনে আসহাবে কাহাফের ঘটনার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। ঘটনাটি বড়ই বিস্ময়কর। আসহাবে কাহাফগণ তিনশত নয় বৎসর পর্যন্ত ঘুমে ছিলেন। তার পর জাগ্রত হয়েছিলেন। তাঁদের কুকুরটিরও একই অবস্থা ছিল। ঘটনাটি সেসব মহান ঘটনাবলিরই পর্যায়ভুক্ত, পবিত্র কুরআন যেগুলোর আলোচনা করেছে। কিন্তু কারবালার ঘটনাটি আসহাবে কাহাফের ঘটনাটির চেয়েও অধিকতর বিস্ময়কর!

হযরত মিনহাল বিন ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলছেন, ইমাম হোসাইনকে শহীদ করার পর তাঁর পবিত্র মস্তকটি এজিদের নির্দেশে বর্শাবিদ্ধ করে দামেশকের দিকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। কাফেলাটি দামেশকের বাজারের উপর দিয়ে যাচ্ছিল। তখন হযরত মিনহাল বিন ওমর নিজের চোখে দেখেছিলেন, দামেশকের জনৈক ব্যক্তি ইমাম হোসাইনের মস্তকটির সামনে সামনে হাটছিল। আর কুরআন শরীফ তিলাওয়াত করছিল। সে যখন সূরা কাহাফের এই আয়াতটি তিলাওয়াত করল :

أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا

–আপনি কি ভেবে দেখছেন যে, আসহাবে কাহাফগণ (গুহায় আশ্রয় গ্রহণকারীগণ) এবং শিলালিপির দল ছিল আমার বিস্ময়কর নিদর্শনাবলির একটি।[১]

এমন সময় :

فَأَنْطَقَ اللهُ الرَّأْسَ فَقَالَ أَعْجَبُ مِنْ أَصْحَابِ الْكَهْفِ قَتْلِي وَحَمْلِي

–মহান আল্লাহ্ হযরত হোসাইনের মস্তকটিকে বাকশক্তি দান করলেন। মস্তকটি বলে উঠল, আমাকে শহীদ করা আর এভাবে বর্শাবিদ্ধ করে বাজারে বাজারে মিছিল করা আসহাবে কাহাফের ঘটনার চাইতেও অধিক বিস্ময়কর।

১. সূরা: কাহাফ, ১৮: ৯।

বাস্তবেই তো এতে কোন সন্দেহ নাই যে, নবী-দৌহিত্রকে শহীদ করা এবং তাঁর শির বর্শাবিদ্ধ করে অলিতে-গলিতে কোরাস মিছিল করা নিশ্চয় আসহাবে কাহাফের ঘটনার চেয়েও বিস্ময়কর।

কারবালার ঘটনা ঃ পাকা-পোক্ত ঈমানের পরিচয় বহন করে :

নবী-রাসূল ও সালিহ্গণের কেবল আলোচনাগুলো পাঠ করার নির্দেশ দিয়েছে প্রজ্ঞাময় কুরআন। সূরা মরিয়মে রয়েছে :

وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ ۚ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَّبِيًّا ﴿٤١﴾

–কিতাবে উল্লিখিত ইবরাহীমের কথাও আপনি আলোচনা করুন, তিনি ছিলেন একজন সত্যাশ্রয়ী নবী।[১]

অন্যত্র আল্লাহ্ তা'আলা এরশাদ করছেন :

وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا ﴿١٦﴾

–কিতাবে উল্লিখিত মরিয়মের কথাও আপনি আলোচনা করুন, তিনি যখন আপন পরিবার থেকে আলাদা হয়ে পূর্বদিকের গৃহটির দিকে গেলেন।[২]

উল্লিখিত আয়াতগুলোর মাধ্যমে নবী ও নবী-পিতা হযরত ইবরাহীম এবং সতী-সাধ্বী মহিলা হযরত মরিয়মের আলোচনাগুলো পাঠ করার নির্দেশ পবিত্র কুরআনেই তো দেওয়া হয়েছে। নবী ও সালিহ্দের ঘটনাগুলো পাঠ করার নির্দেশ এ কারণেই দেওয়া হয়েছে যে, মানুষ যদি নেক-বান্দাদের জীবনী, তাঁদের আলোচনা, তাঁদের আচার-আচরণ, সত্য পথে চলতে গিয়ে আসা আপদ-বিপদ ও দুঃখ-কষ্ট, সেসবে ধৈর্যধারণ ও অটলতা এবং ধৈর্য্য ও অটলত্বে আল্লাহ্র অনুগ্রহ বর্ষণ ইত্যাদি পাঠ করে, তাহলে তাদের ঈমান পোক্ত হয়। ঈমানে দৃঢ়তা আসে। যোগ্যতা সৃষ্টি হয়। ভাবোদয় হয়, এমনতর অতি মহানদের উপরও যদি এই ধরনের দুঃখ-কষ্ট, জুলুম-নির্যাতন আসতে পারে, আল্লাহ্ও তাঁদেরকে বড় বড় অগ্নিপরীক্ষা আর দুঃখ-কষ্টের পর তাঁর রেজামন্দি ও সন্তুষ্টিতে ধন্য করে থাকেন, তাহলে তো আমাদেরকেও সেসব অতি

১. সূরা: মরিয়ম, ১৯: ৪১।
২. সূরা: মরিয়ম, ১৯: ১৬।

মহানদের প্রদর্শিত পথেই চলতে হবে। তাঁদের মত আমাদেরকেও তো চরম ধৈর্য্য ও অটলত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকতে হবে।

وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ

–আর নিশ্চয় আমি তোমাদের পরীক্ষা করব, ভয় আর ক্ষিধা দিয়ে এবং জান, মাল ও ফল-ফলারের ঘাটতি দিয়ে।[১]

হে ঈমানের দাবীদারেরা! হে আল্লাহ্ বান্দা হওয়ার দাবীদারেরা! হে সত্য মনে আল্লাহ্র মহত্বে বিশ্বাসীরা! হে দুনিয়ার অলীক ও মিথ্যা দেব-দেবীদের অস্বীকারকারীরা! আপনারা যদি আল্লাহ্র সাথে বান্দেগীর একনিষ্ঠ সম্পর্ক কায়েম করে নিয়ে থাকেন, তাহলে এ কথাটি মোটেও ভুলে গেলে চলবে না যে, আল্লাহ্ তা'আলাও আপনাদের বন্দেগীর পরীক্ষা নেবেন! বাজার থেকে একটি বাসন কিনতে গেলে কত করে বাজিয়ে বাজিয়ে দেখেন! কোন ধরনের দোষ-ত্রুটি আছে কি না! সামান্য দামের জিনিসে আপনারা যেক্ষেত্রে সামান্য দামও দিতে চান না। সেক্ষেত্রে সেই মহান আল্লাহ্ রেজামন্দির বিনিময়ে যিনি আপনাদের জীবন নিয়ে ব্যবসায় করেন আর নিঃসন্দেহে এমন বান্দাও তো রয়েছেন যাদের জীবন তিনি কিনেই নেন! তাঁর ব্যাপারে একটুও কি ভাববেন না!

আল্লাহ্ তা'আলা এরশাদ করছেন :

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ

–এমন মানুষও রয়েছে, যারা আল্লাহ্র রেজামন্দির উদ্দেশ্যে নিজেদের জীবনও বিকিয়ে দেয়।[২]

তবে কী মনে হয়, আল্লাহ্ কি তাঁর অমূল্য সন্তুষ্টি বিনা পরীক্ষায় আপনাদের হাতে তুলে দেবেন? না, অবশ্যই দেবেন না! তিনি কেন আপনাদেরকে ক্ষিধা দিয়ে বাজিয়ে দেখবেন না? কেন জান-মালের ঘাটতি দিয়ে পরীক্ষা করবেন না? তাঁর এসব যাচাই-বাছাই, পরীক্ষা-নিরীক্ষায় যদি কেউ উত্তীর্ণ হয়, তখনই তো তিনি তাকে তাঁর বিশেষ অনুগ্রহের ভূজবন্ধনে আগলে নেবেন।

১. সূরাঃ বাকারা, ২: ১৫৫।
২. সূরাঃ বাকারা, ২: ২০৭।

অতএব, কোন বান্দাকে নিজের করে নেবার পূর্বে আল্লাহ্ তা'আলা তাকে বিভিন্ন ধরনের পরীক্ষায় রাখেন। যাতে করে গোটা দুনিয়ার সামনে সে এমন এক দৃষ্টান্তে পরিণত হয় যে, দেখ, এই বান্দাটি ভরা পেটেও আমার শুকরিয়া আদা করে, খালি পেটেও আমার শুকরিয়া আদায় করে। তার কাছে যখন আমার নেয়ামতগুলো ছিল, তার যখন কোন অভাব ছিল না, সেই সময়ে তো আমার শুকরিয়া আদায় করেছেই, আবার যখন সে বিভিন্ন ভয়-ভীতির শিকার হয়েছে, তার জান-মাল ও ইজ্জত-আবরু বিপদের সম্মুখীন হয়েছে, তখনও সে আমার শুকরিয়া আদায় করছে। এই বান্দা সর্বাবস্থায় আমার উপর সন্তুষ্ট। আল্লাহ্ তা'আলা সম্পদের ঘাটতি দিয়ে, জান-মালের ঘাটতি দিয়ে, নেয়ামতের ঘাটতি দিয়ে বান্দাকে পরীক্ষা করেন। যাচাই-বাছাই করার তাঁর বিভিন্ন ধরনের পদ্ধতি রয়েছে। কখনো তিনি দান করে পরীক্ষা করেন, কখনো ছিনিয়ে নিয়ে। তিনি আপন বান্দাদেরকে বিভিন্নভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও যাচাই-বাছাই করতেই রয়েছেন যে, বান্দা কী করে? তারপর তিনি বলছেন :

وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ﴿١٥٦﴾

–সুসংবাদ জানিয়ে দিন সেসব ধৈর্য্যধারণকারীদের, যাদের উপর কোন আপদ আপতিত হলে বলে, আমরা সবাই আল্লাহ্রই, আর আমরা সবাই তাঁর দিকেই প্রত্যাবর্তিত হই।[১]

হে আমার ধৈর্য্যশীল বান্দারা! তোমাদের জন্য সুসংবাদ! তোমরা আমার এমন বান্দা যে, যখনই তোমাদের উপর কোন বিপদাপদ এসে সমুপস্থিত হয়, তখনই তোমরা বল, 'আমাদের কাছে আল্লাহর যে-কোন পরীক্ষাই কবুল। কারণ, আমরা তো আল্লাহ্রই! আমরা তো তাঁরই দিকে ফিরে যাব!' জীবন মানেই কেবল পরীক্ষা, কেবল বিপদ-আপদ আর কেবল দুঃখ-কষ্টই নয়, বরং এর পরেও রয়েছে সুখ আর স্বাচ্ছন্দ্যও। إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا 'নিশ্চয় দুঃখ-দুর্দশার সাথে রয়েছে সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্যও।' তোমাদের জন্য সৌভাগ্য! এই সুখ আর স্বাচ্ছন্দ্য তোমাদের জন্য অবারিত হয়ে গেল; এই ধারা তোমাদের জন্য অবাধ হয়ে গেল!

১. সূরাঃ বাকারা, ২: ১৫৫, ১৫৬।

বর্ণিত গুণাবলিতে যারা গুণান্বিত হয়েছেন তাঁদের সম্পর্কে আল্লাহ্ বলছেন :

أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ

–তারা এমন লোক যাদের উপর রয়েছে আল্লার বিশেষ অনুগ্রহ ও দয়া।[১]

সব ধরনের পরীক্ষা-নীরিক্ষা, যাচাই-বাছাইয়ের ঘাটগুলোতে উত্তীর্ণ হয়ে যেসব বান্দা সাফল্য অর্জন করেন, আল্লাহ্ তাঁদের উপর স্বীয় অনুগ্রহ ও রাহমতের বৃষ্টি বর্ষণ করতে থাকেন। তাঁদের মর্তবাকে বুলন্দ করে দেন। বিশ্বময় তাঁদের চর্চাকে অব্যাহত করে দেন। তাঁদেরকে দান করেন আপন নৈকট্য। তাঁদের উপর আল্লাহ্র রাহমতের পুষ্পচন্দন হয়।

وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ

–তারাই হেদায়তপ্রাপ্ত।[২]

এমনসব গুণান্বিত বান্দাদেরকে সবকিছু দান করার পর হেদায়তের সর্বশেষ মর্যাদাটিও দান করে আল্লাহ্ তাঁর অনুকম্পার অনাবিল ভূজ-বন্ধনে আগলে নিয়ে মঞ্জিলে-মকসুদে পৌঁছিয়ে দেন!!

১. সূরাঃ বাকারা, ২: ১৫৭।
২. সূরাঃ বাকারা, ২: ১৫৭।

অধ্যায় : ০৭

শাহাদাতে ইমাম হোসাইন : মুসলিম উম্মাহ্র প্রতি এক উদাত্ত আহ্বান!

পঞ্চভূতের এই পৃথিবীটাতে যখনই সমাজবদ্ধভাবে জীবন-যাপনের ধারা শুরু হয়, তখন থেকেই সমাজ পরিচালিত হয়ে আসছে বিভিন্ন রাজনৈতিক শক্তির অধীনে একটি সুনির্দ্দিষ্ট নিয়মের আওতায়। সেই থেকে নেতৃত্ব আর কর্তৃত্বের ধারাটিও শুরু হয়ে যায়। কোন সময় কারো হাতে নেতৃত্ব এলে, তারই কর্তৃত্বের ডঙ্কা বাজতে থাকে সর্বত্র। আবার এমনও দেখা গেছে যে, তাকে সেই নেতৃত্বের মসনদ থেকে সরিয়ে দিয়ে বঞ্চনা, লাঞ্ছনা আর বিস্মৃতির অতল গহ্বরে তলিয়েও দেওয়া হয়েছে। কর্তৃত্বকালে কারো মনে এমন কোন ভাবেরও উদয় ঘটে না যে, আগামীতে অন্য কেহই এই মসনদে এসে অধিষ্ঠিত হবে। অতএব, সে নিজের ধন-ঐশ্বর্য, আরাম-আয়েশ, দৈহিক ও মেধা-মননশীলতার সর্বশক্তি প্রয়োগ করেই ক্ষমতার এই মসনদ তৈরি করে নেয়। আর সেই ক্ষমতাকে সে তার চরম ও পরম সাফল্য বলেই ধরে নেয়।

পার্থিব সাফল্য মূল সাফল্য নয় :

আল্লাহ্ যাদেরকে নশ্বর ও ক্ষণস্থায়ী এই পৃথিবীতে নেতৃত্ব ও ক্ষমতা দান করেন, তারা নেতৃত্বের নেশায় বিভোর হয়ে সত্যবিমুখ হয়ে যায়। তখন তারা মনে করে যে, তারা চরম সাফল্যই লাভ করে নিয়েছে। এদের সম্পর্কে আল্লাহ্ পবিত্র কুরআনে বলছেন :

لَا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ فِى ٱلْبِلَٰدِ ﴿١٩٦﴾

–(হে মুসলমানেরা!) কাফেরদের (অবলীলায়) রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় আসা-যাওয়া যেন তোমাদেরকে প্রবঞ্চনায় না ফেলতে পারে![১]

নশ্বর এই পৃথিবীতে বাহ্যতঃ কারো সাফল্য গোচরীভূত হওয়া, ক্ষমতার মসনদে সমাসীন হওয়া মূল সাফল্য নয়। উক্ত আয়াতে মহান আল্লাহ্ তা'আলা প্রকাশ্যে ঘোষণা দিচ্ছেন, হে বান্দারা! এসব কাফের, বদ-বখ্‌ত, জালিম, ফাসিক, ফাজির, মুনাফিক ও তাগুতি শক্তির লোকজন পৃথিবীর ক্ষমতার গর্বে দম্ভ নিয়ে চলে, তাদের এই সাময়িক ও খণ্ডকালীন সাফল্য সদৃশ প্রবঞ্চনা যেন তোমাদেরকেও প্রবঞ্চিত না করতে পারে। তারা যে পৃথিবীতে দম্ভ নিয়ে চলাফেরা করে তা তো কেবল এ কারণেই যে, আল্লাহ্ তাদেরকে শৈথিল্য প্রদর্শন করে থাকেন। যখনই আল্লাহ্র পক্ষ থেকে পাকড়াও করার সময় আসবে, তখন তাদেরকে নিশ্চিহ্ন-নিরাকার করে দেওয়া হবে। তাদেরকে

[১]. সূরা: আলে ইমরান, ১৯৬।

এমনভাবে লাঞ্ছিত ও অপমানিত করা হবে যে, ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য তারা কেবল উপমা হিসাবেই উপস্থাপিত হবে। পবিত্র কুরআন কেবল এ কথাই না, আরো বলছে :

مَتَٰعٌ قَلِيلٌ ثُمَّ مَأْوَىٰهُمْ جَهَنَّمُ ۚ وَبِئْسَ ٱلْمِهَادُ ﴿١٩٧﴾

–(তাদের) এই (পার্থিব) সুখ-ভোগ সামান্য (দিনের জন্য)ই। এরপর তাদের ঠিকানা হবে জাহান্নাম। আর তা অত্যন্ত নিকৃষ্ট আবাস![১]

বলা হচ্ছে যে, জালিম ও ফাসিক লোকদের কিছুদিনের ক্ষমতা দেখে তোমরা যেন এটিকে তাদের সাফল্য মনে না করে বস। কেননা, তাদের পার্থিব এই ক্ষমতা তো মাত্র সামান্য দিনেরই। পরে যখন আল্লাহ্ তা'আলা তাদের পাকড়াও করবেন, তখন তাদের এসব ধন-ঐশ্বর্য, আরাম-আয়েশ, প্রভাব-প্রতিপত্তি সবই বৃথা হয়ে যাবে। তাদেরকে দোযখের জ্বলন্ত আগুনে নিক্ষেপ করা হবে। আখিরাতের পাশাপাশি তাদের দুনিয়াকেও দোযখের ন্যায় বানিয়ে দেওয়া হবে। তাদের পরিণাম ও ঠিকানা হবে অত্যন্ত নিকৃষ্ট।

অসংখ্য লোক এমন ছিল, যখনই তারা ক্ষমতা দখল করতে পেরেছে, সাথে সাথে দম্ভ ও অহংকার করা আরম্ভ করে দিয়েছে। এমনকি তাদের আত্মবিশ্বাস এতই তুঙ্গে উঠে যে, নিজেদেরকে খোদা বলে মনে করতে থাকে। গোটা দুনিয়ায় সে যেন এক বড় প্রভু। কিন্তু তাদের এমন ভয়াবহ পরিণতি হয়েছে যে, তাদেরকে কেবল সেই মিথ্যা প্রভুর আসন থেকেই অপসারণ করা হয় নি, বরং এই দুনিয়ার মানুষ তাদেরকে ফাঁসিতে ঝুলিয়েছে। অত্যন্ত রূপে লাঞ্ছিত ও অপমানিত করা হয়েছে। করে দেওয়া হয়েছে নিশ্চিহ্ন ও নিরাকার। এমন ধরনের ক্ষমতার নেশায় বিভোর কোন অলীক ও স্বকল্পিত প্রভুকে নিয়ে কবি বলেছেন :

تم سے پہلے بھی کوئی شخص یہاں تخت نشیں تھا
اس کو بھی خدا ہونے کا اتنا ہی یقین تھا

–তোমার আগে আরো কেহ এই আসনে বসা ছিল,
তোমার মত তারও মনে 'খোদা' হওয়ার সাধও ছিল।

[১] সূরা: আলে ইমরান, ৩: ১৯৬।

তোমাদের নামে কোন উপাখ্যানও হবে না!

ক্ষমতার নেশায় বিভোর যেসব ক্ষমতাসীন এজিদী ও ফেরাউনী পন্থা অবলম্বন করেছে, খণ্ডকালীন সময়ের ক্ষমতার নেশায় দাম্ভিক হয়ে উঠেছে এবং চাল-চলনে অহম্ভাব পোষণ করেছে, তাদের মনে রাখা দরকার যে, দুনিয়ার এই ক্ষমতা ও নেতৃত্ব দীর্ঘস্থায়ী সাফল্য নয়। মহান আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে এ তো তোমাদের জন্য শৈথিল্য প্রদর্শনই মাত্র। যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র দীনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে, খোদায়ী শক্তিকে পদদলিত করার অলীক ও বৃথা প্রচেষ্টা চালায় আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে তাদের প্রতি শৈথিল্য প্রদর্শন করা হয়। তারা যেন জুলুম ও বদ-বখ্‌তিতে শেষ পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছায়। অতএব, যখনই তাদের শাস্তির সময় হয়, সাথে সাথে তাদের উপর আল্লাহ্‌র আজাব ও শাস্তি নেমে আসে। তাদেরকে লণ্ডভণ্ড ও ধূলিসাৎ করে দেওয়া হয়। এমনকি ভবিষ্যৎ প্রজন্মের মধ্যে তাদের নাম নেবার মতও আর কেউ থাকে না।

যেই এজিদ কিয়ৎ দিনের দুনিয়ার শাসন ও ক্ষমতার দম্ভে নিজের ঈমান নিয়ে বাণিজ্যে মেতে উঠে নবী-বংশের উপর অন্যায়, অবিচার ও নির্যাতন চালায়, কারবালার তপ্ত মরুভূমিতে ক্ষুধা ও পিপাসার্ত নবী-পরিবার ও তাঁদের আনসারগণের মধ্য থেকে শহীদ করে বাহাত্তর জন সদস্যকে, সেই এজিদের ভাগ্যে এমন সময়ও আসে যে, সকল মানুষ তার বিরুদ্ধে বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। শুধু তাই নয়, বাহাত্তরজন আনসার সদস্যের বিপরীতে হত্যার শিকার হতে হয় এজিদ পক্ষীয় প্রায় একলক্ষ সত্তর হাজার ব্যক্তিকে।

যেই এজিদ পবিত্র মদীনা মুনাওয়ারায় ঘোড়া ও উটের বাহিনী প্রেরণ করেছিল, তিনদিন ধরে মসজিদে নববী ও রাসূলের পাক রওজার উপর তার বাহিনীর ঘোড়াগুলো বেঁধে রেখেছিল। তিনদিন ধরে মসজিদে নববীতে জামাতও হতে দেয় নি, নামাজও পড়তে দেয় নি। সেই এজিদের ভাগ্যে এমন সময়ও এসেছিল যে, তার কবরের উপর বাঁধা হয়েছিল ঘোড়া ও উট। ওসব জন্তুর প্রস্রাব ও বিষ্ঠায় ভরপুর হয়েছিল তার কবর।

হযরত ইমাম হোসাইন এবং তাঁর পরিবারের সকল সদস্য শহীদ হয়ে গেছেন, কিন্তু ইসলামকে শহীদ হতে দেন নি, বরং ইসলামকে নব-জীবনই দান করে গেছেন। নিজেরা জীবন দিয়ে গেছেন, কিন্তু উম্মতকে জীবন শিক্ষা দিয়ে গেছেন।

শাহাদাতে-হোসাইনের উদাত্ত আহ্বান :

হযরত ইমাম হোসাইনের শাহাদাত আমাদেরকে দুই ধরনের আহ্বান করে থাকে। যথা–

১. আমলের প্রতি আহ্বান এবং
২. শান্তি ও নিরাপত্তার প্রতি আহ্বান

আমলের আহ্বান :

শাহাদাতে-ইমাম হোসাইনের প্রথম আহ্বান হল আমলের। হোসাইনের প্রেম ও শ্রদ্ধাকে, হোসাইনের সম্পর্ককে, হোসাইনের সম্পৃক্ততাকে কেবল রীতি-নীতির মধ্যে সীমিত রেখে দিলে চলবে না। বরং তাকে আমলে আনতে হবে, বাস্তবায়িত করতে হবে। জীবনের বাস্তবতায় সেটিকে চরিত্রায়িত করে নিতে হবে। এই সম্পর্ক ও সম্পৃক্ততাকে আমাদের জীবনের সাথে একাকার করে নিতে হবে। উদ্দেশ্য, এই বিষয়টি জানা যে, এজিদী কর্মকাণ্ড আর হোসাইনী আদর্শে পার্থক্য কোন্ জায়গায়?

এজিদ ইসলামকে প্রকাশ্যে অস্বীকার করে নি। সে মূর্তিও পূজা করে নি। মসজিদও ধ্বংস করে নি। সে ইসলামের কথা বলত। ইসলামের পক্ষেই বাইয়াত করাত। সে নিজেও বলত যে, সে নামাজ পড়ে। ইসলামের প্রকাশ্য অস্বীকৃতি আবু লাহাবের কাজ। এজিদী মতাদর্শ হচ্ছে মুখে থাকবে ইসলামের নাম, অথচ প্রতারণা করবে ইসলামের সাথে। মুখে বলবে ইসলামের কথা, অথচ আমানতও খেয়ানত করবে। মুখে থাকবে ইসলামের কথা, অথচ চাপিয়ে দেবে রাজতন্ত্র। কারো কোন আপত্তির সামান্য আভাস পেলেই তাকে দমন করবে। ইসলামের পবিত্র নামগুলোকে পদদলিত করবে। এজিদী মতবাদ হচ্ছে ইসলামের সাথে মুনাফিকী, প্রবঞ্চনা ও ধোঁকাবাজি। ইসলামী শাসন ব্যবস্থার বিপক্ষে প্রতারণা করা, আমানত খেয়ানত করা, বাইতুল মালের খেয়ানত করা এবং জাতীয় কোষাগার ও ধন-ভাণ্ডার নিজের আয়েশীতে ব্যয় করার নামই হচ্ছে এজিদিয়ত বা এজিদী মতবাদ।

হযরত ইমাম হোসাইনের পবিত্র আত্মা আজও আমাদের ডাক দিয়ে বলছে, হে আমার ভালবাসায় যারা হৃদয়কে ভরপুর রেখেছ! আমি দেখতে চাই, তোমাদের ভালবাসা কি কেবল মুখের বুলি, না কি আমার ভালবাসায় উদ্বুদ্ধ হয়ে নতুন নতুন কারবালা সৃষ্টি করে যাচ্ছ! আমি দেখতে চাই, আমার ভালবাসায় তোমাদের মুখে এজিদের প্রতি ধিক্কার-বাণী উচ্চারিত হচ্ছে কি না! হোসাইনের

আত্মা আজ আবারও ফোরাত নদীকে রক্তে রঞ্জিত দেখতে চায়! আজ আবারও নতুন করে কারবালা দেখতে চায়! তোমাদের ধৈর্য্য ও দৃঢ়তার পরীক্ষা নিতে চায়! হোসাইনের আত্মা দেখতে চায়, তোমাদের কে আজ ইসলামের ঝাণ্ডাকে আপন হাতে উঁচিয়ে ধরে ধন-মন-প্রাণ উজাড় করে বাজি ধরছে! কে আছ যে আমাকে প্রকৃত ভালবাস!

নিরাপত্তার আহ্বান :

ঈমানদারদের জন্য হোসাইনী শাহাদাতের দ্বিতীয় আহ্বানটি হল শান্তি ও নিরাপত্তার আহ্বান। বড়ই পরিতাপের বিষয় যে, যখন নবী-দৌহিত্রের শাহাদাতের মাসটি আগমন করে, তখন পাকিস্তানসহ সমগ্র মুসলিম জাতির উপর যেন দাঙ্গা-হাঙ্গামা আর ফসাদের এক হুমকি এসে উপস্থিত হয়। চতুর্দিকে চলতে থাকে গোলা-গুলি, কার্ফ্যু, হত্যাযজ্ঞ, পরস্পর গলা কাটাকাটি, যুদ্ধ আর ফিতনা-ফসাদের এক তাণ্ডব! অমুসলিমদের কাছে মুসলিম জাতি যেন হাসি-ঠাট্টার খোরাকে পরিণত হয়। তাদের দৃষ্টিতে মুসলিমরা যেমন তাদের রাসূলের উপর একমত নয়, তেমনি সাহাবা ও আহ্লে-বাইতদের প্রতিও প্রকৃত ভালবাসা রাখে না, তারা না কুরআনে একমত, না ইসলামে, বরং এরা এমন এক জাতি যারা শান্তি আর নিরাপত্তাতেই বিশ্বাসী না। অতএব, আমরা কোন মুখে কাফের-জগতে ইসলামের কথা বলি, তাদের ইসলামের প্রতি দাওয়াত দিই!

সুন্নী-শিয়া বিরোধে মিলমিশের পথ :

বর্তমান বিশ্বে এই বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও অগ্রবিবেচ্য যে, সুন্নী এবং শিয়াদের মধ্যেকার মতবৈষম্যটির কীভাবে মিলমিশ করে দেওয়া যায়। তাহলে মুসলিম উম্মাহ্র মাঝে একতা, সৌহার্দ্য ও ঐক্যের মনোভাব সৃষ্টি হবে!

মুসলিম উম্মাহ্র মাঝে একতা, সৌহার্দ্য ও ঐক্যের মনোভাব সৃষ্টি করা এবং একে ধ্বংস ও বিনাশ থেকে রক্ষা করার জন্য প্রয়োজন সুন্নী ও শিয়াদের মধ্যেকার মতবৈষম্য সহনশীল পর্যায়ে থাকা। বর্তমান বিশ্বে যেহারে মুসলিম উম্মাহ্র পরস্পর সৌহার্দ্য ও ঐক্যকে ভেঙে চুরমার করে দেওয়া হচ্ছে এবং সুন্নী-শিয়া বিরোধকে ইন্ধন যোগিয়ে মুসলিম জাতিকে ধ্বংসের আস্তাকুঁড়ের দিকে নিক্ষেপ করা হচ্ছে, সেটির পরিণাম অত্যন্ত ভয়াবহ হবে, অপমানজনক

নবী-সম্পৃক্ততা ঃ ঈমানের মূল ও কেন্দ্রবিন্দু :

প্রিয় নবীর সাথে সম্পৃক্ততাই হচ্ছে ঈমানের মূল ও ঈমানের কেন্দ্রবিন্দু। পবিত্র কুরআনের ভাষায় :

مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ ۚ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ ۖ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا ۖ

–মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আল্লাহ্র রাসূল। আর যারা তাঁর সাথে সম্পৃক্ত, তারা কাফেরদের উপর বজ্রকঠোর, নিজেদের মাঝে অত্যন্ত অনুগ্রহশীল। তুমি (তোমরা) তাদের দেখবে অতিশয় রুকূ ও সেজদাকারী রূপে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে করুণা ও সন্তুষ্টির অন্বেষায়।[১]

আয়াতটিতে সংক্ষেপে ও ইঙ্গিতে সাহাবায়ে কেরাম ও পবিত্র আহ্লে-বাইতগণের কথা বলা হয়েছে। এ কথা বুঝতে হবে যে, মহান আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর পবিত্র কালামে ঈমানের মূল ও কেন্দ্রবিন্দু এবং মুসলমানদের পরিচিতির জন্য যে সম্পর্কটিকে একমাত্র সম্পর্ক ও শীর্ষসম্পর্ক হিসাবে নির্ধারণ করেছেন, তা হল 'মোহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ্'– 'মুহাম্মদ আল্লাহ্র রাসূল'। তাঁর আলোচনাকে ইসলাম ও ঈানের মূল ও কেন্দ্রবিন্দু হিসাবে আনা হয়েছে। এর পর যাঁদের আলোচনা এসেছে, মুফাসসিরীনদের মতানৈক্যের ভিন্নতায় তাঁরা হলেন সাহাবায়ে কেরাম, আহ্লে-বাইত, ও খোলাফায়ে রাশেদীন। অথবা সেই তাফসীরও উদ্দেশ্য হতে পারে, যা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত করেছেন। আর সেটিও যা শিয়ারা করেছেন। এই দুই তাফসীর মতে সাহাবায়ে কেরাম, পবিত্র আহ্লে-বাইত, খোলাফায়ে রাশেদীন যা-ই উদ্দেশ্য হোক না কেন, তাঁদের ব্যাপারে এই 'যারা তাঁর সাথে সম্পৃক্ততা রাখে' কথাটি ব্যক্ত করা হয়েছে। কথাটি কি এই বিষয়টির প্রতি ইঙ্গিত করছে না যে, যাঁরাই মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে সম্পৃক্ত, যাঁদেরই তাঁর সাহচর্য অর্জিত হয়েছে, সঙ্গ লাভ ঘটেছে, তাঁদের শান হচ্ছে, তাঁরা কাফের ও দীনের দুশমনদের বিরুদ্ধে বজ্রকঠোর, নিজেদের মধ্যে কোমল-হৃদয়, অত্যন্ত প্রীতিময় ও মহানুভব।

১. সূরা: ফাতাহ্, ৪৮: ২৯।

তাঁদের এই অবস্থা তো মুমিনদের সাথে আর কাফেরদের জন্য। কিন্তু রাতের একাকীত্বে তাঁরা কেমন? আপাদমস্তক সঁপে দিয়ে দুই হাত বেঁধে ঠায় দাঁড়িয়ে আছেন! মওলার দরবারে বিনয়ের আদর্শ হয়ে সর্বাঙ্গে সেজদাবনত হয়ে আছেন! এবাদত ও আনুগত্যের জাজ্বল্যমান আদর্শ রূপ পরিদৃষ্ট হন! মওলাকে সর্বতোভাবে সন্তুষ্ট রাখার মহা ধ্যানে মগ্ন থাকেন তাঁরা। তাঁরা সদা প্রস্তুত কখন আল্লাহ্‌র দীদার নসীব হয়! কখন তাঁর সান্নিধ্য লাভ হয়! তাঁর অনুগ্রহ আর সন্তুষ্টি কখন আসে!

এই চরিত্র, এই বৈশিষ্ট্য, এই গুণ ও এই অভ্যাস সবই পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান ছিল সাহাবায়ে কেরাম, খোলাফায়ে রাশেদীন ও পবিত্র আহ্‌লে-বাইতগণের মাঝে। মহান আল্লাহ্ তা'আলা সেই পূতাত্মাগণের পরিচিতি পবিত্র কুরআনে পাকের ভাষায় 'আর যারা তাঁর সাথে সম্পৃক্ত' দিয়ে ব্যক্ত করেছেন। অর্থাৎ তাঁদের সকলেরই পরিচিতি এই যে, তাঁরা নবী-পাকের সাথে সম্পৃক্ত থাকবেন। অপরাপর লোকদের সাথে তাঁদের পার্থক্য যে, তাঁদের সাথে নবীর দেখা-সাক্ষাৎ ও সঙ্গ অর্জিত হয়েছে। মোটকথা, তাঁরা তো তখনই সাহাবা হয়েছেন, যখন নবীর সঙ্গ লাভে ধন্য হতে পেরেছেন। তাঁরা যদি নবীর সঙ্গ লাভ না করতে পারতেন, অন্য যা কিছুই হতেন না কেন, সাহাবা হতে পারতেন না। তাঁরা তখন আলেম, ফাজেল, শহীদ, গাজী, আবেদ, মুত্তকী, পরহেজগার সব কিছুই হতে পারতেন। অনেক অনেক মর্যাদা, মর্তবা ও পূর্ণতা অর্জন করতে পারতেন, কিন্তু নবী-সঙ্গ অর্জিত না হওয়ার কারণে সাহাবিয়তের মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হতে পারতেন না।

পবিত্র আহ্‌লে-বাইত ও সাহাবায়ে কেরামের পরিচিতি ঃ নবী সম্পৃক্ততার দিক থেকে

উক্ত আয়াতে মহান আল্লাহ্ তা'আলা নবী পাকের রিসালাতের কথা ব্যক্ত করার পর তাঁর সঙ্গ অবলম্বনকারীদের বৈশিষ্ট্যের কথা বর্ণনা করেছেন। এভাবে যে, যাঁরাই নবী পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহচর্যে এসেছেন, তাঁদের এমন এমন বৈশিষ্ট্যাবলি রয়েছে। এতে করে যেন পবিত্র কুরআন একটি নীতিমালাই নির্ধারণ করে দিল যে, আহ্‌লে-বাইত হোক বা সাহাবায়ে কেরাম, যাঁরই যে মর্যাদা আর যোগ্যতা অর্জিত হয়েছে তা কেবল নবী-সঙ্গের কারণেই অর্জিত হয়েছে, তাঁরই সদকায় হয়েছে এবং তাঁরই গোলামীর কারণেই হয়েছে। এ ছিল নবী পাকের সঙ্গ, সাহচর্য ও গোলামীরই সুফল। হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হয়ে গেলেন সিদ্দীকে আকবর! হযরত ওমর

রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হয়ে গেলেন ফারূকে আযম! হযরত ওসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হয়ে গেলেন যুন্নুরাইন! হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হয়ে গেলেন হায়দারে কাররার! অতএব, সাহাবায়ে কেরাম ও আহ্‌লে-বাইত সকলেরই পরিচয় একটাই– নবী-সম্পৃক্ততা। অন্যভাবে বলতে গেলে, পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ্ তা'আলা এ কথা বুঝাতে চান যে, তোমরা সবাই আমার প্রিয় নবীর খাতিরেই সাহাবাদের সাথে আদব রক্ষা করবে। আহ্‌লে-বাইতের ইজ্জত-সম্মানও করবে আমার প্রিয় মাহবুবের খাতিরেই। সাহাবাদের প্রতি ইজ্জত, সম্মান, মর্যাদা, আদব, হায়া সবকিছু যেমন নবী-সম্পৃক্ততার কারণে করতে হয়, অনুরূপ পবিত্র আহ্‌লে-বাইতগণের প্রতিও ইজ্জত, সম্মান, মর্যাদা, আদব, হায়া সবকিছুও নবী-সম্পৃক্ততার কারণেই করতে হয়!

যারা নবী পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে ঈমান রাখে এবং অন্তরে তাঁর ভালবাসা পোষণ করে, তাদের উচিত সাহাবায়ে কেরাম এবং পবিত্র আহ্‌লে-বাইতগণের সাথেও অকৃত্রিম ভালবাসা পোষণ করা, রাসূলের প্রতি সম্মানবোধের কারণে সাহাবা ও আহ্‌লে-বাইতগণের প্রতিও সম্মানবোধ রাখা। নবী পাকের কারণে কেউ যেমন সাহবাদের এড়িয়ে চলতে পারে না, তেমনি পবিত্র আহ্‌লে-বাইতগণকেও পাশ কাটার কোন সুযোগ নাই!

পবিত্র আহ্‌লে-বাইত ও সাহাবায়ে কেরামগণের সাথে সমান সম্পর্ক :

সূরা ফাতাহ্‌র 'যারা তাঁর সাথে সম্পৃক্ত' শব্দগুলো এই বিষয়েরই ইঙ্গিত বহন করে যে, পবিত্র আহ্‌লে-বাইত ও সাহাবায়ে কেরাম উভয়ের সাথেই সমভাবে সম্পর্ক রাখতে হবে। যে ব্যক্তি নবী-সম্পৃক্তদের কারো সাথেই সম্পর্ক ছিন্ন করবে, চাই তিনি হোন সাহাবী বা আহ্‌লে-বাইত, সে যেন নবী পাকের সাথে অর্ধেক সম্পর্ক নষ্ট করে দিল, অর্ধেক ঈমানকে পক্ষাঘাতদুষ্ট করে নিল। অতএব, কেউ যদি নবী পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে পরিপূর্ণ ও পূর্ণাঙ্গ রূপে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করতে ও রাখতে চায়, এবং ঈমানকে মজবুত রাখতে চায়, সে যেন পবিত্র আহ্‌লে-বাইত ও সাহাবা উভয়ের ভালবাসা, সম্মান ও ইজ্জত সমভাবে রক্ষা করে চলে।

উম্মতদের শ্রেণিবিভেদ :

বড়ই দুর্ভাগ্য বশতঃ ইতিহাস সামান্য এভাবেই হয়েছে যে, মুসলিম উম্মাহ্ বিভিন্ন শ্রেণিতে বিভাজিত হয়েই চলে এসেছে। একটি দল অবশ্য সব সময়

একই অবস্থানে থাকে, তারা ন্যায়-নীতি ও সমতার পথ কখনো পরিহার করে নি। অপর দুইটি দলের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হয়। একটি দল আহ্‌লে-বাইতের ভালবাসা ও সম্মানবোধে এতই এগিয়ে যায় যে, দস্তুরমত সাহাবা-বিদ্বেষী হয়ে যায়। পক্ষান্তরে অপরদল সাহাবাদের ভালবাসা ও সম্মানবোধে এতই এগিয়ে যায় যে, দস্তুরমত আহ্‌লে-বাইত-বিদ্বেষী হয়ে যায়। কেউ কেউ পবিত্র আহ্‌লে-বাইতগণের প্রতি বেশি ঝুকে যায়। সেই ঝুক তাদেরকে এতই অগ্রসর করে যে, সাহাবায়ে কেরামদের তবকার প্রতি গুরুত্ব ও সম্পর্ক তাদের দৃষ্টিই এড়িয়ে যেতে থাকে। ক্রমে তারা একতরফা সম্পর্ক গড়ে তোলার ক্ষেত্রে এত আগে বেড়ে যায় যে, সাহাবা কেরাম থেকে দূরেই সরে যায়। সম্পর্ক যখন কেটে গেল, তখন সাহাবায়ে কেরামদের প্রতি তাদের ভক্তি চলে গেল। তাদের মনে সাহাবাদের আদব, সম্মান ও ভালবাসা থাকল না, যা থাকা আবশ্যক ছিল। তারা যেন ঈমানের একটি অংশকেই গ্রহণ করে নিল, অপর অংশটিকে বাদ দিয়ে দিল। এই অবস্থাটির জন্ম দেয় সাইয়েদুনা হযরত আলী শেরে খোদা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হুর জীবনের শেষ প্রান্তের রাজনৈতকি অস্থির পরিস্থিতিতে বনু উমাইয়ার ক্ষমতাসীনরা এবং বিশেষ করে এজিদী বাহিনী কর্তৃক কারবালার যুদ্ধে পবিত্র আহ্‌লে-বাইতগণের সাথে জালেমী, ফাসেকী, বর্বরতা ও পৈশাচিক ব্যবহার।

এই দলটির দৃষ্টি যখন কেবল পবিত্র আহ্‌লে-বাইত ও রাসূল-পরিবারের দিকেই নিবদ্ধ হয়ে গেল, নবীর সাথে অপর সম্পর্কটি অর্থাৎ সাহাবাদের সম্পর্কটির কথা তারা যখন দৃষ্টি থেকে এড়িয়ে চলল, ক্রমে ক্রমে সাহাবায়ে কেরাম থেকে তাদের সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গেল, এমনকি তাদের মন-মানসিকতাও সাহাবা-বিদ্বেষী হয়ে গেল। তাঁদের মর্যাদা ও সম্মানবোধ মন থেকে মুছে গেল, তাঁদের ফযিলত ও পূর্ণতার কথা বেমালুম মন থেকে উধাও হয়ে গেল।

বিপরীতে কিছু লোক সাহাবায়ে কেরামের আলোচনাকে অনুরূপভাবে তুলে ধরল, যেভাবে এই দলটি পবিত্র আহ্‌লে-বাইতের বেলায় তুলে ধরেছিল। তারা তাদের মন-মানসিকতাকে কেবল সাহাবায়ে কেরামগণের আলোচনাতেই কেন্দ্রীভূত করে রাখল। ঐ দলের বিপরীতে তারা তাদের আন্তরিকতা, আগ্রহ ও মনের টান পবিত্র আহ্‌লে-বাইত থেকে কেটে নিয়ে কেবল সাহাবায়ে কেরামগণের আলোচনাতে মত্ত থাকে। এবং আহলে বাইতের আলোচনা বাদ দিতে থাকে। যেভাবে প্রথমদল কেবল আহ্‌লে বাইতকে ঈমানের অংশ বলে মনে করে নিজেদেরেকে কেবল সাহাবায়ে কেরামগণ থেকে সরিয়েই নেয় নি,

বরং তাঁদের সম্মান ও মর্যাবাবোধকেও ঈমানের অংশ নয় বলে মনে করত, অনুরূপ দ্বিতীয় দলটিও কেবল সাহাবায়ে কেরামগণের সাথে সম্পৃক্ত থাকাকেই ঈমান বলে মনে করে আর পবিত্র আহ্‌লে-বাইতগণের সাথে তাদের আন্তরিকতা ও আগ্রহ কেটে দিয়ে বসে।

এই বদ-নসীব উম্মতদের অবস্থা বর্তমানে এমন যে, এতে দুইটি দল এখন প্রকাশ্য রূপে পরস্পর বিরোধী হয়ে গেছে। এদের একটি দল এই ধারণাই দিয়ে যাচ্ছে এবং কয়েক প্রজন্ম থেকে এইভাবে মগজ-ধোলাই করছে যে, সুন্নী তারাই যারা কেবল সাহাবায়ে কেরামগণের কথাই বলবে। কেউ যদি হযরত আলী, হযরত হাসান, হযরত হোসাইন, হযরত ইমাম যাইনুল আবেদীন কিংবা অপর যে-কোন আহ্‌লে বাইতের কথা বলে, কারবালার ঘটনাকে বড় করে ফলাও করে, পবিত্র আহ্‌লে-বাইতগণের প্রতি ভালবাসা পোষণ করে, তাঁদের ফযীলতের কথা বলে, সাথে সাথে 'অভিযোগ' তোলা হয় 'এরা শিয়া', এরা শিয়াপন্থী কিংবা শিয়াভক্ত।

অনুরূপ অপর দলটিও এভাবে মগজ-ধোলাই চালায় যে, আহ্‌লে-বাইতের কথা যারা বলে তারাই পাকা মুমিন, সাচ্চা মুসলমান। সাহাবাদের কথা যারা বলে তারা মুসলমান নয়। এভাবে এই শ্রেণির লোকেরা কেবল আহ্‌লে-বাইতদের পক্ষ নিয়েছে, অন্য শ্রেণি নিয়েছে কেবল সাহাবায়ে কেরামদেরকে। এমনিভাবে এই উম্মাহ্‌টির উপর সম্পূর্ণ অবিচার করা হয় যে, এটিকে দুইটি ধড়ে বিভক্ত করে ফেলা হয়। নবী-সম্পৃক্ততা, নবীর গোলামী, ও নবীর সম্পর্ককে প্রত্যেক দলই নিজেদের সাথে বিশেষিত বলে ঘোষণা দিয়ে ঈমানকে দুই ভাগে বিভক্ত করার চেষ্টা করে। কেননা, আহ্‌লে-বাইতগণের সাথে সম্পর্ক ঈমানের একটি অংশ ছিল। সাহাবায়ে কেরামগণের সাথে সম্পর্ক ঈমানের অপর অংশ ছিল। উভয় শ্রেণির প্রত্যেকেই ঈমানের একটি অংশকে গ্রহণ করেছে, অন্যটিকে বাদ দিয়েছে।

দীন ইসলামে এর চেয়ে বড় কোন জুলুম হবে না যে, পবিত্র আহ্‌লে-বাইতের ভালবাসায় সাহাবায়ে কেরামগণের সাথে বেয়াদবি করা হবে। ইসলামে এর কোনই সুযোগ নাই। নিঃসন্দেহে আহ্‌লে-বাইতগণের ভালবাসা ঈমান। যে ব্যক্তির মনে আহ্‌লে-বাইতগণের ভালবাসা বিদ্যমান নাই, সে মুসলমান নয়। সে ইসলাম-বহির্ভূত, জাহান্নামের ইন্ধন। পবিত্র আহ্‌লে-বাইতের মহব্বত

অন্তরে বিদ্যমান না থাকা মানে সেই অন্তর ইসলাম, ঈমান, কুরআন ও নবী-সম্পৃক্ততা থেকে শূন্য থাকা।

যেমনিরূপ নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে সম্পৃক্ততার কারণে পবিত্র আহ্‌লে-বাইতগণ ঈমানের এই পর্যায়ে অবস্থান করছেন, অনুরূপ সাহাবায়ে কেরামগণও নবী করীমের সম্পৃক্ততার কারণে ঈমানে একই পর্যায়ে অবস্থান করছেন। অতএব, যে ব্যক্তি খোলাফায়ে রাশেদীনসহ সাহাবায়ে কেরামগণের কোন একজনের প্রতিও কোন ধরনের নাপাক মন্তব্য করে, চাই আহলে বাইতগণের প্রতি ভালোবাসার নামে করুক, কিংবা যে-কোনভাবে করুক, সে ব্যক্তি কখনও মুসলমান হতে পারে না। সে বে-ঈমন, অভিশপ্ত এবং জাহান্নামের ইন্ধন। সে কেবল সাহাবায়ে কেরামের, খোলাফায়ে রাশেদীনের কিংবা পবিত্র আহলে-বাইতের অস্বীকারকারীই নয়; বরং সে স্বয়ং নবী আখেরুজ্জামানেরই অস্বীকারকারী।

শ্রেণিগত বিরোধের ক্ষতিকর দিক :

নবী পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মতের দুইটি শ্রেণির এভাবে সীমালঙ্ঘনমূলক অতিরঞ্জন করার এবং এই শ্রেণিগত বিরোধের ক্ষতি স্বরূপ সাহবা ও আহ্‌লে-বাইতের মধ্যেকার যুদ্ধটি নবী-সম্পৃক্ততাকে বিস্মৃত করে দিয়েছিল। অতএব, যখন নবীর নাম আসে তখন একটি শ্রেণির মনকে সাহাবাদের কথায় আকৃষ্ট করতে পারে নি। অপরদিকে আরেক শ্রেণিকে আহলে-বাইতের কথায় উদ্বুদ্ধ করতে পারে নি। পরিতাপের বিষয় যে, মুর্খতার চরম না হলে এদের কোন শ্রেণিই এমন হবার কথা নয়। সাহাবাদের পরিচয়ও ছিল নবী পাকের সম্পৃক্ততার ভিত্তিতে। অনুরূপ পবিত্র আহ্‌লে-বাইতগণের পরিচয়ও ছিল নবী পাকেরই সম্পৃক্ততার ভিত্তিতে। কিন্তু আফসোসের বিষয় যে, উভয় শ্রেণির লোকেরাই সাহাবা ও আহলে-বাইতের একপক্ষকে প্রাধান্য দিয়ে অপরপক্ষের প্রতি যে বিদ্বেষ দেখাল তাতে তারা নবী-সম্পৃক্ততাকেই তো অস্বীকার করল! এ তো ভিত্তি ভেঙ্গে দিয়ে ভবন নির্মাণ করারই নামান্তর।

অতএব, যে নবী-সম্পৃক্ততা ও নবী-সম্পর্কই মূল বুনিয়াদ, প্রথমে সেটিকে মজবুত ও পোক্ত করাই আবশ্যক। সর্বপ্রথম নবী-সম্পৃক্ততার উপর আমাদের ঈমান মজবুত হওয়া দরকার। এভাবে যে, নবীর কথা তো ভাল লাগবেই, সেই সাথে নবীর সাথে যাঁদের সম্পৃক্ততা রয়েছে নবীর খাতিরে তাঁদের কথাও ভাল লাগতে হবে। ঈমানের মূল কেন্দ্রবিন্দু যখন নবী পাকের পবিত্র সত্তাই হয়ে

যাবে, তখন ঈমানের মানসিকতাও এমন হয়ে যাবে যে, যা আকা পছন্দ করবেন, তা তোমারও পছন্দ হবে, যা আকা অপছন্দ করবেন, তা তোমারও অপছন্দ হবে। এভাবে বন্ধুত্ব ও শত্রুতার মাপকাঠিও নবী পাকের সম্পৃক্ততার ভিত্তিতেই হবে। প্রত্যেকেরই ভুল ও ভ্রমের অপনোদান এভাবেই হয়ে যায় যে, প্রথমে আমরা নিজেদের ঈমানের মূল কেন্দ্রবিন্দু কী তা চেনার চেষ্টা করি।

আহ্‌লে-বাইত কারা?

আরবি ভাষায় গৃহকে 'বাইত' বলা হয়। গৃহ তিন প্রকারের :

১. বংশীয় গৃহ
২. বসবাসের গৃহ
৩. জন্মের গৃহ

এ দিক থেকে গৃহবাসী বা পরিবারেরও তিনটি শ্রেণি রয়েছে :

১. বংশীয় পরিবার
২. বসবাসের পরিবার
৩. জন্মের পরিবার

বংশীয় পরিবার :

বংশীয় পরিবার বলতে সেসব সম্পর্কের লোকজনদেরকেই বুঝায় যারা বংশের লোক। অর্থাৎ, যারা পিতা বা দাদার কারণে হয়ে থাকে। যেমন, চাচা, জেঠা, ফুফু সবাই বংশীয় সম্পর্কের লোক।

বসবাসের পরিবার :

বসবাসের পরিবার দ্বারা সেই সম্পর্কের লোকদেরকেই বুঝায় যারা নিজের বাসগৃহে বসবাস করে। যেমন, স্বামীর স্ত্রী।

জন্মের পরিবার :

জন্মের পরিবার দ্বারা সেই সম্পর্ককে বুঝায় যারা গৃহে জন্ম নিয়েছে। যেমন, পুত্র, কন্যা ইত্যাদি। পরবর্তীতে তাদের সন্তানগণও এতে অন্তর্ভুক্ত হবে।

যখন কেবল 'আহ্‌লে-বাইত' বলা হবে, তখন তা দ্বারা উপরিবর্ণিত তিনটি শ্রেণিকেই বুঝাবে। অবশ্য তারা যদি ঈমানদান হয়ে থাকে। এদের কোন একটি শ্রেণিকেও যদি বাদ দেওয়া হয়, তাহলে 'আহ্‌লে-বাইতে'র অর্থ পূর্ণ হবে না।

পবিত্র কুরআনে এরশাদ হচ্ছে :

إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ ٱلرِّجْسَ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا

–হে (নবীর) আহ্‌লে-বাইতগণ! আল্লাহ্ চান যে, তোমাদের নিকট থেকে দুষ্ট সবকিছু দূর করে দেবেন আর তোমাদেরকে খুব করে পূতঃপবিত্র করে দেবেন।[১]

অর্থাৎ, হে আমার নবীর পরিবারের সদস্যগণ! আমার ইচ্ছা, তোমাদের দামান, চরিত্র, কর্মকাণ্ড ও জাহেরী-বাতিনী আমলসমূহকে যে-কোন ধরনের দুষ্টতা ও পঙ্কিলতা থেকে পাক সাফ করে দিতে। এমনভাবে যে, তোমরা যেন মানবকুলের জন্য সর্বকালের নমুনা ও অনুসরণীয় হও। কেয়ামত পর্যন্ত পাকী ও পবিত্রতা যেন তোমাদের থেকে জন্ম নিতে থাকে।

পক্ষপাতিত্ব বাদ দিন!

মানুষ যখন পক্ষপাত দোষে দুষ্ট হয়ে যায়, তখন তার কাছে নিজের পক্ষের ছাড়া অন্য কিছু দৃষ্টিতেই আসে না। দীনে যখন পক্ষপাতিত্ব প্রবেশ করে, তখন প্রত্যেকে কেবল নিজেদের মতলবের কথাগুলোই বের করতে চায়। যেই দুই শ্রেণির লোক সাহাবা-প্রীতি ও আহ্‌লে-বাইত-প্রীতির অতিরঞ্জণে লিপ্ত রয়েছে, তাদের একটি শ্রেণি উপরিবর্ণিত আয়াতটির তাফসীর করতে গিয়ে তা থেকে নবী পাকের পবিত্র বিবিগণকে সরিয়ে দিয়েছে। এভাবে তারা আহ্‌লে-বাইতগণ হতে আহ্‌লে-বাইতে মসকন তথা বসবাসের আহলে-বাইতগণকেই সরিয়ে দিল। আহ্‌লে-বাইত থেকে বিবিগণই যখন বের হয়ে যান, তখন গৃহের সাথে সন্তানদের আর কী সম্পর্ক অবশিষ্ট থাকে? মোটকথা, তারা আহলে-বাইতগণকে বের করে দিয়ে বলে যে, আহলে-বাইত মানে তো কেবল হযরত আলী, হযরত ফাতেমা, হযরত ইমাম হাসান এবং হযরত ইমাম হোসাইনই।

নিঃসন্দেহে উক্ত চারজনও পবিত্র আহ্‌লে-বাইতে শামিল রয়েছেন। নবী পাক তাঁদেরকে স্বীয় পবিত্র চাদরে ঢেকেও নিয়েছেন। আহ্‌লে-বাইত নয় বলে তাঁদেরকে অস্বীকার করলে স্বয়ং নবীকেই অস্বীকার করা হবে। কিন্তু এই কথাই বুঝানো হচ্ছে যে, এই শ্রেণির লোকেরা আহ্‌লে-বাইত দ্বারা কিছু আহলে-

[১]. সূরা: আহযাব, ৩৩: ৩৩।

বাইতকে গ্রহণ করেছে, কিছু আহলে-বাইতকে বাদ দিয়েছে। এদের বিপরীতে অপর শ্রেণির লোকেরা বলে, আহ্‌লে-বাইত মানে কেবল নবী পাকের পবিত্র বিবিগণই। হযরত আলী, হযরত ফাতেমা, হযরত হাসান ও হযরত হোসাইন পবিত্র আহ্‌লে-বাইতে শামিল নন। উভয় শ্রেণির লোকেরাই যেন পবিত্র কুরআন শরীফকে স্কুলের হাজিরা খাতা বলে মনে করেছে, যাকে ইচ্ছা নাম লিখে দিল, যাকে ইচ্ছা নাম কেটে দিল। এরূপ মনগড়া ব্যাখ্যা দিয়ে দিয়ে তারা যেন মুসলিম উম্মাহ্‌কে শতধা বিভক্ত করে ফেলছে। অথচ সবাই উম্মত। তারা বরং নবী-সম্পৃক্ততাকেই প্রশ্নবিদ্ধ করে ফেলেছে।

বুঝতে তো হবে যে, যিনি গৃহস্থ তাঁর কাছে গৃহের প্রত্যেক সদস্যই তো প্রিয়জন। গৃহস্থ তো স্বয়ং নবী পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লামই। অতএব, যে সদস্যই নবীর সাথে বংশীয় সম্পর্ক রাখেন, তাঁর গৃহে বসবাস করেন এবং ঈমান রাখেন তাঁরা প্রত্যেকেই তো আহ্‌লে-বাইত। এঁদের প্রত্যেককেই তো ভালবাসতে হবে। নবীর সাথে বংশীয় সম্পর্ক রাখা, তাঁর গৃহের সদস্য হওয়া, তাঁর সন্তান হওয়া দূরে থাক, হযরত সালমান ফারেসী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু যিনি নবী পাকের সেবা করতেন, বাজার করে আনতেন, তাঁকেও তিনি নিজের আহলে-বাইতের অন্তর্ভুক্ত করে নিয়েছিলেন। অথচ তাঁর সাথে নবীর বংশীয় সম্পর্কও ছিল না, পরিবারভুক্তও ছিলেন না, তিনি তাঁর সন্তানও ছিলেন না। পরিবারভুক্ত হওয়ার তিন তিনটির একটিও বিদ্যমান ছিল না। তা সত্ত্বেও তিনি ঘরে আসা-যাওয়া করতেন, তাঁর সেবা-শুশ্রূষা করতেন বলে নবী পাক দয়ার হাত বাড়িয়ে তাঁকেও নিজের আহলে-বাইতের অন্তর্ভুক্ত করে নেন। স্বয়ং নবীই যেক্ষেত্রে নিজের আহলে-বাইতগণের কাউকেও পরিবার থেকে বাদ দেন নি, সেক্ষেত্রে ব্যক্তিবিশেষকে বের করে দিয়ে এসব শ্রেণির লোকেরা তাঁর সাথে কী ধরনের বিচার করছে? একে তো তাদের বিচারই বলা যায় না, বরং বলতে হয় কেবল মূর্খতা আর পক্ষপাতিত্বই।

সুন্নী ও শিয়া উভয় শ্রেণির লোকদের সমঝোতাকারী তথকথিত মৌলভী ও আলোচকদের অবস্থা এই যে, স্বয়ং তারাও না পরস্পরের মধ্যে বুঝাবুঝিতে আছে, না পরস্পরকে আহ্বান জানায়, না তারা একত্রিত হয়ে আন্দোলনে নেমেছে, বরং সাধারণ মানুষদেরকে বোকা সাজাবার জন্য বিভিন্ন সভা-সমাবেশে একে অন্যের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করে। বিরোধ আরো বাড়িয়ে তোলে। একে অপরের দোষারোপ করে, কাদা-ছুঁড়াছুঁড়ি করে।

ভাবনার বিষয় :

ভাবনার বিষয় যে, এতে কোন সন্দেহ নাই যে, যখনই প্রতিহত করার মানসে কোন কাজ হাতে নেওয়া হয়, তখন তাতে সুবিচার রক্ষা করা সম্ভব হয় না। তাতে বাড়াবাড়ি আর পক্ষপাতদোষ থেকে যায়। ইসলাম যে সমতা ও ন্যায়-নীতির শিক্ষ দিয়েছে, সে অনুযায়ী বিচার হয় না। ইসলামের মূল শিক্ষাই হল সাম্য ও ন্যায়-নীতি। মুসলিম উম্মাহ্‌কে মূলত এ কারণেই সাম্যের উম্মাহ্ বলা হয়ে থাকে যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে এমন স্বাতন্ত্র্য ও চরিত্র দান করেছেন, যা সাম্য ও ন্যায়-নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। যেমন, আল্লাহ্ তা'আলা এরশাদ করছেন :

وَكَذٰلِكَ جَعَلْنٰكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِّتَكُونُوا شُهَدَآءَ عَلَى ٱلنَّاسِ

–অনুরূপ আমি (হে মুসলমান) তোমাদেরকে মধ্যপন্থী উম্মত বানিয়ে দিলাম, যাতে তোমরা মানুষজনের সাক্ষী থাক।[১]

আয়াতটিতে আল্লাহ্ তা'আলা মুসলমানদের উদ্দেশ্য করে বলছেন, আমি তোমাদেরকে মধ্যপন্থী উম্মত বানিয়েছি। অর্থাৎ, জীবন চলার পথে যারা যে-কোন বিষয় ও ব্যাপারে মধ্যপন্থাই অবলম্বন করে। সোজা পথ থেকে নড়াচড়া করে না। পালায় যেমন সমানে সমানে দুইটি দিক থাকে। এতটুকু হেরফের হয় না। এই উম্মতেরাও সর্বদা সমানে সমান থাকে, হেরফের হয় না। এরা সাম্য ও ন্যায়-নীতি প্রতিষ্ঠা করে ও রাখে।

হযরত আলীর বাণী :

মধ্যপন্থা পরিহার করে যারা বাড়াবাড়ির পথ গ্রহণ করেছে, তাদের উদ্দেশ্যে শেরে খোদা হযরত আলীর এই ভাষণটি চাবুকের কাজ দেবে। তিনি বলেন, নবী পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বললেন, হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের সাথে তোমাদের একটি মিল রয়েছে। ইহুদীরা তাঁর সাথে বিদ্বেষ করত। তাঁর মাতার উপর অশ্লীলতার অপবাদ দিয়েছিল। অপরদিকে খ্রিষ্টানরা তাঁকে নিয়ে বাড়াবাড়ি করত। এমনকি তারা তাঁকে খোদাই বানিয়ে দিয়েছিল। তোমরা হুশিয়ার থাকিও! আমাকে নিয়েও দুই দল এভাবে ধ্বংস হয়ে যাবে!

১. সূরা: বাকারা, ৩: ১৪৩।

يُحِبُّ مُفْرِطٌ يُقَرِّظُنِي بِمَا لَيْسَ فِيَّ وَمُبْغِضٌ يَحْمِلُهُ شَنَآنِي عَلَى أَنْ يَبْهَتَنِي.

–অত্যধিক ভালবাসা দেখাতে গিয়ে একটি দল আমাকে নিয়ে এমনই অতিরঞ্জণে মেতে উঠবে, যা আমার মাঝে বিদ্যমান নাই। অপর দল বিদ্বেষভাব পোষণ করে আমার উপর অপবাদ আনবে।[১]

স্বয়ং শিয়া সম্প্রদায়েরই উল্লেখযোগ্য কিতাব 'নাহ্‌জুল বালাগা'তে হযরত আলী এরশাদ করছেন :

سَيَهْلِكُ فِيَّ صِنْفَانِ: مُحِبٌّ مُفْرِطٌ يُذْهَبُ بِهِ ٱلْحُبُّ إِلَىٰ غَيْرِ ٱلْحَقِّ، وَمُبْغِضٌ مُفْرِطٌ يُذْهَبُ بِهِ ٱلْبُغْضُ إِلَىٰ غَيْرِ ٱلْحَقِّ، وَخَيْرُ ٱلنَّاسِ فِيَّ حَالًا ٱلنَّمَطُ ٱلْأَوْسَطُ فَٱلْزِمُوهُ، وَٱلْزِمُوا ٱلسَّوَادَ ٱلْأَعْظَمَ، فَإِنَّ يَدَ ٱللهِ عَلَى ٱلْجَمَاعَةِ، وَ إِيَّاكُمْ وَٱلْفُرْقَةَ، فَإِنَّ ٱلشَّاذَّ مِنَ ٱلنَّاسِ لِلشَّيْطَانِ، كَمَا إِنَّ ٱلشَّاذَّ مِنَ ٱلْغَنَمِ لِلذِّئْبِ،

–আমাকে কেন্দ্র করে দুই শ্রেণির লোক ধ্বংস হয়ে যাবে। এক শ্রেণি যারা আমাকে ভালবাসবে। তারা করবে অতিরঞ্জণ। সেই ভালবাসা শ্রেণিটিকে অসত্যের দিকে ধাবিত করবে। অপর শ্রেণিটি বিদ্বেষ রাখবে। সেই বিদ্বেষ শ্রেণিটিকে সত্যের বিপরীতে নিয়ে যাবে। আর আমাকে নিয়ে যারা সুবিধাজনক অবস্থানে থাকবে, তারা হবে মধ্যপন্থা অবলম্বনকারী। অতএব, মধ্যপন্থীরা যেন 'সাওয়াদে আযম'[২]-এর সাথে সম্পৃক্ত থাকে। কেননা, আল্লাহ্‌র সাহায্য সেই দলটির উপরই। সাবধান! এই দলটি থেকে কখনো বিচ্ছিন্ন হবে না। কেননা, যে ব্যক্তি এই দলটি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে, দল থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া ছাগল যেমনরূপ বাঘের শিকার হয়, সেও অনুরূপ শয়তানের শিকার হবে।[৩]

আহ্‌লে-বাইত ও সাহাবাদের প্রতি বিদ্বেষের আলামত :

আজ যারা আলীর ভালবাসায় বাড়াবাড়ির কারণে সমভাবাপন্নতা থেকে দূরে সরে পড়েছে আর যারা আলীর প্রতি বিদ্বেষ পোষণের কারণে সমভাবাপন্নতা হারিয়ে ফেলেছে, অর্থাৎ যারা আলীর ভালবাসা এবং আহ্‌লে-বাইতের

১. মিশকাতুল মাসাবীহ্, বিহাওয়ালায়ে আহমদ, ৫৬৫।
২. 'সাওয়াদে আযম' মানে বড় দল বা বড় জামাত। এ দ্বারা আহ্‌লে সুন্নাত ওয়াল জামাতকেই বুঝানো হয়েছে।
৩. অনুবাদ ও ব্যাখ্যাসহ নাহ্‌জুল বালাগাত, ১ম খণ্ড।

ভালবাসার নামে অন্তরে সাহাবার প্রতি বিদ্বেষ রাখে, আর যারা সাহাবায়ে কেরামদের ভালবাসার নামে অন্তরে আলীর প্রতি বিদ্বেষ ও আহ্‌লে-বাইতের প্রতি বিদ্বেষ কিংবা আহ্‌লে-বাইতের প্রতি ভালবাসার নামে অন্তরে সাহাবাদের প্রতি বিদ্বেষ পালন করে তাদের কেহই এই কথাটি মেনে নিতে প্রস্তুত হবে না, মুখেও শিকার করবে না যে, তারা আহ্‌লে-বাইতের প্রতি ভালবাসার নামে অন্তরে সাহাবাদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে কিংবা সাহাবায়ে কেরামদের ভালবাসার নামে আহলে-বাইতের প্রতি বিদ্বেষ পালন করে।

যে ব্যক্তি এই দুই শ্রেণির যে-কোন একটির সাথে সম্পর্ক রাখে, তার কাছে মুখে স্বীকারোক্তি না নিলেও অন্যভাবে সহজ উপায়ে সেটির পরিচয় হয়ে যায়। আপনি ব্যক্তিটির সামনে সাহাবাদের প্রশংসা করবেন। কিছুক্ষণ পর্যন্ত করতে থাকবেন। যখন দেখবেন, সে মাথা চুলকাচ্ছে, মন বিষিয়ে উঠছে, আপনার কথায় আনন্দ পাচ্ছে না, তখন বুঝে নিন যে, সে হযরত আলীর ভালবাসায় বাড়াবাড়ির কারণে সত্য পথ হারিয়ে বসেছে। অনুরূপ কারো সামনে যখন হযরত আলী, ইমাম হোসাইন এবং আহ্‌লে-বাইতের আলোচনা করা হয়, তখন তার চেহারা-সূরত বিবর্ণ দেখালে, তাকে অস্থির দেখালে বুঝে নেবেন, লোকটির সম্পর্ক সেই শ্রেণিরই সাথে যে শ্রেণিটি হযরত আলীর প্রতি বিদ্বেষের কারণে সত্য পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে গেছে।

কারো ব্যাপারে সন্দেহ হলে কিংবা কাউকে পরখ করতে হলেই এরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হয় যে, লোকটি কোন্ শ্রেণির সাথে সম্পর্ক রাখে! কিন্তু বর্তমানে পরিবেশ-পরিস্থিতি অত্যন্ত প্রচ্ছন্ন। এতকিছু করে পরীক্ষা-নীরিক্ষা করতে হয় না। বর্তমানে কোন শ্রেণিকেই চিনতে তেমন বেগ পেতে হয় না। আমরা এখন পরিষ্কার দেখতে পাই যে, একশ্রেণির লোকজন সারা বৎসরই ইজতিমা করে থাকে কেবল সাইয়েদুনা ইমাম হোসাইন এবং পবিত্র আহ্‌লে-বাইতগণকে কেন্দ্র করে। এই শ্রেণির লোকেরা কখনো কোন সীরাতুন্নাবীর অনুষ্ঠানও করে না, সাহাবায়ে কেরামগণের আলোচনা সংক্রান্তও কোন অনুষ্ঠান করে না। শুধু আহলে-বাইত ব্যতীত তারা অন্য সকলের সম্পর্ক ছিন্ন করে দিয়েছে। অপর শ্রেণির লোকজন সারা বৎসরই সাহাবায়ে কেরামদের প্রশংসাকে কেন্দ্র করে অনুষ্ঠানাদি করে থাকে। তারা পবিত্র মুহররম মাসেও এবং ইমাম হোসাইনের শাহাদাতের দিনটিতেও কখনো আহলে-বাইত কিংবা শাহাদাতে কারবালা নিয়ে আলোচনা-অনুষ্ঠানের আয়োজন করে না। প্রথমশ্রেণির লোকজন যেমন আহ্‌লে-বাইত ছাড়া অন্যসব বাদ দিয়ে ফেলেছে, অনুরূপ দ্বিতীয়শ্রেণির

লোকজনও কেবল সাহাবায়ে কেরাম ব্যতীত সকল বিষয়কে পাশ কেটে চলতে আরম্ভ করেছে। উভয় শ্রেণিই এড়িয়ে চলা নীতি ধরেছে, মধ্যপন্থা অবলম্বন কোন দলই করছে না।

সাহাবা ও আহ্‌লে-বাইতের সম্পৃক্ততা নবী পাকের সাথে :

আমরা যদি নবী পাকের সাথে সাহাবায়ে কেরাম ও আহ্‌লে-বাইতের সম্পৃক্ততার কথা ভেবে দেখি, দেখতে পাই যে, তাঁদের কোন অংশই কোনখানে নবীর জন্য প্রাণ উৎসর্গ করতে পিছপা হন নি। নিচের ঘটনাটি থেকে তা বুঝতে পারবেন।

নবী পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেই রাতে মক্কা থেকে মদীনায় হিজরত করলেন, সেই রাতে মক্কার কাফেরগণ নাঙ্গা তরবারি হাতে তাঁর গৃহকে চতুর্দিক থেকে ঘিরে রেখেছিল। আল্লাহ্ তাঁকে হিজরতের হুকুম দিলেন। অধিকাংশ মুসলমানই তখন হিজরত করে মদীনা চলে গিয়েছিলেন। কিন্তু হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হু এবং হযরত আলী তখনও হিজরত করেন নি। নবী পাক ভাবলেন, আল্লাহ্‌র হুকুমে হিজরত করার পূর্বে মানুষ-জনের আমানতগুলো যে তাদের হাতে তুলে দিতে হয়! তিনি মনে মনে এ কাজের জন্য হযরত আলীকেই নির্বাচন করলেন। অতএব, তিনি হযরত আলীকে বললেন, আমি মদীনায় হিজরত করতে চাই। তুমি আমার বিছানায় শুইও। আমার উপর কিছু লোকের যে আমানত রয়েছে, সেগুলো তুমি তাদের কাছে ফিরিয়ে দিয়ে তারপরই যেও।

সেই রাতে নবী পাকের পবিত্র বিছনাটি ছিল কাফেরদের টার্গেট। তাঁর বিছানায় শোয়া মানে নবীর উপর জান কুরবান করে দেবারই নামান্তর। ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী 'তাফসীরুল কবীরে' এবং হুজ্জতুল ইসলাম ইমাম গাজ্জালী 'ইহিয়াউল উলুমে' উল্লেখ করেছেন, হিজরতের রাতটিতে নবী পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন হযরত আলী কাররামাল্লাহু ওয়াজহাহুকে নিজের বিছানা মোবারকে শুইয়ে দিয়ে চলে গেলেন, আল্লাহ্ তা'আলা হযরত জিবরাঈল ও মীকাঈল আলাইহিমাস সালামকে বললেন, দেখ! আমি আমার হাবীবের উপর নিজের জান উৎসর্গ করে দিচ্ছে। তোমরা জাও, সারা রাত তাঁকে তোমরা হেফাজত করিও। আল্লাহ্‌র হুকুমে ফেরেশতা দুইজন এলেন।

قَامَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ عِنْدَ رَأْسِهِ، وَمِيكَائِيلُ عِنْدَ رِجْلَيْهِ، وَجِبْرِيلُ يُنَادِي: بَخٍ بَخٍ مَنْ مِثْلُكَ يَا ابْنَ أَبِي طَالِبٍ يُبَاهِي اللهُ بِكَ الْمَلَائِكَةَ وَنَزَلَتِ الْآيَةُ. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللهِ وَاللهُ،

–হযরত জিবরাঈল আলাইহিস সালাম মাথার দিকে এবং হযরত মীকাঈল আলাইহিস সালাম পায়ের দিকে দাঁড়িয়ে গেলেন। জিবরাঈল আমীন সানন্দে বড় আওয়াজে বললেন, 'হে আবু তালিবের পুত্র! আজ কে হতে পারে তোমার মত! আল্লাহ্ আজ ফেরেশতাদের মাঝে তোমাকে নিয়ে গৌরবে ফেটে পড়েছেন!' এর পর এ আয়াতটি নাযিল হল:

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللهِ،

'মানুষদের মধ্যে এমনও রয়েছে, যে নিজের প্রাণকে আল্লাহ্র রেজামন্দি অন্বেষায় বিকিয়ে দেয়।'[১]

মদীনায় হিজরতের রাতে হযরত আলী কর্তৃক নবী পাকের বিছানায় শয়ন করা হযরত আলীর যারপরনাই বিসর্জন, বীরত্ব ও সৌর্য-বীর্যেরই প্রমাণ বহন করে। এদিকে একই রাতে হযরত সাইয়েদুনা আবু বকর সিদ্দীকের বিসর্জনভাবটিও লক্ষ্য করার বিষয়! তিনিও এক অনুপম উপমাই স্থাপন করেছেন। হযরত আবু বকর সিদ্দীক নবী পাকের সফরসঙ্গী ছিলেন। তাঁর এ কাজটি কাফের ও মুশরিকদের চোখে এত বড় অমার্জনীয় অপরাধ ছিল যে, এর সাজা স্বরূপ তারা তাঁকে শহীদই করে দিত!

হাদিসের কিতাবাদিতে এসেছে, মদীনা হিজরতের নির্দেশ আসার পর অধিকাংশ মুসলমান মদীনায় হিজরত করেন। হযরত আবু বকর সিদ্দীকও হিজরতের সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন করে ফেলেন। তখন নবী পাক তাঁকে বললেন, তুমি একটু অপেক্ষা কর। আমারও অনুমতি মিলতে পারে। হযরত আবু বকর বললেন, আমার পিতা-মাতা আপনার উপর কুরবান, আপনিও কি হিজরতের আশা করেছেন? তিনি বললেন, হাঁ। সাথে সাথে তিনি রাসূলের সাথে সফর করার মানসে নিজের সফরের ইচ্ছা তখনকার জন্য মুলতবি করে দিলেন। তাঁর কাছে

[১]. আত তাফসীরুল কবীর, ৫: ২২৩।

দুইটি উষ্ট্রী ছিল। তিনি সেগুলোকে চার মাস যাবৎ বাবলা গাছের পাতা খাইয়ে রেখেছিলেন।[১]

ইমাম হাসান আসকরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহ্ তাঁর তাফসীর-গ্রন্থে বর্ণনা করেন, হিজরতের রাতে নবী পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হুর গৃহের দরজায় টোকা দিলেন। হযরত আবু বকর বেরিয়ে এলেন। নবীকে দেখে বললেন, 'এয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনার উপর আমার পিতা-মাতা উৎসর্গীত, এই রাতে আপনি যে!' তিনি বললেন, 'আবু বকর! আমার উপর মদীনা হিজরতের নির্দেশ এসেছে। তুমিও কি আমার সাথে যেতে, আমার সাথে সব ধরনের কষ্ট সহ্য করতে প্রস্তুত আছ?' আবু বকর সিদ্দীক বললেন, 'এয়া রাসূলাল্লাহ্! একদিকে যদি সারা দুনিয়ার রাজত্ব হাতছানি দেয়, আর অন্যদিকে আপনার জন্য সারা জীবনের কষ্ট মাথা পেতে নিতে হয়, মহান আল্লাহ্র কসম, আপনার জন্য তড়পাতে তড়পাতে এই প্রাণ উৎসর্গ করে দেওয়াই আমার কাছে সারা দুনিয়ার রাজত্বের চাইতেও অধিকতর পছন্দনীয়!' এ কথা শুনে নবী পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আবু বকরকে বক্ষের সাথে জড়িয়ে নিলেন। তাঁর সাথে সিদ্দীকে আকবরের সম্পর্ককে অটুট ও অখণ্ডণীয় ঘোষণা দিলেন।

সাহাবা ও আহ্লে-বাইতগণের পারস্পরিক সম্পর্ক :

সত্য বিচারের মধ্যপন্থা থেকে সরে আসা এই দুই শ্রেণির পরস্পর দাঙ্গা-ফসাদ বাদ দিয়ে শান্তি ও নিরাপত্তার পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে এ বিষয়টি বুঝতে হবে যে, সাহাবা ও আহ্লে-বাইতের মাঝে পরস্পর কোন দাঙ্গা-হাঙ্গামা ছিল না, যুদ্ধ ছিল না। বরং তাঁরা পরস্পর পরস্পরকে খুবই ভালবাসতেন। পরস্পর পরস্পরের জন্য জীবন উৎসর্গ করার মনোভাব রাখতেন।

হযরত আবু বকর সিদ্দীকের আমল দ্বারা প্রমাণ :

শিয়া মাযহাবের নির্ভরযোগ্য কিতাব 'কাশফুল গুম্মাহ্ ফি মারিফাতিল আয়িম্মাহ্'য় ওরওয়াহ্ বিন বিন আবদুল্লাহ্ থেকে বর্ণিত রয়েছে, তিনি বলছেন, আমি ইমাম মোহাম্মদ বাকেরের নিকট জিজ্ঞাসা করলাম, তরবারির হাতলে রূপা চড়ানো জায়েয আছে কি না? জবাবে তিনি বলেছিলেন, তাতে কোন

[১]. সহীহ্ বোখারী, কিতাবুল মানাকিব, বাবু হিজরতিন নবী সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া সাল্লাম ওয়া আসহাবিহী ইলাল মদীনা।

অসুবিধা নাই। কেননা, হযরত আবু বকর সিদ্দীকও তাঁর তরবারির হাতলে রূপা চড়িয়েছিলেন।

ওরওয়াহ্ বিন আবদুল্লাহ্ও হয়ত আমাদের এই যুগের মত সমসাময়িক মৌলভী ও আলোচকদের নিকট শুনে এই মতবাদে বিশ্বাসী ছিলেন যে, আহলে-বাইত ও সাহাবায়ে কেরামের মাঝে মতবৈষম্য রয়েছে। তাই তিনি জিজ্ঞাসা করেছিলেন, (আবু বকরকে) আপনিও কি সিদ্দীক বলছেন? বর্ণনাকারী বলছেন, এ কথা শুনে ইমাম মোহাম্মদ বাকের জালালে এসে দাঁড়িয়ে গেলেন, কেবলার দিকে মুখ করে বললেন,

نَعَمْ اَلصِّدِّيْقُ، نَعَمْ اَلصِّدِّيْقُ، نَعَمْ اَلصِّدِّيْقُ، فَمَنْ لَمْ يَقُلْ اَلصِّدِّيْقُ فَلَا صَدَّقَ اللهُ قَوْلَهُ فِي الدُّنْيَا وَلَا فِي الْاٰخِرَةِ،

–হাঁ, তিনি সিদ্দীক। হাঁ, তিনি সিদ্দীক। হাঁ, তিনি সিদ্দীক। যে ব্যক্তিই তাঁকে সিদ্দীক বলবে না, তার কথাবার্তাকে আল্লাহ্ দুনিয়াতেও মিথ্যায় পর্যবসিত করে দিন! আখিরাতেও করে দিন![১]

হযরত আলীর চেহারার দিকে তাকানোও এবাদত :

উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দীকা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমার পিতা (অর্থাৎ হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হু) ও হযরত আলী কাররামাল্লাহু ওয়াজহাহু যখন এক জায়গায় বসতেন, তখন আমি দেখতাম যে, আমার পিতা প্রায়শই হযরত আলীর চেহারার দিকে তাকাচ্ছেন। তাঁর চোখ সর্বদা হযরত আলীর চেহারার উপরই থাকত। একদিন আমি তাঁর নিকট জানতে চাইলাম, 'আব্বাজান! আপনি হযরত আলীর চেহারার দিকে অমন করে তাকিয়ে থাকেন কেন?' হযরত আবু বকর সিদ্দীক জবাবে বললেন, 'হে আয়েশা! আমি যে হযরত আলীর চেহারার দিকে প্রায় সময় তাকিয়ে থাকি, তার কারণ শোন, আল্লাহ্র জালালের কসম, যাঁর হাতে আমার জীবন, আমি নিজের কানে শুনেছি, আল্লাহ্র রাসূল বলেছেন,

اَلنَّظْرُ اِلٰى وَجْهِ عَلِيٍّ عِبَادَةٌ،

–(হযরত) আলীর চোহারার দিকে (কেবল) তাকানো(ও) এবাদত।[২]

[১]. কাশফুল গুম্মাহ্ কি মারিফাতিল আয়িম্মাহ্, ২: ৩৫৯।
[২]. আস সাওয়ায়িকুল মুহরিকা, ১৭৭।

একই শব্দমালায় হাদিসটি হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হু থেকেও বর্ণিত রয়েছে।[১]

উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দীকা বলছেন :

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذِكْرُ عَلِيٍّ عِبَادَةٌ،

–আল্লাহ্র রাসূল এরশাদ করেছেন, (হযরত) আলীর আলোচনা করা(ও) এবাদত।[২]

নিঃসন্দেহে সাহাবায়ে কেরাম ও পবিত্র আহ্লে-বাইতগণের মধ্যে আন্তরিক ভালবাসা বিদ্যমান ছিল। হযরত বারা বিন আযিব ও যায়দ বিন আরকাম বলছেন, নবী পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন 'গদীরে খোমে' অবস্থান করছিলেন, সেই সময়ে হযরত আলীর হাতখানি নিজের হাতে ধরলেন। এরপর দুইবার করে বললেন, 'তোমরা কি জান না, আমি সকল মুমিনের কাছে তাদের প্রাণের চেয়েও অধিক প্রিয়জন?' সবাই বললেন, 'হে আল্লাহ্র রাসূল! অবশ্যই তা-ই!' অতঃপর রাসূল বললেন,

اَللّٰهُمَّ مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلِيٌّ مَوْلَاهُ اَللّٰهُمَّ وَالِ مَنْ وَالَاهُ وَعَادِ مَنْ عَادَاهُ

–হে আল্লাহ্! আমি যার বন্ধু, আলীও তার বন্ধু। হে আল্লাহ্! তুমি তাকে ভালবাসিও, যে আলীকে ভালবাসে। আর তাকে তুমি শত্রু জানিও, আলীর সাথে যে শত্রুতা করে।

এই ঘটনার পর হযরত ওমর বিন খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হু হযরত আলীর সাথে সাক্ষাৎ করলেন। তাঁকে বললেন,

يَا ابْنَ اَبِي طَالِبٍ اَصْبَحْتَ وَاَمْسَيْتَ مَوْلَى كُلِّ مُؤْمِنٍ وَمُؤْمِنَةٍ.

–হে আবু তালিবের পুত্র! সাঁঝ-সকালে তোমার আনন্দ চলুক! মোবারক হো! মুমিন নারী-পুরুষের বন্ধুত্ব তোমার সাথে!![৩]

নবী-চরিত ও ইতিহাস-গ্রন্থে উল্লেখ পাওয়া যায়, হযরত ওমর ফারূকের খেলাফতের সময়কালে দুইজন গ্রাম্য লোক ঝগড়া করে তাঁর নিকট এল। তিনি

[১]. আল মুসতাদরিক লিল হাকিম, ১৪৬। কানযুল ওম্মাল, ২:১৫৭। আস সাওয়ায়িকুল মুহরিকা, ১২৩।
[২]. কানযুল ওম্মাল, ৬: ১৫৬।
[৩]. মিশকাতুল মাসাবীহ্, বাহাওয়ালায়ে আহমদ, ৫৬৫।

হযরত আলীকে বললেন, আপনি এদের বিচারটি করে দিন। হযরত আলী বিচার করে দিলেন। তাদের একজন বলল, 'এ আমাদের কী বিচার করবে?'

فَوَثَبَ إِلَيْهِ عمر وَأَخذ بتلبيبه وَقَالَ وَيحك مَا تَدْرِي من هَذَا هَذَا مولَايَ وَمولى كل مُؤمن وَمن لم يكن مَوْلَاهُ فَلَيْسَ بِمُؤْمن،

–এ কথা শোনার সাথে সাথে হযরত ওমর তার উপর ক্রুদ্ধ হলেন। তার গলার কাপড় ঝাপটে ধরে বললেন, তুমি চেন, উনি কে? উনি তোমার সহ সকল মুমিনের মুনিব! উনি যার মুনিব নন, সে মুমিনই নয়।[১]

হযরত শহর বানুর শুভ পরিণয় হযরত ইমাম হোসাইনের সাথে :

সাইয়েদুনা ফারূকে আযম রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হুর খেলাফতকালে যখন ইরান বিজয় হল, তখন ইরানের সর্বশেষ বাদশাহ্ ইয়াযদ গুরুর কন্যা হযরত শহর বানু যুদ্ধ-বন্দী রূপে গনীমতের সম্পদ হলেন। গনীমতের সম্পদ পরিবন্টনকালে মদীনাবাসী ও ইসলামী সেনারা ভাবতে লাগলেন, ইরানের বাদশাহ্ ইয়াযদ গুরুর কন্যা কোন্ ভাগ্যবানের কপালে জুটছেন? যখন শহর বানুর পালা এল, হযরত ওমর ফারূক ঘোষণা দিলেন, ইয়াযদ গুরুর কন্যা একজন শাহ্জাদী। তাঁকে আমি যাঁর পরিণয়ে সঁপে দেব তাঁকেও শাহ্জাদাই হতে হবে! সবাই ভাবনায় পড়ে গেলেন। উন্মুখ হয়ে সকলে দেখে রয়েছেন, হযরত ওমরের দৃষ্টিতে সেই শাহ্জাদাটি কে? হযরত ওমর দাঁড়িয়ে গেলেন। বললেন, 'হোসাইন! আমার দৃষ্টিতে তুমিই সেই শাহজাদা!' এই বলে শহর বানুকে হযরত হোসাইনের প্রণয়ে সোপর্দ করলেন!

হযরত ওমরের নিজ পুত্র হযরত আবদুল্লাহ্ও ছিলেন। কিন্তু তিনি তাঁর পুত্রকে ইমাম হোসাইনের উপর প্রাধান্য দিলেন না। কেননা, সমুদয় সাহাবায়ে কেরামের অটুট অকৃত্রিম ভালবাসা যেমন নবী করীমের প্রতি নিবদ্ধ ছিল, তেমনি তাঁর আহ্লে-বাইতগণের প্রতিও ভালবাসার টান বেশি ছিল।

হযরত ওমর ফারূকের খেলাফতকালে একবার তাঁর গৃহের দরজায় গেলেন হযরত হাসান। গিয়ে দেখলেন যে, তাঁরই পুত্র হযরত আবদুল্লাহ্ দরজায় দাঁড়িয়ে ভেতরে ঢুকার অনুমতির অপেক্ষায় রয়েছেন। কোন কারণে তিনি

[১]. আস সাওয়ায়িকুল মুহ্রিকা, ১৭৯।

ভেতরে যাওয়ার অনুমতি পেলেন না। আপন পুত্রই যেক্ষেত্রে অনুমতি পেলেন না, আমি কী অনুমতি পেতে পারি– এই ভেবে হযরত হাসান পুনরায় ফিরে এলেন। পরে হযরত ওমর জানতে পারলেন যে, হযরত হাসান দরজা থেকে ফিরে গেছেন। সাথে সাথে তিনি নিজেই হযরত হাসানের নিকট গেলেন। বললেন, 'আপনার যাওয়ার কথা আমি জানতে পারি নি!' হযরত হাসান বললেন, 'আমি তো বরং মনে করেছি, আপনার নিজের পুত্রই যেখানে অনুমতি পেলেন না, সেক্ষেত্রে আমি কীভাবে পাই!' এ কথা শুনে হযরত ওমর বললেন,

أَنت أَحَقُّ بِالْإِذْنِ مِنْهُ وَهل أنبت الشَّعْر فِي الرَّأْس بعد الله إِلَّا أَنْتُم،

–আমার অনুমতির জন্য আপনিই সর্বাপেক্ষা বেশি হকদার! আল্লাহ্র পরে আমার মাথার এই পশম আপনারা ব্যতীত আর গজিয়েছেন কারা!' (অর্থাৎ, আমি সত্যপথের দিশা পেলেও আপনাদের দ্বারাই পেয়েছি আর মর্যাদা পেলেও আপনাদের দ্বারাই পেয়েছি!)[২]

অপর এক বর্ণনায় পাওয়া যায়, হযরত ওমর এই কথাগুলোও বলেছিলেন,

إِذَا جِئْت فَلَا تَسْتَأْذِنْ،

আপনি বিনা অনুমতিতেই ঘরে ঢুকে যাবেন![২]

উপরোক্ত আলোচনা দ্বারা আমরা এ কথাই বুঝাতে চাই যে, সাহাবা ও পবিত্র আহ্লে-বাইতগণের মধ্যে পরস্পর ভালবাসা ও প্রেমের বন্ধন ছিল। নিঃসন্দেহে সমুদয় সাহাবা ও পবিত্র আহ্লে-বাইতগণের আদব, সম্মান ও ভালবাসাবোধই হল ঈমানের মূল বিষয়। এই দুইশ্রেণির একটিকেও যদি এড়িয়ে চলা হয়, তাহলে তা হবে মধ্যস্থতায় কাউকে রেখে রাসূলের সাথে বেয়াদবি করা। তাই মনে রাখবেন, কেউ হাত ছেড়ে দিয়ে নামাজ পড়ুক বা হাত বেঁধে পড়ুক, হাত উঠাক বা না উঠাক এগুলো হচ্ছে নিজ নিজ পদ্ধতি, এতে করে ঈমানে কোন রূপ খলল আসে না। কিন্তু সাবধান! জেনে-শুনে আপনারা কখনো নিজের ঈমানের উপর বাট্টা আনবেন না! এই সীমারেখাটি হযরত সাহাবায়ে কেরাম আর পবিত্র আহ্লে-বাইতগণের প্রতি আদব ও সম্মানবোধের! অতএব, যেসব লোক সাহাবায়ে কেরামগণের প্রতি কুফরের মন্তব্য করে, গালমন্দ করে, তারা ইসলামের গণ্ডির মধ্যে থাকে না, ইসলামের গণ্ডি থেকে বেরিয়ে যায়! এই

[১]. আস সাওয়ায়িকুল মুহ্রিকা, ১৭৯।
[২]. আস সাওয়ায়িকুল মুহ্রিকা, ১৭৯।

কুফরের মন্তব্য বা গালমন্দ প্রকাশ্যে করুক আর গোপনেই, ইশারায় করুক আর ভাবেই, মধ্যস্থতায় করুক আর মধ্যস্থতা ছাড়াই। এমনসব ব্যক্তিদের সাথে রাসূলের কোন রূপ সম্পর্কই অবশিষ্ট থকে না! কারণ, তারা মধ্যস্থতার মাধ্যমে তাদের সেই বেয়াদবি ও কটু মন্তব্যের নিশানা বানাচ্ছে স্বয়ং নবীকেই, যা সন্দেহাতীতভাবেই কুফর।

অনুরূপ যে ব্যক্তি সারা জীবনই সাহাবায়ে কেরামগণের প্রশংসায় পঞ্চমুখ থাকে, তাঁদের মহত্বের কথা বলে, কিন্তু অন্তরে পবিত্র আহ্‌লে বাইতগণের ভালবাসা পোষণ করে না, বিদ্বেষই রাখে, আহলে-বাইতের কথায় খারাপ লাগে, মন বিষিয়ে উঠে, ইসলামের সাথে তারও কোন সম্পর্ক নাই। সেও বে-ঈমান, সেও জাহান্নামেরই ইন্ধন।

আসুন! ইমাম হোসাইনের শাহাদাত থেকে দ্বিতীয় সবকটিও শোনা যাক! প্রত্যেকের জন্যই হোসাইনের স্মরণ নিজ নিজ নিয়ম-নীতি অনুযায়ী হওয়ার অনুমতি থাকা চাই। সাহাবায়ে কেরামগণের স্মরণ করার অধিকার প্রত্যেকেরই থাকা চাই। কেননা, পাক সরজমিন তো এজন্যই যে, এখানে সাহাবায়ে কেরামগণের মহত্বের গান গীত হবে, পবিত্র আহলে-বাইতগণের মহত্ব ও ভালবাসার সুর বাজবে। যে জমিনের বুকে সাহাবায়ে কেরামগণের সাথে বেয়াদবি করা হয়, সাহাবাদের গালমন্দ করা হয়, আহলে-বাইতদের কটু সমালোচনা হয়, অপবাদ ও বেয়াদবি করা হয়, সেখানে যদি মুসলমানও বসবাস করে, তাহলে সেই মুলমান দায়িত্বহীন, সেই মুসলমান বিশ্বাসঘাতক, সেই মুলমান অসহযোগী! মুসলমানদের সরজমিনে সাহাবায়ে কেরামগণের বিরুদ্ধেও মুখ খোলার প্রশ্ন সৃষ্টি হতে পারে না, আহলে-বাইতগণের বিরুদ্ধেও বেয়াদবিপূর্ণ আচরণের অনুমোদন থাকতে পারে না।

পরিতাপের বিষয় যে, পাকিস্তানের জমিন সেই জমিন যেখানে রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের শানে বহুকাল ধরেই বেয়াদবি চলে আসছে, কটু মন্তব্য চলছে, রাসূলের সাথে বেয়াদবিমূলক পুস্তকাদি রচিত হয়েছে, সাহিত্য রচিত হচ্ছে– কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে, আজ পর্যন্ত কোন নবী-বিদ্বেষীর ফাঁসি হতে দেখা যায় নি! এই দুর্ভাগ্যের জন্য কোন পরিতাপই পরিতাপ নয়! যে জমিনের বুকে চলে সাহাবাদের সাথে বেয়াদবি! পুস্তক প্রণীত হয় হযরত আয়েশা সিদ্দীকা ও খোলাফায়ে রাশেদীনর প্রতি কটু মন্তব্য নিয়ে! সাহিত্যে থাকে সাহাবাদের প্রতি বিদ্বেষপূর্ণ কটুক্তি! সেই দেশে আজও পর্যন্ত

কোন সাহাবা-বিদ্বেষীকে ফাঁসির রশিতে ঝুলানো হয় নি! পবিত্র আহ্‌লে-বাইতগণের বেয়াদবি চলছে এই জমিনে! ইমাম হোসাইনকে বিদ্রোহী বলা হয় এই জমিনে! এজিদের খেলাফত ও শ্রেষ্ঠত্ব নিয়ে পুস্তক লিখা হয় এই জমিনে! ইমাম হোসাইনের বিরুদ্ধে মুখ খোলা হয় এই জমিনে! সন্তানদের নাম এজিদ রাখা হয় এই জমিনে! এজিদী মতাদর্শ ছড়ানো হচ্ছে এই জমিনে! আহলে-বাইত-বিদ্বেষের মগজ-ধোলাই হচ্ছে এই জমিনে! কোনটারই শেষ নাই! তবু সেই জমিনেও আজ অবধি কোন আহলে-বাইত-বিদ্বেষীর ফাঁসি হল না!

আমাদের দাবী হল, আপনারা যদি পাকিস্তানের পবিত্র জমিনে শান্তি ফিরিয়ে আনতে চান, তাহলে মনে রাখবেন, মুহররামের শান্তি কমিটি দিয়ে শান্তি আসবে না। চলমান দাঙ্গা-হাঙ্গামা চিরকাল অব্যাহতই থাকবে। চেষ্টা করুন এসবের মূলোৎপাটনের এবং এসবের স্থায়ী নিরসনের। এই জমিনে আইন জারি করুন, রাসূলের সাথে সামান্যতম বেয়াদবি করলে শাস্তি স্বরূপ তাকে ফাঁসিতে লটকানো হবে। সাহাবায়ে কেরামদের সাথে বেয়াদবি করলে তার ফাঁসি হবে। এভাবে নির্বিশেষে নবী, সাহাবা ও আহ্‌লে-বাইত-নিন্দুকদের সাজা যদি পাকিস্তানের জমিনে মৃত্যুদণ্ড ঘোষণা দেওয়া হয়, তা হলে কেবল দুই কি তিনজনকেই ফাঁসি দিতে হবে। এর পর আর প্রয়োজন হবে না। এতে করে চিরকালের জন্য পাকিস্তান একটি চির-শান্তির রাষ্ট্রে পরিণত হবে।

নবী-বিদ্বেষীরা সারা জীবন যদি নামাজও পড়তে থাকে, যথারীতি তাহাজ্জুদও পড়তে থাকে, শরীয়তের কথাও বলতে থাকে, তবু তারা মানুষ নয়; তারা শয়তান! জীবনে বেঁচে থাকার কোন অধিকারই তাদের নাই! যে ব্যক্তি ইসলামের কলেমা পড়ে, এদিকে রাসূলের সাথে বেয়াদবিও করে, তাকে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে দিন। যে ব্যক্তি সাহাবায়ে কেরাম ও আহলে-বাইতগণের সাথে বিদ্বেষ পোষণ করে, তাকেও ফাঁসিতে ঝুলান। প্রতি বৎসরেই তো হক, না-হক হাজার হাজার এই-সেই হয়। সেই তুলনায় এ-ই উত্তম যে, পাঁচ-সাতজনের সত্য বিচারে ফাঁসি হয়ে যাক! এতে করে সমস্ত জাতি না-হক হত্যাযজ্ঞ ও দাঙ্গা-হাঙ্গামা থেকে পরিত্রাণ পাবে এবং দেশেও স্থায়ীভাবে শান্তি প্রতিষ্ঠা হবে।

পাশাপাশি এই বিধানও প্রণীত হওয়া দরকার যে, যেসব বই-পুস্তক, সাহিত্য কিংবা সংবাদপত্র ইত্যাদিতে নবীর সাথে, সাহাবাদের সাথে কিংবা আহলে-বাইতগণের সাথে বেয়াদবিপূর্ণ বক্তব্য বা বিবৃতি থাকবে, সেগুলো জব্দ করা হবে কিংবা পুড়িয়ে ফেলা হবে। আরেকটি আইন এরূপও থাকবে যে, কেউ

কারো মতাদর্শ নিয়ে মন্তব্য করতে পারবে না। আর নীতিমালা দিতে হবে যে, 'নিজের মতাদর্শ ছাড়বে না, অন্যের মতাদর্শ ধরবে না'! কাউকে গালমন্দও করবে না, বেয়াদবিও করবে না। স্ব স্ব নীতিতে আদব রক্ষা করেই চলবে। কুরআন-সুন্নাহ অনুযায়ী নিজ নিজ মতাদর্শের গণ্ডিতেই থাকবে। স্ব স্ব মতাদর্শের সত্যতার স্বপক্ষে যত পার প্রমাণাদি পেশ করবে, প্রশংসা করবে। কিন্তু অন্য মতাদর্শকে ভাল-মন্দ বলবে না, গালমন্দও দেবে না, তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যও করবে না।

ইসলামের নীতিমালার মূল কথা এই যে, পবিত্র কুরআনেই রয়েছে, কাফেরদের মূর্তিদেরও গালমন্দ করবে না। তাহলে তারা তোমাদের সহাসত্য আল্লাহ্‌কে গালি দেবার সুযোগ পাবে। স্ব স্ব মতাদর্শ ও ভক্তি নিয়ে চলবে। অন্যের সমালোচনা করবে না।

এই তিনটি নীতিমালা কার্যকর করলে গোটা পাকিস্তান ফির্কাবন্দির দাঙ্গা-হাঙ্গামা থেকে রেহাই পেয়ে যাবে!!

সমাপ্ত